ইসলামের সোনালি অতীত, বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যত বিজয়গাঁথা নিয়ে রচিত সংক্ষিপ্ত, অনবদ্য একটি কিতাব-

কালজয়ী ইসলাম

মুস‘আব ইলদিরিম

আবাবিল মিডিয়া

ইসলামের সোনালি অতীত, বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যত বিজয়গাঁথা নিয়ে রচিত সংক্ষিপ্ত একটি অনবদ্য গ্রন্থ-

কালজয়ী ইসলাম

প্রথম প্রকাশ:
১৬ জুমাদাল উলা, ১৪৪৪ হিজরি, ইয়াওমুল আহাদ
১১ ডিসেম্বর, ২০২২ ঈসায়ী, রোজ রবিবার
২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

আবাবিল মিডিয়া

https://bit.ly/ababilmedia

সূচিপত্র

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده- أما بعد

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত সাড়ে চৌদ্দশত বছর অতিক্রম হয়ে গেছে। সময়ের পরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহ্য় দেখা গেছে অনেক উত্থান-পতন ও নানা ঘটনাপ্রবাহ। আমরা ইনশাআল্লাহ সংক্ষেপে মুসলিম উম্মাহর এই সাড়ে চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ইসলামের ভবিষ্যত নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস চালাব। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক দাতা।

প্রিয় ভাই! একটি জাতির জন্য এটি অত্যন্ত পরিতাপ ও আফসোসের বিষয় যে, সে তার পূর্বপুরুষদের আদর্শ ও ইতিহাস ভুলে যায়। হায়! আজ আমরা আমাদের সোনালি অতীতকে ভুলে গিয়েছি। আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্য আর বীরত্বের কথা, ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতের যে অনুপম দৃষ্টান্ত তারা দুনিয়ার বুকে কায়েম করেছিলেন- সে কথা। যে জাতির একজন পুরুষের নাম শুনে সারা বিশ্ব থরথরে কাঁপত, আমরা তো সেই জাতি! তাই, এখন সময় এসেছে আমাদের ইতিহাসকে জানার, সময় এসেছে জেগে উঠার, হায়দারী হাঁকে গর্জে উঠার, সাইফুল্লাহর তরবারির খাপ উন্মুক্ত করার; আর ঘুম নয় বন্ধু, জেগে ওঠো!

ইসলামপূর্ব বিশ্ব

জাজিরাতুল আরব/আরব উপদ্বীপ

ইসলামপূর্ব জাযিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ সহ পারস্যকেন্দ্রিক সাসানি সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য, শাম, মিশর, ভারতবর্ষ ও চৈনিক সভ্যতা- এক কথায় পুরো পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অসভ্যতা ও বর্বরতা, খুন ও রাহাজানি, অনাচার ও অবিচার, অত্যাচার আর

বাঁধভাঙা যৌনাচার। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন- সর্বক্ষেত্রেই ছিল শিরক্ আর ধর্মহীনতার অন্ধকার; অসহনীয় অশান্তি, যুলুম ও পাপাচার; এক টুকরো সোনালি প্রভাতের জন্য সর্বব্যাপী হাহাকার।

পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত ও শ্বাশ্বত রীতি হলো- প্রতিটি আঁধার রাতের শেষেই আসে সুহাসিনী ভোর। রাত যত গভীর হয়, ভোরের আগমনধ্বনি তত নিকটবর্তী হয়। আর তাই মূর্খতার তমশাচ্ছন্ন ধরনীতেই নিকষ কালো আধাঁর ভেদ করে সত্যের আলো ছড়াতে উদয় হয়েছিল ন্যায় ও কল্যাণের মহাসূর্যের; পুণ্যের পথ দেখাতে আগমন ঘটেছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের।

কে তিনি? কী তাঁর পরিচয়??

তিনি ইমামুল মুরসালীন, নবী-রাসূলগণের ইমাম; রহমাতুল্লিল আলামিন, বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ রহমত; সায়্যিদুল কাওনাইন, উভয় জাহানের নেতা; শাফিউল মুযনিবিন, কিয়ামত দিবসে পাপী-তাপীদের জন্য সুপারিশকারী; বাদরুদ-দুজা, আঁধার রাতের শশী; শামসুদ-দোহা, পূর্বাহ্নের দিবাকর.............!!!! তিনি...........!!!

সেই মহামানবের সিরাত ও জীবনালোচনা দিয়েই তাই শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের ইতিহাস-মানবতার মুক্তির ধর্ম, চিরন্তন জীবন বিধান ইসলামের ইতিহাস।
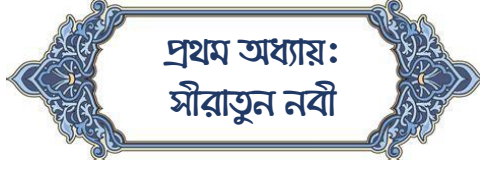
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম ও বংশ-পরিচয়:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-র নাম: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব।

গোত্র: কুরাইশ, বনু হাশেম (বংশীয় পদবী: কুরাইশী, হাশেমী)

উপনাম: আবুল কাসেম।

মায়ের নাম: আমিনা বিনতে ওয়াহব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যাহরা ইবনে কিলাব।

মায়ের গোত্র: কুরাইশ, বনু যাহরা (বংশীয় পদবী: কুরাইশিয়্যা, যাহরাইয়্যা)

জন্মস্থান: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আবু তালেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম তারিখ: ০৯ রবিউল আউয়াল, সোমবার (মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ)

এতিমরূপে লালন-পালন:

জন্মের পূর্বেই তাঁর সম্মানিত পিতা ইন্তেকাল করেন। বনী সা'দ গোত্রের মহীয়সী নারী হযরত হালিমা বিনতে আবী যুওয়াইব রাঁযি. তাকে দুধ পান করান। ছয় বছর বয়সে হারান সম্মানিতা মাতাকে। তারপর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাকে নিজের দায়িত্বে লালন-পালন করেন। আট বছর বয়সে দাদাকেও হারান। অতঃপর চাচা আবু তালেব তার দেখাশোনা ও লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বিবাহ: ২৫ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবের সম্ভ্রান্ত, ৪০ বছর বয়স্কা একজন বিধবা নারী, আম্মাজান হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ রাযি. কে বিয়ে করেন। হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদিজা রাযি. ইন্তেকাল করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য স্ত্রীদের বিবাহ করেন। ধারাবাহিকভাবে তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হল-

২. হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা।
৩. হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহা।
৪. হযরত হাফ্‌সা বিনতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা।
৫. হযরত যাইনাব বিনতে খুযাইমা ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহা।
৬. হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাঁর প্রকৃত নাম হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া।
৭. হযরত যাইনাব বিনতে যাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহা।
৮. হযরত যুয়াইরিয়া বিনতে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহা।
৯. হযরত উম্মে হাবীবা। তাঁর প্রকৃত নাম রমলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহা।
১০. হযরত সফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রাদিয়াল্লাহু আনহা।
১১. হযরত মাইমুনা বিনতে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহা।

সন্তানাদি:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিন ছেলে ও চার মেয়ে ছিল। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভে জন্মলাভ করেন দুই ছেলে- হযরত কাসেম রাদি. ও হযরত আব্দুল্লাহ রাদি.। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপাধি ছিল তৈয়্যব ও তাহের। এ দুজনই বাল্য বয়সে ইন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাঁদী মারিয়া কিবতিয়্যা'র গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন আরেক ছেলে- হযরত ইব্রাহিম রাদি.। তিনিও অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

কন্যাসন্তান: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চার মেয়ে- হযরত যাইনাব, হযরত রুকাইয়া, হযরত উম্মে কুলসুম ও হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না। উনারা সকলেই আম্মাজান খাদীজা রাযি. এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ফাতিমা রাযি. ব্যতীত সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন।

নবুওয়ত লাভ:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নবুওয়ত লাভ করেন সর্বপ্রথম সেই ওহীর মাধ্যমে, যা নাযিল হয়েছিল হেরা গুহায় আপন রবের ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থায়। ওহী হিসেবে কুরআন কারীমের ৯৬ নম্বর সূরা, সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে

আগমন করেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশতা হযরত জিব্রাইল আ.। অতঃপর ২৩ বছর মেয়াদে পবিত্র কুরআন নাযিলের ধারা সম্পন্ন হয়। এই দীর্ঘ সময়ে ইসলামী শরীয়তের সকল হুকুম আহকাম ও বিধি-বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন নবুওয়ত ও রিসালাত সৌধের সর্বশেষ ইট। তিনি ছিলেন খাতামুন-নাবীয়্যিন, সর্বশেষ নবী। তাঁর পর ওহী নাযিলের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী বা রাসূল আগমন করবেন না।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পর মাক্কী যিন্দেগী:

- নবুওয়ত প্রাপ্তির পর প্রথম তিন বছর গোপনে একান্ত নিকটাত্মীয়দের মাঝে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত ও তালিমের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। নবীজির ﷺ আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা হলেন- নবীপত্নী হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি., নবীজির ﷺ চাচাতো ভাই (ও পরবর্তীতে জামাতা, হযরত ফাতিমা রাযি. এর স্বামী) হযরত আলি বিন আবু তালিব রাযি., নবীজির ﷺ মুক্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদ বিন হারিসা রাযি. এবং নবীজির ﷺ অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সার্বক্ষণিক সহচর আবু বকর রাযি. প্রমুখ।
- এরপর আল্লাহ্ পাকের হুকুমে প্রকাশ্যে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। কুফর ও শিরকের অসারতা পরিষ্কার করে দিলেন। হক ও বাতিলের পর্দা বিদীর্ণ করে দিলেন। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে কেবল এক আল্লাহ্‌রই ইবাদত চলবে, কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই চলবে, সর্বত্র কেবল এক আল্লাহ্‌র বিধানই চলবে, আল্লাহ্‌র আইনেই বিচারকার্য সমাধা করতে হবে- তাঁর এই দাওয়াত এমনই এক তীর রূপে নিক্ষিপ্ত হল যা তাগুত ও বাতিলের হৃদপিণ্ডকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। তাওহীদের বজ্রাঘাতে শিরকের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হতে লাগল। ফলে কুফর ও শিরকের ইমাম(নেতা)-গণ রাগে-ক্রোধে-ক্ষোভে বিস্ফোরিত হল। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর (নারী-পুরুষ সকল) সাহাবীগণের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের নির্মম ষ্টিম-রোলার চালাতে আরম্ভ করল। কাউকে উত্তপ্ত বালুতে খালি গায়ে শুইয়ে পাথর চাপা দেয়া হল, উত্তপ্ত লোহা মাথায় ও পিঠে চেপে ধরে কারো গায়ের চর্বি গলিয়ে দেয়া হল, কাউকে দিবারাত্র পাশবিকভাবে পিটানো হল, কাউকে বর্শার আঘাতে শহীদ করে দেয়া

হল। এককথায়, সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহাবায়ে কেরামের উপর নির্যাতন চালানো হল। এভাবে মক্কা নগরী মুসলমানদের বসবাসের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল।

- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানতেন যে, হাবশার বাদশা আসহামা নাজ্জাশী একজন ন্যায়পরায়ন বাদশাহ। তাই নবুওয়তের পঞ্চম বছরে তিনি ﷺ মুসলমানদের হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরতের অনুমতি দিলেন। মুসলমানদের এই প্রথম হিজরতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মুহাজির ছিলেন ১২ জন পুরুষ ও ০৪ জন নারী। এর কিছুদিন পর হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত হয়। তাতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৮৩ জন পুরুষ, ১৮ জন নারী ও কয়েকজন শিশুও হিজরত করেছিলেন।
- নবুওয়তের ষষ্ঠ বছরের শেষ দিকে প্রথমে হযরত হামযা রাদি. ও মহানবী ﷺ-এর দোয়ার প্রেক্ষিতে তিন দিন পর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. -কে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম গ্রহণ করিয়ে মুসলমানদের শক্তিশালী করেন। হযরত উমর রাদি. মুসলমান হওয়ার পর থেকে ইসলাম পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের কাজ সুগম হয়। মুসলমানরা প্রকাশ্যে নামায আদায় করতে শুরু করে। এসময় নবীজি ﷺ তাঁকে 'আল-ফারুক' উপাধি দেন।
- এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তাওহীদের দাওয়াত বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে সার্বিকভাবে বয়কট করল। ফলে মুসলমানগণ শি'বে আবু তালিব নামক স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। এটা ছিল নবুওয়তের সপ্তম বছরের ঘটনা। মুসলমানদের জন্য খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হল। এভাবে নির্মম কঠিন পরিস্থিতিতে তিনটি বছর অতিবাহিত হল।
- অবরোধ ও বয়কটের দুঃসহ তিনটি বছর শেষ হওয়ার স্বস্তির রেশ কাটতে না কাটতেই নবুওয়তের দশম বছরে চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। এর পঞ্চাশ দিন পরই রমাজান মাসে ইন্তেকাল করেন আম্মাজান হযরত খাদিজা রাদি.। ঘরের-বাইরের দুই নির্ভরতাকে হারিয়ে নবীজি ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি এ বছরকে 'আমুল হুযন' বা শোকের বছর নামকরণ করেন।
- নবুওয়তের দশম বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন। কিন্তু তায়েফবাসী দাওয়াত কবুল না করে উল্টো তাঁর

মোবারক শরীরে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করে দেয়। প্রবাহিত রক্তে নবীজির ﷺ পদযুগল সিক্ত হয়ে উঠে, পাদুকাদ্বয় রক্তে পূর্ণ হয়ে যায়।

- এহেন কঠিন পরিস্থিতির মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-কে আপন নিদর্শন সমূহ দেখিয়ে সান্ত্বনা দিতে 'মিরাজ' সংঘটিত করেন। একরাতে নবীজি ﷺ মক্কা থেকে মসজিদুল আকসা (এই ভ্রমনকে **'ইসরা'** বলা হয়) এবং মসজিদুল আকসা থেকে উর্ধ্বাকাশে গমন করেন (এই ভ্রমনকে **'মিরাজ'** বলা হয়।) এই সফরেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।
- নবুওয়তের একাদশ বছর হজের মওসুমে নবীজি ﷺ নিজেই ইয়াসরিব (মদীনা)- থেকে আগত ছয়জন খাযরাজ বংশীয় যুবককে ইসলামের দাওয়াত দেন। যারা সকলেই ইসলাম কবুল করেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা মদীনাবাসীর মাঝে দাওয়াত দিতে থাকেন, যার ফলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের মোবারক দাওয়াত পৌঁছে যায়।
- নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে মদীনা হতে বারোজনের একটি প্রতিনিধিদল (যাদের মাঝে দশজন খাযরাজ গোত্রীয় এবং দুজন আওস গোত্রীয়) মক্কার মিনায় অবস্থিত সংকীর্ণ পাহাড়ি গিরিপথ আকাবায় নবীজী ﷺ -এর সাথে মিলিত হয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এটি **'প্রথম বাইয়াতে আকাবা'** নামে খ্যাত। এসময় নবীজি দ্বীন ও কুরআন পাঠ শিক্ষা দিতে এবং নামাজে ইমামতি করতে হযরত মুসআব বিন উমায়ের রাদি.-কে তাঁদের সঙ্গে মদীনায় প্রেরণ করেন।
- নবুয়তের ত্রয়োদশ বছর হজ্জের মৌসুমে 'দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা' অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দুইজন নারী। এই বাইয়াতের মাধ্যমে মদীনাবাসী সকল ক্ষেত্রে নবীজি ﷺ-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং নবীজি ﷺ ও মক্কার মজলুম মুসলমানদের দ্বীনী এবং সামরিক পূর্ণ সহযোগিতার শপথ গ্রহণ করেন।

নবীজী ﷺ-এর হিজরত:

- এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কুরাইশদের বাড়াবাড়ি ও জুলুম-নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে গেল, এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও শুরু করে দিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ

দিলেন। নবীজী ﷺ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে (নবুওয়তের চতুর্দশ বছর) মদীনায় হিজরত করেন।

নবীজী ﷺ-এর মাদানী যিন্দেগী:

- নবীজির ﷺ আগমনধন্য ইয়াসরিবের নাম হয় 'আল মদীনাতুল মুনাওয়ারা' বা আলোকিত নগরী। পৃথিবীর ইতিহাসে সূচিত হয় এক নব উজ্জ্বল অধ্যায়, যাবতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ এক ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। এ রাষ্ট্রের ভূমি হল ইয়াসরিব, যার জনগণ হল মুহাজির ও আনসারগণ, সংবিধান হল আল কুরআন আর রাষ্ট্রনায়ক হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
- মদীনায় পৌঁছেই নবীজি ﷺ 'মসজিদে নববী'র নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এটি কেবল ইবাদতগাহ্ ছিল না, ছিল দ্বীন শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়, দাওয়াতের মারকাজ, মুসলিম রাষ্ট্রের সংসদ আর প্রতিরক্ষার হেডকোয়ার্টার। এখান থেকেই দেশ-দেশান্তরে বিজয়াভিযান প্রেরিত হত। এখানেই ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হত। এখানেই নবীজি ﷺ বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল, রাজন্যবর্গ ও রাজ-দূতদের স্বাগত জানাতেন। পরবর্তীতে এখানেই মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচন করা হত এবং এখানেই মুসলমানগণ খলিফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতেন।
- নবীজি ﷺ দ্বিতীয় যে কাজটি করেন তা হলো আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে এক অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন, ইতিহাসে যার দ্বিতীয় আর কোনো নজির পাওয়া যায় না।
- তৃতীয়ত, তিনি মদীনায় বসবাসরত ইহুদীদের সাথে মৈত্রীচুক্তি করেন। মদীনায় তখন ইহুদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করত-ক. বনু কাইনুকা (এরা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র), খ. বনু নাযির ও গ. বনু কোরাইযা। (এই গোত্রদ্বয় ছিল আওস গোত্রের মিত্র)
- এভাবে মদীনার ভিতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার বাহিরের ইসলামের দুশমনদেরকে প্রতিহত করে সর্বত্র আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য জিহাদের মেহনত শুরু করেন।

- প্রথমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে কেবল যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন। (সূরা হজ্জ: ৩৯)। এর কিছুকাল পর দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরয করেন। (সূরা বাকারা: ১৯০-১৯৩; ২১৬)
- এই বছরই (দ্বিতীয় হিজরীতে) রমজান মাসের রোযা এবং যাকাত ফরয করা হয়।
- দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে (৬২৪ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারি)-তে আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মাক্দিসের পরিবর্তে কাবাঘরকে মুসলমানদের কেবলা মনোনিত করেন।
- এদিকে নবীজি ﷺ একের পর এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করা শুরু করেন। নবীযুগে সংঘঠিত সামরিক অভিযান সমূহ দুই প্রকার। যথা:

  ক.গাযওয়া: যেসব অভিযানে নবীজি ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নেতৃত্বদান ও পরিচালনা করেছেন। এরূপ গাযওয়ার সংখ্যা সাতাশটি, যার মধ্যে আটটি মতান্তরে নয়টিতে প্রত্যক্ষ লড়াই হয়েছে। গাযওয়ার মধ্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া হচ্ছে সাতটি। যথা: ০১. বদর (রমজান, ২য় হিজরি), ০২. উহুদ (শাওয়াল, ৩য় হিজরি), ০৩. খন্দক (শাওয়াল, ৫ম হিজরি), ০৪. খায়বার (মুহার্‌রম, ৭ম হিজরি), ০৫.মক্কা বিজয় (রমজান, ৮ম হিজরি), ০৬.হুনায়ন (শাওয়াল, ৮ম হিজরি) এবং ০৭. তাবুক (রজব, ৯ম হিজরি)।

  খ. সারিয়্যা: যেসব অভিযানে নবীজি ﷺ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি; বরং কোনো সাহাবীকে বাহিনী-প্রধান নির্ধারণ করে অভিযানে প্রেরণ করেছেন। এরূপ সারিয়্যার সংখ্যা ছেচল্লিশটি।

- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

بُعِثْتُ بالسيفِ بينَ يدَي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له

"কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে তরবারি সহকারে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে এই যমীনে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হয়, যার কোনো শরীক নেই।" (মুসনাদে আহমাদ-৫১১৪)

وَأَنَا الْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ الْمَلاحِمِ

"আমি একত্রকারী, আমি যুদ্ধের নবী (নাবিয়্যুল মালাহিম্)"

(শামায়েলে তিরমিযি, হাদিস নং-২৮৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৪৯২; শারহুস্ সুন্নাহ, হা/৩৬৩১; মুস্তাদ্‌রাকে হাকেম, হা/৪১৮৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হা/৩২৩৫১; মুস্‌নাদুত তায়ালুসী, হা/৪৯৪)

جعل رزقي تحت ظل رمحي

"আমার রিযিক বর্শার ছায়াতলে রাখা হয়েছে।" (বুখারী শরীফ-১/৪০৮)

আমার জান ও পিতামাতা আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য কুরবান হোক! কত সত্যবাদী রাসূল ছিলেন তিনি! তাঁর জীবদ্দশাতে সংঘটিত তেষট্টিটি যুদ্ধাভিযান-ই এই হাদীসগুলো বুঝার জন্য যথেষ্ট। সত্যিই তিনি তরবারির নবী, যুদ্ধের নবী; তিনি কেবল জায়নামায আর তসবীহর নবী ছিলেন না! মদীনার অলিতে গলিতে যখন 'হাইয়্যা 'আলাল জিহাদ' বলে আযান দেয়া হত, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাদি. তরবারি আর ঢাল নিয়েই বের হতেন, অন্য কিছু নিয়ে নয়। 'আল্লাহ্‌র রাস্তা' বলতে তাঁরা 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা'কেই বুঝতেন।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটি, সর্বাপেক্ষা আখলাকওয়ালা মানুষটি, সর্বোত্তম উপায়ে সর্বোচ্চ হিকমাহ্‌র সাথে দাওয়াতপ্রদানকারী ব্যক্তিটি কেন হাতে তরবারি তুলে নিলেন? দ্বীন কায়েমের জন্য যদি শুধু তালিম, তরবিয়ত, দাওয়াত আর তাযকিয়াই যথেষ্ট হত, তাহলে কেন তিনি রক্ত আর আগুনের পথ বেছে নিলেন?

যাইহোক, নিম্নে নবুওয়তের যামানার প্রধান প্রধান যুদ্ধাভিযানের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল–

- **বদর যুদ্ধ (রমজান, ২য় হিজরি):** এই যুদ্ধকে ইসলামি ইতিহাসে হক-বাতিলের প্রথম নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। মুসলমানদের ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া, সত্তরটি উট। বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। অপরদিকে মুশরিক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৯৫০। তাদের সঙ্গে ছিল ১০০ ঘোড়া, সাতশ উট ও ছয়শ বর্ম। আর নেতৃত্ব ছিল আবু জাহলের হাতে। আল্লাহ্ তা'আলা এই যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য তাঁর অদৃশ্য বাহিনী (হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে এক/তিন/পাঁচ হাজার ফিরিশতা) অবতীর্ণ করেন।

যুদ্ধের ফলাফল: মুসলমানদের বিজয়। কাফিরপক্ষের সত্তরজন নিহত ও সমসংখ্যক বন্দী হয়। এই যুদ্ধে আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জাহল), উতবা ইবনে রবিয়া, শায়বা ইবনে রবিয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ সহ মক্কার ২৪ জন বড় বড় নেতা নিহত হয়। মুসলিম পক্ষের চৌদ্দজন সাহাবী বদর যুদ্ধে শহিদ হন।

এই যুদ্ধে 'আমিনুল উম্মত' হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাদি. তাঁর কাফির পিতাকে হত্যা করেন।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে নবীজি হযরত আবু বকর রাদি. এর ফয়সালা গ্রহণ করে মুক্তিপণ গ্রহণ করত বন্দীদের ছেড়ে দেন। এই ফয়সালা আল্লাহ্ পাক অপছন্দ করে এই আয়াত নাযিল করেন, "যমীনে শত্রুকে ব্যাপকহারে হত্যা না করে কোনো নবীর জন্য সমীচীন নয় বন্দীদের নিজের কাছে রাখা, তোমরা পার্থিব কল্যাণ চাও আর আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ।" (সূরা আনফাল ৮: ৬৭) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চাচ্ছিলেন যুদ্ধাপরাধী সকল কাফেরদের হত্যা করা হোক।

- **বনু কায়নুকার যুদ্ধ:** বনু কায়নুকার বাজারে জনৈক ইহুদী স্বর্ণকার কর্তৃক এক মুসলিম বোনের লাঞ্ছিত হওয়ায় উপস্থিত সাহাবী সাথে সাথে অভিশপ্ত ইহুদীকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। এদিকে অন্যান্য ইহুদীরা আক্রমণ করে ঐ সাহাবীকে শহিদ করে দেয়। এর দ্বারা ইহুদীরা তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে। খবর শোনামাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে বনু কায়নুকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান, তাদের অবরোধ করেন এবং তাদেরকে মদীনা হতে তাড়িয়ে দেন। ফলে ইহুদীরা শামে চলে যায়। এটিও দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা।
- **উহুদ যুদ্ধ (শাওয়াল, ৩য় হিজরি):** বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে মক্কার মুশরিকরা তাদের নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমনের উদ্দেশ্যে বের হয়। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা হতে বের হয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে ছাউনি ফেলেন। পথিমধ্যে মুনাফিকদের সরদার ইবনে সালুল মুসলিম বাহিনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৩০০) সৈন্য নিয়ে মদিনায় ফিরে যায়। এইভাবে আল্লাহ্

তাআলা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌র হুকুমের মাধ্যমে উম্মাহ্‌র ভিতর ঘাপটি মেরে বসে থাকা মুনাফিকদের আলাদা করে দিলেন। উল্লেখ্য, মুনাফিকরা মুসলমানদের সাথে সকল আমলই করতো, কেবল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ ছাড়া। এই যুদ্ধে তীরন্দাজ বাহিনীর একটি অংশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশনা ভুল বুঝায় মুসলমানদের 'নিশ্চিত বিজয়' সাময়িক বিপর্যয়ে পরিণত হয়।
উহুদ যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর বাইশজন সৈন্য নিহত হয়। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর সত্তরজন সাহাবি শহিদ হন। পাপিষ্ঠ কুরাইশ নেতা উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নিক্ষিপ্ত একটি পাথর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুবারক শরীরে প্রচন্ডভাবে আঘাত হানে। এতে তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটো অংশ ভেঙ্গে চোয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়। ফলে সম্মুখভাগের ডান দিকের নিচের দন্ত মুবারক ভেঙ্গে যায়। মুখমন্ডল ও ঠোঁট মুবারক আহত হওয়ার ফলে সমস্ত মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়। কপালে জখম হয়। অতঃপর মুসলমানদেরকে তাদের অজান্তে ফেলে মারার জন্য কুফ্‌ফাররা যে গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল, তার একটিতে পড়ে যান তিনি।
মুশরিকরা নবীজির চাচা হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিবসহ অনেক শহিদের লাশ বিকৃত করে। এই যুদ্ধেই হযরত হানযালা রাদি. বাসর শয্যা থেকে জিহাদের আহ্বানে বেরিয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যান। তাঁকে সম্মানিত ফিরিশতারা গোসল প্রদান করেন।

- **বনু নাযিরের বিরুদ্ধে অভিযান (চতুর্থ হিজরি):** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রতারণা করে হত্যা করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহুদিদের গোত্র 'বনু নাযির' তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে। তাই নবীজি ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে বনু নাযির গোত্রের দুর্গ পনের দিন অবরোধ করে রাখেন। নবীজি ﷺ বনু নাযিরের জনপদের চারপাশের খেজুর গাছ কেটে ফেলার এবং জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। অবশেষে তাদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। ইহুদীদের একটি দল শামে আর আরেকটি দল খায়বারে চলে যায়।
- **খন্দক (শাওয়াল, ৫ম হিজরি):** খায়বারের অভিশপ্ত ইহুদীরা মক্কার মুশরিক, গাতফান গোত্রকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উস্কে দেয়। এছাড়াও বনু কিনানা ও বনু তিহামা গোত্রও এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শরীক হয়। সব

মিলিয়ে দশ হাজার সৈন্যের এই বহুজাতিক বাহিনী মুসলিমদেরকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় দিতে মদীনা আক্রমনের উদ্দেশ্যে বের হয়। এই জন্য এই যুদ্ধকে 'আহযাবের যুদ্ধ' তথা বহুজাতিক বাহিনীর যুদ্ধও বলা হয়। এদিকে প্রবীণ সাহাবী হযরত সালমান ফারসি রাদি. মুশরিক বাহিনীকে মদীনায় প্রবেশে বাধা দিতে মদিনার পাশে পরিখা খনন করার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব গৃহীত হলে স্বয়ং নবী করিম ﷺ পরিখা খনন কাজে সাহাবায়ে কেরামের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এসময় সাহাবায়ে কেরাম সমস্বরে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন-

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا
عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

মুহাম্মদের সা. হাতে করেছি শপথ জিহাদের,
পিছু হটবনা কভূ পূর্বে মউতের।

জিহাদের কাজে ব্যস্ততার জন্য এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়। তখন ছিল প্রচন্ড শীত। খাদ্যের কোন সংস্থান ছিল না। অনেকেই একাধারে তিন দিন উপোস ছিলেন। পেটে একটি করে পাথর বাঁধেন। আল্লাহ্র রাসূল ﷺ নিজে পেটে দুটি পাথর বেঁধেছিলেন। তিনি নিজ হাতে মাটি খনন করে তা নিজেই মাথায় উত্তোলন করে বহন করেছিলেন। ফলে তাঁর গোটা দেহ মুবারক ধুলোমলিন হয়ে গিয়েছিলো।

এ যুদ্ধে নবীজী ﷺ যে তরবারি ব্যবহার করেন তার নাম 'জুলফিকার'। এ তরবারির বাট ও খাপ রৌপ্যের তৈরি। প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করুন। খাদ্যের সংস্থান নেই, পেটে পাথর বাঁধা; কিন্তু হাতে রৌপ্য নির্মিত বাট ও খাপের তরবারি। সুব্হানাল্লাহ্! এটিই সাইয়্যিদুল মুরসালীন -এর আদর্শ। খাদ্য না থাকলেও সমস্যা নেই, কিন্তু আগে জিহাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি চাই। জিহাদের প্রয়োজনে একান্ত অপারগতায় নামায ছুটে যেতে পারে, কিন্তু জিহাদের ব্যাপারে শিথীলতা চলবে না। আর আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর প্রিয় হাবীবের এই জিহাদী জযবার প্রেক্ষিতে এ যুদ্ধের মধ্যেই নাযিল করেন এই আয়াত-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব ৩৩:২১)

খন্দক তথা আহযাবের যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার। বহুজাতিক বাহিনী মদীনা পৌঁছে পরিখা দেখে স্তম্ভিত ও হতভম্ব হয়ে যায়। ফলে তারা মদীনায় প্রবেশ করতে পারেনি। উভয়পক্ষের মধ্যে তীর ছুড়াছুড়ি হলে ছয়জন সাহাবী শহিদ হন এবং মুশরিক পক্ষের নিহত হয় দশজন।

নবীজি ﷺ মদিনার মুসলিম, নারী, শিশু-কিশোর ও বয়োবৃদ্ধদের শত্রুর আক্রমণ হতে নিরাপদে রাখতে বনু হারিসার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন।

এদিকে মদীনার ভিতর অবস্থানরত সর্বশেষ ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যা মৈত্রিচুক্তি ভঙ্গ করে বহুজাতিক বাহিনীকে সহায়তা করতে সম্মত হয়। ফলে মুসলমানরা বাহির ও ভিতর উভয় দিক হতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পতিত হয়। সময়টি ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত সঙ্গিন। শীত ও ক্ষুধা, ভয় ও শঙ্কা, হামলা ও অবরোধ- সবকিছু মিলে তখন কঠিন দুর্যোগময় পরিস্থিতি। এমন সময় আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে গাতফান গোত্রের নাঈম ইবনে মাসুদ ইবনে আমের আশজাঈ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাকে ব্যবহার করে নবীজি ﷺ বহুজাতিক বাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরান। এই বাহিনী এক মাসের মত মুসলমানদের অবরোধ করে রেখেছিল। অবশেষে আল্লাহ্ পাক একরাতে ঝড়ো হাওয়া নাযিল করেন, যা বাতিলের শিবিরকে লন্ডভন্ড করে দেয়, তাদের তাবু উল্টে দেয়, জিনিসপত্র তছনছ হয়ে যায়। অবশেষে বহুজাতিক বাহিনী ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

এ যুদ্ধের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, মদীনায় বিকাশমান মুসলিম শক্তিকে প্রতিহত করার মত আরবে আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

- **বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক অভিযান:** খন্দক যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যার ইহুদি সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা করায়, আল্লাহ্ পাকের হুকুমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বাহিনী নিয়ে বনু কুরায়যার দুর্গ পঁচিশ দিনব্যাপী অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা এই শর্তে আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত নেয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ হযরত সাদ বিন মুআয রাযি.-কে তাদের বিষয়ে

ফয়সালাকারী নির্ধারণ করবেন। তারা ভেবেছিল, বনু কুরায়যার মিত্র আনসারি আওস গোত্রের সরদার হিসেবে সাদ বিন মুআয তাদের বিষয়ে কোমল ও সহনীয় কোনো ফয়সালা দিবেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যে ছিলেন "আশিদ্দা উ আলাল কুফ্ফার, রুহামা উ বাইনাহুম" (কুফ্ফারদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আর মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত সুহৃদ)। তাই হযরত সাদ ইবনে মুআয রাযি. ফয়সালা দেন-

ক. যুদ্ধ করতে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করা হোক।

খ. নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হোক।

গ. তাদের সকল সম্পদ (মুসলমানদের মাঝে) বণ্টন করে দেয়া হোক।

প্রিয় ভাই, এটা কেবল সাহাবায়ে কেরামের মেজাজই ছিল না, স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারও চাওয়া ছিল। হযরত সাদ বিন মুআয রাদি. এর ফয়সালা শুনে হুজুর ﷺ মন্তব্য করেন, সপ্তাকাশের উর্ধ্বে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিষয়ে যে ফয়সালা করেছে, তুমিও সে ফয়সালাই করেছ।

এরপর মদিনার বাজারে গর্ত করা হয়। গভীর গর্ত খননের পর হাত বাঁধা ইহুদীদেরকে দলে দলে নিয়ে এসে পাইকারী হারে শিরশ্ছেদ করে গর্তে ফেলে দেয়া হয়। তাদের সংখ্যা ছিল ছয় থেকে সাত শয়ের মাঝামাঝি। আর যাবতীয় নারী ও শিশুদেরকে মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়।

বনু কুরায়যাকে সমূলে নিপাত করার মাধ্যমে মদিনা পুরোপুরি ভাবে বিষাক্ত ইহুদীমুক্ত হল এবং একই সাথে তা নির্ভেজাল একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হলো।

- **(আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-কে কটুক্তিকারী) 'শাতীমে রাসূলে'র নববী চিকিৎসা:**

✓ বদর যুদ্ধের পর শাতীমে রাসূল ইহুদী কা'ব বিন আশরাফের সাথে বুঝাপড়া করে তার পরিণতিতে পৌঁছে দিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আউস্ গোত্রের হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদি.কে কয়েকজন সাথীসহ প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদি ও তাঁর সাথীগণ অভিশপ্ত কা'ব বিন আশরাফের

পাওনা বুঝিয়ে দেন এবং তার কর্তিত মস্তক এনে নববী দরবারে উপস্থিত করেন।

✓ বনু কুরায়যার অভিযানের পর শাতীমে রাসূল খায়বারের ইহুদি সালাম ইবনে আবুল হুকাইক (আবু রাফে)-কে শায়েস্তা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাযরাজ গোত্রের হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতিক রাদি.-কে প্রেরণ করেন। রাতের আঁধারে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতিক রাদি. আবু রাফের দুর্গসম বাসভবনে অভিযান চালিয়ে এই খবীসকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে তার পাওনা তাকে বুঝিয়ে দেন।
[শাতীমে রাসূলের শাস্তি সম্পর্কে জানতে বিস্তারিত পড়ুন: https://bit.ly/shatim1]

- **হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়আতে রিজওয়ান:**

কুরাইশদের সাথে এসব যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে (৬২৮ সালের মার্চ মাসে) চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। গোয়েন্দা মারফত তিনি জানতে পান, নবীজির ﷺ আগমনের খবর পেয়ে কুরাইশরা বিশাল সৈন্য সমাবেশ করেছে। উমরা করাই যে একমাত্র উদ্দেশ্য- তা জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত উসমান রাদি.-কে দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন। হযরত উসমান রাদি. এর ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় মুসলিম শিবিরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উসমান রাদি.-কে হত্যা করা হয়েছে। তখন নবীজি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

لَا نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ

"(যদি এমন ঘটে থাকে) আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে কিছুতেই ফিরব না।"

এরপর নবীজি ﷺ সকল সাহাবীকে (জিহাদ ও প্রতিশোধের) বায়আত গ্রহণের আহ্বান জানান। ইতিহাসে এ বায়আত 'বায়আতুর রিযওয়ান' নামে খ্যাতি লাভ করে। স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাহাবীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আয়াত নাযিল করেন-

لَقَدْ رَضِىَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিল।” (সূরা আল ফাত্হ ৪৮:১৮)

এদিকে পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে কুরাইশরা দ্রুত সুহায়ল বিন আমরকে সন্ধিচুক্তি করার জন্য প্রেরণ করে। এরপর মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল তা ইতিহাসে ‘হুদায়বিয়ার সন্ধি’ নামে পরিচিত।

- **বিভিন্ন বাদশাহ এবং আমীরদের নামে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ:**

খায়বারের অভিযানের কয়েকদিন পূর্বে সপ্তম হিজরীর পহেলা মহররম তারিখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দূত মারফত এসকল চিঠি প্রেরণ করেন। যেমন: হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী, মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয, রোম সম্রাট কায়সারের নামে ইত্যাদি।

- **আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের শেষ ঘাটি খায়বার বিজয়:**

সপ্তম হিজরির মুহার্‌রম মাসে (৬২৮ সালের মে মাসে) খায়বর অভিযান সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ; অপরদিকে প্রতিপক্ষে ছিল এগারো হাজার সৈন্য (দশ হাজার ইহুদী ও এক হাজার বনু গাতফান গোত্রের)। খায়বার অভিযানে ষোল জন সাহাবী শহিদ হন। অপরদিকে ইহুদীদের তিরানব্বই জন নিহত হয়।

- **মুতার যুদ্ধ:**

এ যুদ্ধ ছিল নবীজীর ﷺ জীবদ্দশায় সংঘটিত মুসলমানদের সবচেয়ে ভয়াবহ, রক্তক্ষয়ী, অসম এক যুদ্ধ। মূলত এ যুদ্ধের মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অঞ্চলসমূহ বিজয়ের পথ সুগম হয়েছিল। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনজন সেনাপতি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন (যায়েদ বিন হারেসা রাদি., জাফর বিন আবু তালিব রাদি. আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদি.) এই শর্তে যে, একজন শহীদ হলে আরেকজন পতাকা তুলে নিবেন। মুতার যুদ্ধে মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লক্ষাধিক রোমান-আরব সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানরা এই বিশাল সংখ্যক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে

প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে তারা কল্পনাও করেননি, কাফেরদের বাহিনী এত বিশাল হবে। তাই সিদ্ধান্ত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পত্র পাঠিয়ে শত্রুর লোক লস্করের সংখ্যা জানাবেন। তিনি হয় আরো সৈন্য পাঠাবেন, নচেত যা ভালো মনে করেন নির্দেশ দিবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়ালাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে বললেন,

يَا قَوْمِ، وَاَللَّهِ إنَّ الَّتِي تَكْرَهُونَ، لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ الشَّهَادَةُ، وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدِ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ

[عبد الملك بن هشام, سيرة ابن هشام ت السقا, ৩৭৫/২]

"হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্র কসম! আজ তোমরা যা অপছন্দ করছ সেটাই তোমরা কামনা করছিলে। আর তা হলো শাহাদাত। আমরা সংখ্যা-শক্তি বা সংখ্যাধিক্যের জোরে লড়াই করি না। যে জীবনব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সেটির জন্য আমরা লড়াই করি। অতএব এগিয়ে যাও, বিজয় বা শাহাদাত এ দুটো উত্তম জিনিসের যে কোন একটা অবশ্যই আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদি. এর বক্তব্য শুনে সকলেই নবোদ্যমে বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং শত্রুর মোকাবিলয় অগ্রসর হয়। শুরু হয় সাতদিনব্যাপী এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই। যেন এক অনিঃশেষ যুদ্ধ। মাত্র তিন হাজার সৈন্য মুখোমুখি হয়েছে দুই লক্ষ সৈন্যের! পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছে এক বিস্ময়কর ঘটনা। সকলেই হতবাক! এ-ও কি সম্ভব! কিন্তু ঈমানের পুষ্পিত বসন্ত যখন আগমন করে, তখন তো এমন বিস্ময়ই উপহার দেয়!

ষষ্ঠ দিনে এসে যুদ্ধ যেন চরমে পৌঁছে। মুসলিম সেনাপতি যায়দ বিন হারেসা রাদি., এরপর জাফর বিন আবু তালিব রাদি., এরপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদি.-একের পর এক বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যান। তিনজনই শহিদ হয়ে গেলে মুসলমানরা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু

আনহুকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করে রোমান বাহিনীকে ধোকা দিতে সক্ষম হন এবং মুসলিম বাহিনীকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আনতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধেই তিনি নবীজি ﷺ কর্তৃক "আল্লাহ্‌র তরবারি" উপাধি লাভ করেন।

প্রিয় ভাই! জানেন কি- দুই লক্ষ বনাম তিন হাজারের রক্তক্ষয়ী ও ঐতিহাসিক যে যুদ্ধে মুসলিমদের তিন-তিন জন সেনাপতি শহিদ হয়েছিলেন, সে যুদ্ধে কতজন সাহাবী শহিদ হন?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, মুসলিম বাহিনীর মাত্র বারো জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। আর রোমানদের কতজন নিহত হয়েছিল? অসংখ্য। শুধু এতটুকুই জেনে রাখুন এবং অনুমান করুন, এই যুদ্ধে 'আল্লাহ্‌র তরবারি' হযরত খালিদ রাদি. এর হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গেছিল।

আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কিছু নেই! এরই নাম ঈমান ও ঈমানি শক্তি! এটিই জিহাদ ও জিহাদের শক্তি!! এটিই আল্লাহ্ পাকের ফরয বিধান জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্‌র অন্তর্নিহিত রহস্য, যাতে লুক্কায়িত রয়েছে মুসলমানদের ইজ্জত, সম্মান ও জীবন!

'মহাবিজয়' মক্কাবিজয়:

এটি সেই মহান বিজয়, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আপন দ্বীন ও রাসূলকে এবং তার বিশ্বস্ত বাহিনী ও জামাতকে মর্যাদাশীল করেছেন। এ বিজয়ের ফলেই মানুষ দলে দলে আল্লাহ্ পাকের দ্বীনে প্রবেশ করতে শুরু করে।

দশ হাজার সাহাবী নিয়ে নবীজী ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। অষ্টম হিজরী সনের ২০ রমজান (৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি) তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কা দখল করার পর তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

- **হুনাইনের যুদ্ধঃ**

মক্কা বিজয়ের দু'সপ্তাহেরও কম সময়ের মাঝে নবীজির ﷺ কাছে খবর পৌঁছে যে হাওয়াযিন ও ছাকিফ গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য

সমবেত করেছে। কায়স ও আয়লান গোত্রের কিছু শাখাও মিলিত হয়েছে। নবীজি ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন, কুফ্ফাররা আক্রমণ করার আগেই তিনি আক্রমণ করবেন। ফলে তিনি বার হাজার সাহাবীর একটি বাহিনী নিয়ে রওনা হন। এই একটি যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় বেশি ছিল, ফলে কতক সাহাবীর মনে সংখ্যাধিক্যের প্রতি তুষ্টি চলে আসে। আল্লাহ্ পাক বিষয়টি পছন্দ করেননি। তাই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সাময়িক বিপর্যয় দিয়ে পরীক্ষায় ফেললেন। অবশেষে অদৃশ্য বাহিনী (ফিরিশতা) নাযিল করে তাঁর রাসূল ﷺ ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কেরামকে বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধে চারজন সাহাবী শহীদ হন, অন্যদিকে কাফেরদের সত্তরজন নিহত হয়। মুসলমানরা প্রচুর মালে গনীমত লাভ করে, এর মধ্যে ২৪,০০০ উট এবং ৬০০০ যুদ্ধ বন্দী ছিল।

- **তাবুকের যুদ্ধঃ**

নবম হিজরির রজব মাসে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দে) তাবুক অভিযান সংগঠিত হয়। মদিনায় তখন চলছিল গ্রীষ্মের মৌসুম। গরমও ছিল প্রচণ্ড। তাছাড়া চলছিল ফসল কাটার মৌসুম। নবীজি ﷺ সংবাদ পান যে, রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ মদিনায় হামলা চালাতে বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং আরব ভূ-খণ্ডের যেসব খ্রিস্টান তাদের অধীনস্থ ছিল, তারাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। নবীজি ﷺ সকল সাহাবীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করেন। নবীজি ﷺ কোনো অভিযানে বের হলে সাধারণত গন্তব্য জানাতেন না, কিন্তু এ যুদ্ধে যেন সবাই যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারেন তাই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে গন্তব্য জানিয়ে দেন। নবীজির ﷺ নির্দেশ পাওয়া মাত্রই সাহাবায়ে কেরাম সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়া আরম্ভ করলেন। একদল গরীব, ক্ষুধাতুর সাহাবী এসে নবীজির ﷺ কাছে যানবাহনের জন্য আবেদন করেন; নবীজি ﷺ অপারগতা প্রকাশ করলে তারা দারিদ্রতা হেতু জিহাদে শরীক হতে না পারার দুঃখে অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে যান। ইতিহাসে তাঁরা 'বাকুন' বা ক্রন্দনকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

ত্রিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে নবীজি ﷺ রওনা হন। তাবুকে পৌঁছার পর রোমান বাহিনীর কোনো লক্ষণ না দেখতে পেয়ে দশ-বারো দিন অবস্থান করে মদিনায় ফিরে আসেন। মদীনা হতে তাবুক গমন, তাবুকে অবস্থান ও তাবুক হতে মদিনায় প্রস্থান- সব মিলিয়ে পঞ্চাশ দিন সময় লেগেছিল।

প্রকাশ্য মুনাফিক, নারী-শিশু ও অক্ষম ব্যতীত কেউ এ যুদ্ধ হতে পিছনে পড়েনি, কিন্তু নিষ্ঠাবান তিন সাহাবী উপযুক্ত তেমন কোনো কারণ ছাড়াই পিছনে পড়ে গেলেন। কা'আব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন; তিনজনই ছিলেন বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাভাজন আনসার সাহাবী। জিহাদ হতে পিছনে পড়ায় তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা অনুযায়ী সামাজিক ভাবে 'অনির্দিষ্টকালের' জন্য বয়কট করা হয়, তাদের সাথে কথা বার্তা, সালাম বিনিময় নিষিদ্ধ করা হয়; চেনা মানুষগুলো অচেনা হয়ে গেল; তাদেরকে তাদের স্ত্রীদের থেকে পৃথক করে দেয়া হল; যমীন তাদের জন্য ভয়ানক হয়ে উঠল। তাদের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অনিশ্চিত পরিণতির চিন্তায় তাদের ক্রন্দন করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

প্রিয় ভাই! বলুনতো- তাঁদের এহেন পরিস্থিতির কারণ কি ছিল? অথচ তারা বায়'আতে আকাবা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সাথে অন্যান্য যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বদরী সাহাবী ছিলেন। হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন দুর্বল, বৃদ্ধ।

কারণ একটাই-'জিহাদে সময়মত জুড়তে না পারা'; অথচ তবুক যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ তো কেবল যুদ্ধ করার নিয়তে বের হয়েছিলেন কিন্তু কোন যুদ্ধ সংগঠিতই হয়নি।

যাইহোক, পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেন।

- **বিদায় হজ্জঃ** দশম হিজরি (৬৩২ খ্রিস্টাব্দে) বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়।

- **নবীজির ﷺ শেষ পদক্ষেপ:** হজ্জ সমাপ্ত করে মদিনায় আসার পরই নবীজি ﷺ সকলকে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। আসন্ন এই অভিযানের সেনাপতি নির্ধারণ করেন হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদি.কে। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর।

- **নবীজি ﷺ-এর অসুস্থতা:** এদিকে নবীজি ﷺ অন্তিম অসুস্থতায় আক্রান্ত হন। বাহিনী বের হওয়ার পর জার্‌ফ নামক স্থানে পৌঁছার পর নবীজির ﷺ রোগযন্ত্রনা বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদ আসায় অভিযান স্থগিত হয়।

প্রিয় নবীজির ওফাত, পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে গমন:

ধীরে ধীরে নবীজির ﷺ রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে উপস্থিত হয় পার্থিব জীবনের শেষ দিন। একাদশ হিজরি সনের ১২ রবিউল আউয়াল (৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস) রোজ সোমবার চাশতের সময় প্রিয় নবীজি ﷺ আমাদেরকে ছেড়ে, আমাদেরকে ইয়াতীম করে 'রফীকে আ'লা'র সাথে মিলিত হন।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য, আর আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করব।

ওফাতের সময় প্রিয় নবীজির ﷺ বয়স ছিল তেষট্টি বছর।

- **নবুওয়তের যামানার শাসনকাল-** ৬২২-৬৩২ ঈসায়ী/ ১-১১ হিজরি।

- **শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ** জাজিরাতুল আরব/আরব উপদ্বীপ। আয়তন ৬৪,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। (বর্তমানে- সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও ইয়েমেন।)
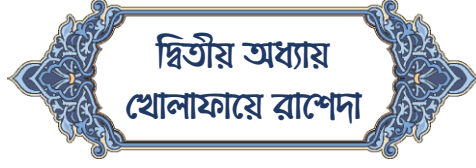
খোলাফায়ে রাশেদার শাসন:

সময়কালঃ ৬৩২-৬৬১ ঈসায়ী/১১-৪০ হিজরী, ৩০ বছর।

খিলাফাতে রাশেদার খলিফাগণঃ

১. হযরত আবু বকর রাদি. : ১১- ১৩ হিজরি (৬৩২-৬৩৪ ঈসায়ী)
২. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. : ১৩- ২৩ হিজরি (৬৩৪-৬৪৪ ঈসায়ী)
৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদি. : ৬৪৪-৬৫৬ ঈসায়ী
৪. হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদি. : ৬৫৬-৬৬১ ঈসায়ী
৫. হযরত হাসান ইবনে আলী রাদি. : ৬৬১ ঈসায়ী

শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ সমগ্র আরব উপদ্বীপ, লেভান্ট থেকে উত্তর ককেসাস, পশ্চিমে মিসর থেকে বর্তমান তিউনিসিয়া ও পূর্বে ইরানীয় মালভূমি থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত।
(বর্তমানে যার অংশ ৩১টি দেশঃ আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, সাইপ্রাস, মিশর, জর্জিয়া, গ্রীস, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, ইতালি, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, কাতার, রাশিয়া, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান, ইয়েমেন)

উল্লেখযোগ্য বিজয়/যুদ্ধঃ রিদ্দার যুদ্ধ, ইয়ামামার যুদ্ধ, বাইজেন্টাইন (রোম) ও সাসানীয় (পারস্য) সাম্রাজ্যের পতন, মিশর জয়, জেরুজালেম জয়, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান জয়, কাদেসিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি।

মানচিত্র: খোলাফায়ে রাশেদার আমলে (হযরত উসমান রা. এর খিলাফত এর সময়) মুসলিম বিশ্বের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি।

হযরত আবু বকর রাদি.-এর খিলাফত :

সময়কালঃ ১১- ১৩ হিজরি (৬৩২-৬৩৪ ঈসায়ী)

হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতের সময় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা:

- **ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের ফিতনা:** হযরত আবু বকর রাদি. খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর আরব উপদ্বীপের প্রতিটি প্রান্তে ধর্মত্যাগের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে। একদল মিথ্যা নবুওয়ত দাবী করল, যেমন ইয়ামামায় মুসায়লামা বিন হাবীব আল কাজ্জাব, বনু আসাদের তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ, ইয়েমেনে আসওয়াদ আল আনাসি, বনু তামিমের সুজা নাম্নী এক মহিলা ইত্যাদি; একদল ইসলাম ত্যাগ করে এই ভণ্ড নবীদের অনুসরণ করল; আরেকদল ইসলামের ফরয বিধান যাকাত প্রদান করাকে অস্বীকার করল। হযরত আবু বকর রাদি. এদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে রিদ্দাহ্‌র এই ফিতনাকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

- **ইয়ামামার যুদ্ধঃ** ভন্ড নবী মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী ও কঠিন এই যুদ্ধে বিশ হাজার মুরতাদকে খতম করা হয় এবং মুসলমানদের বারোশ মুজাহিদ শহিদ হন, যাদের মধ্যে চারশ ছিলেন কুরআনের হাফেয। ইতোপূর্বে কোনো যুদ্ধে এত সাহাবি শহিদ হননি। এই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন হযরত ইকরামা বিন আবু জেহেল রাদিয়াল্লাহু আনহু।

- **ঘোড়ায় চড়ে সাগর পারঃ** মুরতাদদের দমন করতে হযরত আলা ইবনুল হাযরামি রাদি. এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বাহরাইনে প্রেরিত হয়েছিল। এই মহান বুযুর্গ সাহাবি মুরতাদদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তার বাহিনী নিয়ে নির্দ্বিধায় সাগরবক্ষে নেমে গিয়েছিলেন। তারা পানির উপর দিয়ে পার হলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! সাহাবায়ে কেরামের কারও পা বা ঘোড়ার খুর পর্যন্ত পানিতে ভিজেনি।

- মুরতাদদের দমন করতে সাহাবায়ে কেরাম মোট এগারটি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন।

- হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতের সময়ই সর্বপ্রথম হযরত যায়েদ বিন ছাবিত রাদি. এর নেতৃত্বে কুরআন কারীমের প্রথম সংকলন করা হয়।

হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতের সময় বিজয়াভিযানসমূহঃ

- ### পারস্য সাম্রাজ্যভূক্ত ইরাকে বিজয়াভিযানঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল পারস্য (সাসানি) ও রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্য। পারস্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্র। সুদীর্ঘ প্রায় তেরশ বছর পারস্য সাম্রাজ্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামরিক শক্তিবলে পৃথিবীজুড়ে টিকে ছিল। ইরাক তখন সাসানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইরাকের মাদায়েন বা টেসিফোন নগরী ছিল সাসানি রাজ্যের রাজধানী। দজলা নদীর উভয় তীর ঘেষে এর বিস্তৃতি ছিল।

কালের পরিক্রমায় ২২৪ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের (The Persian/Parthian Empire) পতন ঘটে এবং সাসানি সাম্রাজ্য (The

Sasanian Empire) প্রতিষ্ঠিত হয়। সাসানি সাম্রাজ্যের অধিপতিকে ‘কিসরা’ বলা হতো। সাসানি রাজবংশের প্রথম কিসরা ছিল প্রথম আরদ্‌শির (Ardashir I)। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদি. এর খিলাফত আমলে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে (৩১ হিজরি সনে) শেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদিগারদ্‌ (Yazdegard III)- এর মৃত্যুর মাধ্যমে পারস্যে চূড়ান্ত ভাবে এই বিশাল সাসানি সাম্রাজ্যের মুসলমানদের হাতে পতন ঘটে। মুসলমানদের এই বিজয়াভিযানের সূচনা হয়েছিল হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতকালে, রাজধানীর পতন ঘটে হযরত উমর রাদি. এর শাসনামলে আর সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে হযরত উসমান রাদি. এর শাসনামলে (সম্রাটের মৃত্যুর মাধ্যমে)।

ইরতিদাদের ফিতনা দূর হওয়ার পর হযরত আবু বকর রাদি. হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি.কে ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বিজয়াভিযান পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। ‘আল্লাহ্‌র তরবারি’ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. ইরাক অভিযানে এগারটি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন এবং মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁর সাথে ছিল মাত্র আঠার হাজার সৈন্য। যুদ্ধগুলো ছিল অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল-

১. **শিকলের যুদ্ধ (মুহাররাম, দ্বাদশ হিজরি):** এ যুদ্ধে পারসিকরা এক অভিনব যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে। সৈন্যরা যেন ময়দান থেকে না পালাতে পারে, এজন্য তারা পরস্পরকে শিকল দ্বারা বেঁধে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই কৌশল তাদের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। এ কারণেই এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয় ‘যাতুস সালাসিল’ বা শিকলের যুদ্ধ। এ যুদ্ধেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. উবুল্লার গভর্নর ও শত্রুবাহিনীর প্রধান হরমুযকে ঐতিহাসিক এই চিঠিটি প্রেরণ করেন-

“হামদ ও সালাতের পর, ইসলামগ্রহণ কর, তাহলে নিরাপদ থাকবে। অথবা নিজের ও আপন কওমের জন্য নিরাপত্তা-চুক্তি করে নাও এবং জিজিয়া প্রদান কর। দুটির একটিও গ্রহণ না করলে পরিণতির জন্য নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করতে পারবে না। কারণ, আমি এমন একদল সৈন্য নিয়ে তোমাদের উদ্দেশ্যে এসেছি, যারা মৃত্যুকে ততটাই ভালোবাসে, যতটা তোমরা ভালোবাসো জীবনকে।”

এই যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. হরমুযকে হত্যা করেন।

২. **মাযারের যুদ্ধ (সফর, দ্বাদশ হিজরি):** এ যুদ্ধে মুসলমানরা কুফ্ফার পারসিক বাহিনীর ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্যকে হত্যা করে।

৩. **ওয়ালাজার যুদ্ধ (সফর, দ্বাদশ হিজরি):** এই যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এই যুদ্ধে এমন এক অনারবি বীরের সাথে মল্লযুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিলেন, যে এক হাজার ব্যক্তির শক্তি রাখত। তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার লাশে হেলান দিয়ে সেদিনের আহার সারেন।

৪. **উল্লায়শ (বা আমগিশায়া)-এর যুদ্ধ (সফর, দ্বাদশ হিজরি):** 'রক্তের নদী' কথাটি সাহিত্যে বা প্রবাদে পাওয়া গেলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি পাওয়া না, একমাত্র ইসলামের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম। মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এই যুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন- "হে আল্লাহ্! আমাদের সাহায্য করা আপনার ইখতিয়ার। আপনি যদি শত্রুবাহিনীকে আমাদের কর্তৃত্বে এনে দেন, তাহলে তাদের সকলকে নিশ্চিহ্ন করব; এমনকি তাদের রক্তে নদী প্রবাহিত করব।"

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে মুসলমানরা পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে। হযরত খালিদ রাদি. ঘোষণা দেন- শত্রুদেরকে হত্যা করো না, জীবিত আটক করো। কেবল তাকেই হত্যা করো যে বাধা প্রদান করে।

সেনাপতির নির্দেশে মুসলমানরা পারসিক সৈন্যদেরকে আটক করে। এরপর হযরত খালিদ রাদি. এদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।

প্রিয় ভাই! দৃশ্যটি একটু কল্পনা করুন। সাহাবায়ে কেরাম কুফ্ফারদের প্রতি কেমন কঠোর ও নির্দয় ছিলেন!!! দুনিয়ার জীবনে এটিই তাদের আসল প্রাপ্তি, আর পরকালের আযাব তো আরো কঠিন! পারসিক বাহিনীর **সত্তর হাজার** বন্দীকে নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে হত্যা করা হয় যে, তরবারির আঘাতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরো শরীর নদীতে গিয়ে পড়ত। এভাবে তিনদিন ব্যাপী কুফ্ফার নিধন চলতে থাকে। নদীতে বাধ দেয়া ছিল, ফলে নদী প্রবাহিত হচ্ছিল না। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. বাধ কেটে দিতে নির্দেশ দেন,

ফলে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। এভাবে তিনি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেন।

৫. **আনবার বিজয় (চোখের যুদ্ধ):** হযরত খালিদ রাদি. আনবার এর দুর্গ অবরোধ করে দেখতে পান, সেখানে পারসিক সৈন্যরা সমবেত হয়েছে এবং নিজেদের দুর্গের চারপাশে পরিখা খনন করে সুরক্ষিত অবস্থান গ্রহণ করেছে। মুসলিম বাহিনীকে দেখতে পেয়ে পারসিক সৈন্যরা দুর্গ-প্রাচীরের ওপরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ নিখুঁত তিরন্দাজিতে পারদর্শি হাজার খানেক মুসলিম সৈন্য নির্বাচন করেন এবং পারসিকদের চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুড়ার নির্দেশ দেন। প্রথমবারের নিক্ষেপেই প্রায় একহাজার পারসিক সৈন্য চোখে আক্রান্ত হয়। এ কারণে এ যুদ্ধের নাম হয় 'চোখের যুদ্ধ'।

৬. **ফিরাযের যুদ্ধ (জিলহজ্জ, দ্বাদশ হিজরী):** এই যুদ্ধে মুসলমানরা প্রথমবারের মত তৎকালীন বিশ্বের প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ শক্তি পারস্য সাম্রাজ্য ও প্রতীচ্যের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমান সাম্রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হয়। তাদের সাথে তাদের কতিপয় আরব মিত্র গোত্রও যোগ দিয়েছিল। এই যুদ্ধেও মুসলমানরা বিজয়ী হয় এবং হাজার হাজার কুফ্‌ফারদের জাহান্নামে পাঠান। ফিরাযের যুদ্ধ ছিল হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর নেতৃত্বে একাদশ যুদ্ধ। আর এই অভিযানের মাধ্যমেই ইরাকে তাঁর অভিযান সমাপ্ত হয়।

৭. **এছাড়াও আরো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধাভিযান হল:** হিরা বিজয় (রবিউল আউয়াল, দ্বাদশ হিজরি), আইনুত তামারের অভিযান, দুমাতুল জানদালের অভিযান, হুসায়দের যুদ্ধ, মুছাইয়াখের যুদ্ধ ইত্যাদি।

- **(রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত) শাম অঞ্চলে বিজয়াভিযান:**

রোমান সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সাম্রাজ্য। রোমানদের উৎপত্তি যেহেতু ইতালির রোম নগরী, তাই তাদেরকে রোমান বলা হয়। রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম অংশের রাজধানী ছিল রোম। আর পূর্ব অংশের রাজধানী ছিল (বর্তমান তুরষ্কের) কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব নাম অনুসারে এই পূর্ব অংশকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও বলা হত। ঐতিহাসিক শাম অঞ্চল (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইসরাইল ও ফিলিস্তিন-এই পাঁচটি দেশ মিলে ছিল শাম অঞ্চল), মিশর, এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়া

(বর্তমান তুরষ্ক) ও ইউরোপের বিশাল অঞ্চল তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এসময় সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় পয়তাল্লিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

শামের অভিযানগুলোতেও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. নেতৃত্ব দেন। অভিযানসমূহের মাঝে বুছরা বিজয় ও আজনাদাইনের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। অপরদিকে রোমান বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। আলহামদুলিল্লাহ! এই যুদ্ধেও মুসলমানরা বিজয়ী হয়। হাজার হাজার রোমান খ্রিস্টান কুফ্ফারদের কঁচুকাটা করে। এই যুদ্ধে চারশ মুজাহিদ শাহাদাত লাভ করেন।

হযরত আবু বকর রাদি. এর মৃত্যুঃ

উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদি. ত্রয়োদশ হিজরীর ২২ জুমাদাল উখরা (৬৩৪ ঈসায়ীর ২৩ আগস্ট) মাসে তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার খিলাফতকাল ছিল দু-বছর তিন মাস দশ দিন।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি.-এর খিলাফত :

সময়কালঃ ১৩- ২৩ হিজরি (৬৩৪-৬৪৪ ঈসায়ী)

হযরত উমর রাদি. এর খিলাফতের সময় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা:

- হযরত উমর রাদি. মূলত তাঁর পূর্বসূরি আবু বকর রাদি. এর কর্মধারাকেই অব্যাহত রাখেন এবং বিজয়াভিযানের যে ধারা শুরু হয়েছে, তাকে আরও গতিময় ও বেগবান করেন।
- খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রথমেই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা হলো হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি.কে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দান এবং হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদি.কে শামের বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক নির্ধারণ। উম্মাহ হযরত খালিদ রাদি. এর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে; উম্মাহ যেন মনে-প্রাণে একথাই

বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ই সবকিছুর কর্তা; উম্মাহ যেন ফিতনায় পতিত না হয়- এরূপ দুরদর্শী চিন্তা থেকে তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন।

প্রিয় ভাই! হযরত খালিদ রাদি. সহ সকল সাহাবীর মনোভাব এই ছিল যে, আমাকে বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশে নিযুক্ত করা হোক বা পশ্চাৎ অংশে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রস্তুত আছি। পদ ও পদমর্যাদা, নেতৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের জাগতিক মোহ থেকে 'তিনি' ও 'তাঁরা' ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এটিই ছিল ইখলাস ও নিষ্ঠা; জুহদ ও দুনিয়াবিমুখতার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাই, হযরত খালিদ রাদি. কোন প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করেননি। মাথা পেতে নিয়েছেন আমিরুল মু'মিনিনের আদেশ।

হযরত উমর রাদি. এর খিলাফতের সময় উল্লেখযোগ্য কিছু সামরিক অভিযান:

- **ফিহল (বায়সান)-এর যুদ্ধ (ত্রয়োদশ হিজরি):** আশি হাজার রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে পঁচিশ হাজার মুজাহিদ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভয়ংকর এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রোমানদের প্রায় সকল সৈন্যকে মরুসিংহ মুজাহিদরা হত্যা করে। এই যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক যদিও হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদি. ছিলেন, কিন্তু তাঁর অধীনে থেকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি.-ই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ফিহলের যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদি. এর বীরত্ব প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। পরবর্তীতে কোনো মুসলমান বীরত্ব প্রদর্শন করলে তাকে বলা হত- সেতো বায়সান যুদ্ধে খালিদ রাদি. এর মত বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। হযরত খালিদ রাদি. ফিহলের যুদ্ধে একাই রোমান বাহিনীর এগারোজন সেনাপতিকে হত্যা করেন।

- **দামেশক বিজয়:** হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যার্‌রাহ রাদি. এর নেতৃত্বে চতুর্দশ হিজরীর রজব মাসে (সেপ্টেম্বর, ৬৩৫ ঈসায়ী) মুসলিম বাহিনী দামেশক বিজয় করেন।

- **ইয়ারমুকের যুদ্ধ (রজব, পঞ্চদশ হিজরি/আগস্ট ৬৩৬ ঈসায়ী):** দামেশক ও হিমসের পতনে উদ্বিগ্ন হয়ে মুসলমানদের সাথে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য তৎকালীন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার

(মতান্তরে চার লক্ষ) সৈন্যের এক বহুজাতিক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে। রুশ, স্লাভ, ইংরেজ, রোমান, গ্রিক, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান ও আরব খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন জাতি হিরাক্লিয়াসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধের ময়দানে তাদের বিস্তৃতি ছিল আঠার মাইল। পুরো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচন করা হয় আর্মেনিয়ার শাসক বাহানকে।
অন্যদিকে মুসলিমদের সর্বসাকুল্যে সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ছত্রিশ হাজার, এঁদের মধ্যে এক হাজার সাহাবী ছিলেন, যাদের মাঝে মহান বদরি কাফেলার একশজন সদস্যও ছিল। মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যার্‌রাহ রাদি.।

শুরু হল প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক লড়াই, যেন বিশাল অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে, আগুনের তেজ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, তরবারিগুলো প্রাণ কেড়ে নেওয়ার এক অনিঃশেষ খেলায় মেতে উঠেছে। তরবারির আঘাতে ঝরে পড়ছে খণ্ডিত মস্তক, খণ্ড বিখণ্ড মানবদেহ। এভাবে একটানা ছয়দিন অতিবাহিত হলে ষষ্ঠ দিনের সূর্যাস্তের পূর্বেই বিজয় মুসলিম বাহিনীর পদচুম্বন করে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে চার হাজার মর্দে মুজাহিদ শহিদ হন। অপরদিকে রোমান বাহিনীর সত্তর হাজার মতান্তরে একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে শামে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

- **আজনাদাইন বিজয়ঃ** ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর রাদি. শাম অঞ্চলে অবস্থানরত অন্যতম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাদি.-এর কাছে বার্তা প্রেরণ করে তাকে আল কুদ্‌স অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। রোমানদের একটি বাহিনী আল কুদসে ছিল, আরেকটি ছিল আজনাদাইনে। উভয় বাহিনীর সেনাপতি ছিল আরতাবুন নামের জনৈক রোমান সেনাপতি। আরতাবুন ছিল সমকালীন শ্রেষ্ঠতম ও নিষ্ঠুরতম সেনাপতি।

হযরত আমর ইবনুল আস রাদি. প্রথমে আজনাদাইন বিজয় করেন, এরপর বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন।

- **ইলিয়া (বাইতুল মুকাদ্দাস) জয়ঃ (রবিউস সানি, ষোড়শ হিজরি/ মে, ৬৩৭ ঈসায়ী)**

এদিকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু উবাইদা রাদি. হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি.কে সঙ্গে নিয়ে শামের পুরো উত্তরাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হন। তাঁরা সেখানে পৌঁছলে ইলিয়াবাসী হযরত আবু উবায়দা রাদি. এর কাছে বার্তা পাঠায় যে, ‘আমরা আপনাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করতে চাই। আপনি দয়া করে আপনাদের খলিফা উমরকে বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন সশরীরে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়ে আমাদের সাথে চুক্তি করেন এবং আমাদেরকে নিরাপত্তানামা প্রদান করেন।’ তাদের এই দাবীর প্রেক্ষিতে আমীরুল মু‘মিনীন বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হন এবং সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় চুড়ান্ত করেন।

- **মিশর বিজয় (রবিউল আউয়াল, ২০ হিজরি/ফেব্রুয়ারি ৬৪১ ঈসায়ী):**

মিশর তখন রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। মিশর অধিপতি ছিল মুকাওকিস। মুসলিম সেনাপতি হযরত আমর ইবনুল আস রাদি. বার হাজার সৈন্যের মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ব্যাবিলন অবরোধ করেন। হযরত আমর ইবনুল আস রাদি.-কে সহযোগিতা করার জন্য আমীরুল মু‘মিনীন হযরত উমর রাদি. চারজন সেনাপতি প্রেরণ করেন। তাঁরা হলেন- মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদি., উবাদা বিন ছামেত রাদি., যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাদি. ও মাসলামা বিন মুখাল্লাদ আল আনসারি রাদি.।

শত্রুপক্ষ মনে করেছিল, ব্যাবিলন দুর্গের অভ্যন্তরে তারা নিরাপদেই থাকবে। কারণ, দুর্গের প্রাচীরগুলো ছিল অনেক উঁচু আর পুরো দুর্গ পানির নালা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরদ্বারগুলোও ছিল যথেষ্ট মজবুত; দুর্গের অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ রসদ ও খাদ্যদ্রব্যেরও ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু মুসলিম বাহিনী সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করতে সক্ষম হয়। হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদি. কয়েকজন দুঃসাহসী সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে সাঁতরে পরিখা পার হন, এরপর প্রাচীর বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে প্রাচীরদ্বয় খুলে ফেলতে সক্ষম হন। এবার মুসলিম বাহিনী দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ সাত মাসের অবরোধের পর ব্যাবিলন দুর্গ জয় করে। মুকাওকিস তখন আত্মসমর্পন করে এবং জিযিয়া দেয়ার শর্তে সন্ধিচুক্তি করে।

- **আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় (মুহাররম, ২১ হিজরি/ডিসেম্বর ৬৪১ঈসায়ী):** এরপর আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর রাদি. এর অনুমতিক্রমে হযরত আমর ইবনুল আস রা. আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন। তিনমাস মতান্তরে চৌদ্দ মাস নগরীটি অবরোধ করে রাখার পর আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়।

পারসিকদের বিরুদ্ধে অব্যাহত বিজয়াভিযানসমূহ:

- **নামারিকের যুদ্ধ (শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি):** হযরত আবু উবায়েদ রাদি. এর নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য বিশিষ্ট মুসলিম বাহিনী ইরাক অভিমুখে রওনা হয়। মুজাহিদ বাহিনী ইরাকের নামারিক নামক স্থানে এক লক্ষ সৈন্যবিশিষ্ট পারসিক বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং শোচনীয়ভাবে কুফ্ফারদের পরাজিত করে।
- **সেতুর যুদ্ধ (শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি):** উহুদের যুদ্ধে সাময়িক বিপর্যয়ের পর মুসলমানদের সর্বপ্রথম যে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে, তাহলো সেতুর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন হযরত আবু উবায়েদ রাদি.। আর পারসিকদের সর্বাধিনায়ক ছিল বাহমান নামের জনৈক ধূর্ত ও সুদক্ষ সেনাপতি। এ যুদ্ধে শহিদানের সংখ্যা ছিল চার হাজার। অপরদিকে পারসিক বাহিনীর নিহত সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। এটি ছিল পারসিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রথম ও শেষ পরাজয়।

- **বুওয়াইবের যুদ্ধ (রমজান, ত্রয়োদশ হিজরি):**

  অন্যদিকে পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান চলতে থাকে। পারসিকরা মিহরান বিন বাযানের নেতৃত্বে একলক্ষ ঘোড়সাওয়ার ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মাত্র বারো হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন হযরত মুসান্না রাদি.।

  প্রিয় ভাই! ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল জানেন কি?

  পারসিক বাহিনীর একজন সৈন্যও সেদিন রেহায় পায়নি। হয় তারা মুসলিম সৈন্যদের তরবারির আঘাতে বা নদীতে ডুবে নিহত হয় অথবা মরুভূমিতে পালিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

- **কাদেসিয়ার যুদ্ধ (১৩-১৫ শাবান, পঞ্চদশ হিজরী/১৯-২২ সেপ্টেম্বর, ৬৩৬ ঈসায়ী): ইসলামের ইতিহাসে একটি নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ**

আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. পারসিকদের সাথে ফাইনাল খেলা খেলতে চাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদি. এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী কাদেসিয়ায় প্রেরণ করেন।
পারসিকদের সেনাপতি ছিল পারস্যের বীর রুস্তম। এই যুদ্ধেই মুসলমানদের দূত হযরত রিবয়ি বিন আমির রাদি. পারসিক সেনাপতি রুস্তমকে মুসলমানদের জিহাদের উদ্দেশ্য বয়ান করেন-
"আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আল্লাহ্ যাদের তাকদিরে মঞ্জুর করেন, আমরা যেন তাদেরকে সৃষ্টির দাসত্ব-লাঞ্ছনা হতে উদ্ধার করে স্রষ্টার দাসত্ব-গৌরবের পথে নিয়ে আসি; পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে উভয় জগতের প্রশস্ততার দিকে এবং ভ্রষ্ট ধর্মসমূহের অবিচার হতে ইসলামের ন্যায় নীতির পথে নিয়ে আসি।"
চারদিন ব্যাপী যুদ্ধ চলে। ৬০,০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে ৩০,০০০ মুসলমানের ভয়াবহ এক অসম যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে মুসলিমদের সাড়ে আট হাজার মুজাহিদ শহিদ হন। অন্যদিকে পারসিক বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা ছিল গণনাতীত। হযরত কা'কা' ইবনে আমর ও তাঁর সঙ্গীগণ বীর রুস্তমের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেন।

নবীজির ﷺ ওফাতের পর ইসলামি ইতিহাসে অনেক যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসবোদ্ধাদের নিকট অন্য কোনো যুদ্ধই কাদেসিয়ার যুদ্ধের মতো অধিক গুরুত্ব লাভ করেনি। এর কারণ- মূলত কাদেসিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমেই পারস্যে মুসলিম বাহিনীর বিজয়াভিযান পূর্ণতা লাভ করে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রবল প্রতাপে সুবিশাল ভূ-খণ্ড শাসনকারী পারস্য সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিত হয়ে যায়।

- **অশ্বপৃষ্ঠে দজলা পাড়ি!**

তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছতে মুসলিম বাহিনীর সামনে তখন বাধা কেবল দজলা নদী। দজলা ছিল ছয় মিটার গভীর প্রশস্ত ও খরস্রোতা নদী। সেনাপতি হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদি. মুসলিম বাহিনীর সকলকে নদীবক্ষে ঘোড়ায় চড়ে নেমে যেতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ্‌র

কসম! এ সময় মুসলিম বাহিনীর কোনো সদস্য পানিতে ডুবে নি, তাদের কোনো সরঞ্জাম হারায়ওনি। এ দৃশ্য দেখে পারসিক সৈন্যরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা কোনো মানুষের বিরুদ্ধে লড়ছ না; তোমরা যে যুদ্ধ করছ একদল জীনের বিরুদ্ধে!

- **মাদায়েন বিজয়ঃ**

মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে কিসরাসহ পারস্য সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মাদায়েনের অধিবাসীরা মাদায়েন ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন কিসরা ছিল তৃতীয় ইয়াযদিগার্‌দ। মুসলিম বাহিনী মাদায়েনে প্রবেশ করে দেখতে পায় পুরো নগরী জনশূন্য। ষোড়শ হিজরি সনের সফর মাসেই (৬৩৭ ঈসায়ী সনের মার্চ মাসে) মাদায়েন বিজিত হয়। মাদায়েনে মুসলিম বাহিনী প্রভূত গনিমত লাভ করে। পারস্য-কিসরার রাজপ্রাসাদ হতে মুসলিম বাহিনী যে সম্পদ লাভ করে, তা ছিল মানে ও পরিমাণে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ইসলামের এই মহান সৈনিকগণের কেউ গনিমতের অবাধ প্রাচুর্য সত্ত্বেও তা থেকে এক দিরহাম সম্পদও আত্মসাৎ করার চিন্তা করেননি। সকল সম্পদ বায়তুল মালে জমা করে দেয়া হয়।

আল্লাহ্‌র শপথ! নিঃসন্দেহে এটি এক বিরল বিস্ময়কর ঘটনা। দজলা পাড়ি দেওয়ার চেয়েও বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনা এটি। উন্মুক্ত পৃথিবী ও অবারিত ধন-ভাণ্ডার এই সকল অভিযাত্রীদের হৃদয়ে সামান্য স্পন্দনও সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা শ্রেয়তর ও স্থায়ী। সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌র তরে।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. এর শাহাদাতঃ

কুফার গভর্নর হযরত মুগিরা বিন শুবা রাদি. এর ফিরুয নামক একটি ক্রীতদাস ছিল। আবু লু'লুআ উপনামধারী এই নরাধম ফযরের সালাত আদায়রত অবস্থায় আমিরুল মু'মিনীনকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে শহীদ করে দেয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদি. ২৩ হিজরি সনের ২৬ জিলহজ্জ (৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর) তেষট্টি বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। নবীজি ﷺ ও হযরত আবু বকর রাদি. এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়

হযরত উসমান রাদি.-এর খিলাফত :

সময়কালঃ ২৩- ৩৫ হিজরি (৬৮৪-৬৫৬ ঈসায়ী)। খিলাফতকাল ছিল ১২ দিন কম ১২ বছর।

হযরত উসমান রাদি. এর খিলাফতের সময় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা:

- খলিফা উসমান রাদি. এর আমলে শামে নিযুক্ত গভর্নর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদি. মুসলমানদের জন্য প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেন। (২৮ হিজরি/৬৪৮ ঈসায়ী)
- **সাইপ্রাস বিজয়:** হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদি.-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম নৌবাহিনী ২৮ হিজরীতে সাইপ্রাস জয় করেন।

- **যাতুস সাওয়ারির বা মাস্তুলের যুদ্ধ (The Battle of Masts):**
রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র তৃতীয় কনস্টান্টাইন নবগঠিত মুসলিম নৌবাহিনীকে চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক হাজার নৌযান নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে হিজরি ৩৫ সনে (৬৫৫ ঈসায়ী)। মুসলিম বাহিনীর নৌযানের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইশ। এ যুদ্ধে নৌপ্রধান হিসেবে ছিলেন হযরত বুছর রাদি.। তাঁর নির্দেশে একদল মুসলিম সৈন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানিতে নেমে মজবুত রশি দিয়ে রোমান জাহাজগুলোর সঙ্গে মুসলিম জাহাজগুলো বেঁধে ফেলে। যেন সমুদ্রবক্ষে একখণ্ড মাটি, যেখানে সংগঠিত হচ্ছে প্রাণপণ লড়াই। মুসলিম বাহিনী আল্লাহ্‌র শত্রুদের মোকাবিলায় অসাধারণ দৃঢ়তা ও অবিচলতার পরিচয় দেয়। লড়াই এমন প্রচণ্ড ও দীর্ঘ হয় যে, এ যুদ্ধে হতাহতের রক্তে পানি রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেন। কনস্টান্টাইন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এই বিজয়ের ফলে ভূ-মধ্যসাগরে (রোম সাগরে) মুসলিম বাহিনীর কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় হয়।
- হযরত উসমান রাদি. এর খিলাফতকালে কুরআন কারীমের দ্বিতীয়বারের মত সংকলন হয়।

- **ফিতনার আত্মপ্রকাশ ও উসমান রাদি. এর শাহাদাত:**

এই ফিতনার আগুন প্রথমে প্রজ্বলিত করে সানআ অঞ্চলের আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা নামক জনৈক ইহুদি। সে নিজেকে একজন মুসলমান আলেম দাবী করে

গ্রামে ও মরু অঞ্চলের নওমুসলিমদের আকীদা নষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে থাকে। সে মানুষকে এটা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, হযরত উসমান রাদি. এর তুলনায় হযরত আলি রাদি.-ই খিলাফতের অধিক হকদার। মিশর, বসরা ও কুফার জনসাধারণকে খিলাফতের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। মদীনার ভিতরেও একদল খলীফার বিরুদ্ধাচরণ করা শুরু করে। একপর্যায়ে প্রায় দুই হাজার বিদ্রোহী মদীনায় এসে খলীফার গৃহ অবরোধ করে। মদীনায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরামগণ এমনকি স্বয়ং হযরত আলী রাদি. নিজেও বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে খলীফার কাছে যুদ্ধের অনুমতি চান। কিন্তু খলিফা উসমান রাদি. নিজের নিরাপত্তার জন্যও রক্তপাতকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আলোচনা ও সদুপদেশের মাধ্যমে বিদ্রোহীদেরকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা চরম দুঃসাহস দেখায়। অবরোধের চল্লিশতম দিন (৩৫ হিজরি সনের ১৮ জিলহজ্জ/৬৫৬ ঈসায়ীর ১৭ জুন) তারা খলিফার বাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং কয়েকজন মিলে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় খলিফাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এভাবে প্রিয় নবীজির ﷺ ভবিষ্যদ্বানীকে সত্য প্রমাণিত করে তৃতীয় খলিফা উসমান রাদি.-এর শহিদি আত্মা ছুটে চলে পরম প্রভুর পানে।

একটি ইতিহাস ভিত্তিক পর্যালোচনা:

প্রিয় ভাই! ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস যদি আমরা একটু মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ দ্বীনের প্রচার-প্রসার আর সংরক্ষণ করেছেন তাদের দ্বারা, যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য নিজেদের জানমাল জিহাদের (যুদ্ধের) জন্য ব্যয় করেছেন। ইসলাম নামক বৃক্ষটি যুগে যুগে শহিদের রক্তে স্নাত হয়ে চিরসবুজ রয়েছে, ডালপালা বিস্তৃত করেছে, আর মানবতা তার শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে মুক্তির দিশা লাভ করেছে।

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ -এর তিরোধানের পর ১১ থেকে ৩১ হিজরি (৬৩২-৬৫৩ ঈসায়ী) পর্যন্ত মাত্র বিশ বছর সময়ে শহিদগণের হিসাব করি, তাহলে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান উঠে আসে:

- রিদ্দার শহিদের সংখ্যা- ১২০০ জন।
- ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহিদের সংখ্যা- ৩০০০ জন।
- জিসর বা সেতুর যুদ্ধে শহিদের সংখ্যা- ৪০০০ জন।
- কাদিসিয়ার যুদ্ধে শহিদের সংখ্যা- ৮৫০০ জন।
- নাহাওয়ান্দ যুদ্ধে ও রোম-পারস্য বিজয়কালে হওয়া শহিদদের হিসাব বাদই দিলাম, যাদের সংখ্যা ঐতিহাসিকরা নির্ণয় করতে পারেননি। অনুরূপ মাস্তুলের যুদ্ধের শহিদদের হিসাবও করিনি, যে যুদ্ধের ব্যাপারে ইমাম তাবারি বলেছেন, এ যুদ্ধে পানির উপর রক্ত প্রাধান্য পেয়েছিল।

সবমিলিয়ে বিশ বছরে শহিদের সংখ্যা বিশ হাজারের উপর হবে, সন্দেহ নেই। অর্থাৎ 'খাইরুল কুরুন' এর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মাঝে প্রতি বছর গড়ে প্রায় এক হাজার শহিদ হয়েছেন, যারা দ্বীনের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তারা মানব পূজা থেকে মুক্ত করে মানুষকে মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র উপাসনার দিকে আনার জন্য বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন। এভাবে পারস্য সম্পূর্ণ বিজিত হয়েছে। এখান থেকে বস্তুপূজা দূরীভূত হয়েছে এবং মানুষ আনুগত্য ও ভালোবাসার সাথে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে।

সুতরাং, যারা মনে করে বা বলে, 'তরবারি দ্বারা ইসলাম প্রচার হয়নি।'- এটি মূলত একটি ঐতিহাসিক 'ডাহা মিথ্যা কথা'; ইসলামের বিরুদ্ধে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যাচার, শহিদানের রক্তের অবমাননা, ইতিহাস বিকৃতি, উম্মাহ্‌কে বিভ্রান্ত ও জিহাদ বিমুখ করার হীনপ্রচেষ্টা মাত্র। আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

হযরত আলি রাদি.-এর খিলাফত :

সময়কালঃ ৩৫- ৮০ হিজরি (৬৫৬-৬৬১ ঈসায়ী)।

হযরত আলি রাদি. এর খিলাফতের সময় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা:

- ✓ জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধ ও জঙ্গে সিফফীন সংঘটিত হয় হযরত আলি রা. এর খিলাফতকালে।
- ✓ এই সময়ই তাকফিরি উগ্র খারেজি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

হযরত আলি রাদি. এর শাহাদাত:

জঙ্গে জামালের পর হযরত আলি রাদি. ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী কুফাতে স্থানান্তরিত করেন। ৪০ হিজরি সনের সতেরই রমজান (৬৬১ ঈসায়ী সালের ২৪ জানুয়ারি) তারিখে ফজরের সময় কুফার মসজিদের সামনে আব্দুর রহমান বিন মুলজিম নামক এক খারেজি গুপ্তঘাতকের হামলায় শাহাদাত বরণ করেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি রাদি.।

শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ

মুশরিক ও ইহুদি সম্প্রদায় ইসলামের জন্মশত্রু। হঠকারিতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ধোকাবাজি আর ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, মুসলিম নেতাদের হত্যা করা- ইহুদিদের যেন জ্বীনগত বৈশিষ্ট্য। নবীজি ﷺ এদেরকে তাই মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন। ইহুদির জাত, মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা ও তার অনুসারীদের ষড়যন্ত্রে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদি. এর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর এরা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করে। মুসলমানের বেশে এরা মুসলিমদের আকীদা নষ্ট করা, ঐক্য বিনষ্ট করা, মুসলমানে-মুসলমানে যুদ্ধ লাগানো, জাল হাদীস ছড়ানো ইত্যাদি ফেতনা ছড়ানো শুরু করে।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলি রাদি. এর খিলাফতকালে মুসলমানদের অন্তর্বিরোধের সময় উম্মাহ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল হযরত আলি রাদি. এর পক্ষালম্বন করে, যারা পরিচিতি লাভ করে 'শিয়ানে আলি' বা আলির দল নামে। আর দ্বিতীয় দলটি হযরত উসমান রাদি. এর হত্যার বিচারের

দাবিতে মুয়াবিয়া রাদি. এর পক্ষালম্বন করে, যারা 'শিয়ানে উসমান' বা উসমানের দল হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। প্রথমোক্ত 'শিয়ানে আলি' নামটিই কালের পরিক্রমায় সংক্ষেপে শিয়া নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। যেহেতু তখনও পর্যন্ত উভয় দলের উদ্দেশ্য ছিল নির্দোষ ও নিষ্ঠাপূর্ণ, তাই সাহাবায়ে কেরামের যামানা পর্যন্ত এই দলটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

কিন্তু হযরত আলি রাদি. এর প্রতি হৃদ্যতা পোষণকারী দলটির মাঝে ধীরে ধীরে আকিদাগত নানা ধরনের প্রান্তিকতা সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথমে এই দাবি তোলা যে, হযরত আলি রাদি. নবীজির ﷺ সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয় হিসেবে খলিফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত ছিলেন, এরপর পর্যায়ক্রমে নবীজির ﷺ সরাসরি খলিফা দাবী করা, প্রথম তিন খলিফাকে অবৈধ ও কাফের সাব্যস্ত করা, আলি রাদি. কে নবুওয়তের উপযুক্ত দাবি করা, নবীদের তুলনায় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ দাবী করা, ইলাহ পর্যায়ের দাবি করা, আলীমুল গায়েব দাবী করা, এমনকি সৃষ্টিজগৎ পরিচালনার দাবি করা- ইত্যাদি এমন কুফুরী আকীদা শিয়ারা লালন করতে থাকে।

শিয়াদের দল উপদলের সংখ্যা একশর কাছাকাছি। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইমামিয়া সম্প্রদায়। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ শিয়ারাই এই ইমামিয়া সম্প্রদায়ের শাখাপ্রশাখা। ইমামিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তিনটি শাখা- ইছনা আশারিয়া (বারো ইমামের আকীদা পোষণকারী), যায়দিয়া ও ইসমাইলিয়া। বর্তমান ইরানের অধিকাংশ ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত। (বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতাও এদের দখলে)। নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ও ইছনা আশারিয়ার অন্তর্ভূক্ত।

২৮৬ হিজরি সনে (৮৯৯ ঈসায়ী) শামে ইসমাইলিয়া মতাদর্শের প্রচারক (পরবর্তী সময়ে উবায়দি বা ফাতিমি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) উবায়দুল্লাহ আল মাহদি নিজেকে হযরত ফাতিমা রাদি. এর বংশধর দাবী করতো। এর অনুসারীদেরকে 'ফাতিমিয়া' শিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

হিজরি পঞ্চম শতকে আবির্ভূত কুখ্যাত ফেদায়ী 'হাশাশিন' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা হাসান ইবনে সাবাহ ছিল ইসমাইলি ধর্মপ্রচারক।

শিয়ারা সাধারণভাবে কাফের। তবে কিছু কিছু দল এর ব্যতীক্রম।

তৃতীয় অধ্যায়: উমাইয়া খিলাফত

সময়কালঃ ৪১-১৩২ হিজরি (৬৬১-৭৫০ ঈসায়ী)। ৭১১-১০৩১ ঈসায়ী (ইউরোপের স্পেনের কর্ডোভা অংশ)

শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ জাযীরাতুল আরব, আফ্রিকার উত্তর অংশ, ইউরোপের বিশাল বিস্তৃত এলাকা, পূর্বে ভারতবর্ষের ও চীনের কিছু অংশ, উত্তরে শামদেশ ও রাশিয়ার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। আয়তন ১,৫০,০০,০০০ বর্গ কিমি।

(বর্তমানে- আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, অ্যান্ডোরা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, চীন, সাইপ্রাস, মিশর, ইরিত্রিয়া, ফ্রান্স, জর্জিয়া (রাষ্ট্র), জিব্রাল্টার (যুক্তরাজ্য), গ্রীস, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, জর্ডান, কাজাখস্তান, কুয়েত, কিরগিজিস্তান, লেবানন, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, পর্তুগাল, কাতার, রাশিয়া, সৌদি আরব, সোমালিয়া, স্পেন, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান, ইয়েমেন, পশ্চিম সাহারা)

UMAYYAD CALIPHATE AT ITS GREATEST EXTENT, 750 CE
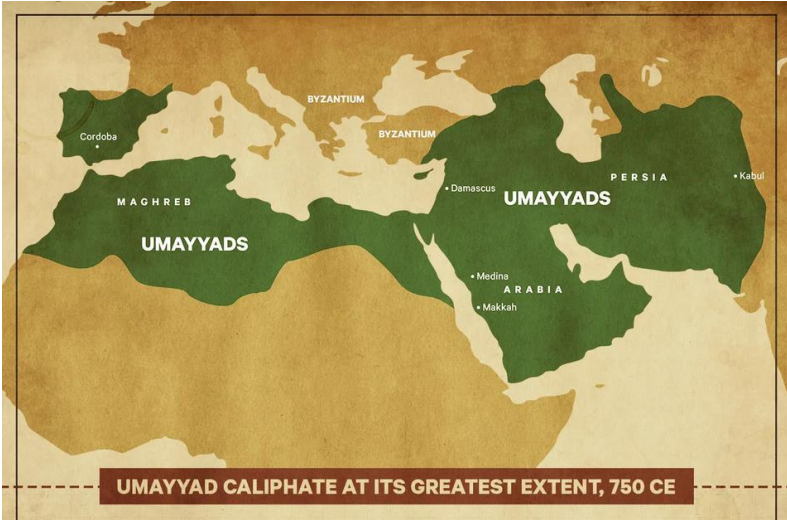
সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

হযরত আলি রাদি. এর ইন্তেকালের পর মদিনার মুসলমানগণ হযরত হাসান বিন আলি রাদি. এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করে। এর মাত্র ছয় মাস পর ৪১ হিজরি সনে হযরত হাসান রাদি. উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতির বৃহত্তর স্বার্থে হযরত মুয়াবিয়া রাদি. এর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এভাবে, উমাইয়া বংশের শাসন হযরত আমির মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) কর্তৃক সূচিত হয়। তিনি দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। ফলে সিরিয়া উমাইয়াদের ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে উঠে এবং দামেস্ক তাদের রাজধানী হয়।

উমাইয়ারা মুসলিমদের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখে। পশ্চিমে তাদের অভিযান আন্দালুস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পূর্ব দিকে **মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস্ সাকাফির** হাতে বিজিত হয়েছিল সিন্ধু অঞ্চল, **কুতায়বা বিন মুসলিম আল বাহিলির** হাতে বিজিত হয়েছিল ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মধ্য এশিয়া/মাওরাউন নাহার) অঞ্চল; তার বিজয়াভিযান বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর চীন পর্যন্ত। আর **মাসলামা বিন আব্দুল মালিক আল মারওয়ানির** হাতে বিজিত হয়েছিল উত্তরের ককেশাস অঞ্চল। সীমার সর্বোচ্চে পৌছালে উমাইয়া খিলাফত মোট ৫৭৯ মিলিয়ন বর্গ মাইল (১,৫০,০০,০০০ বর্গ কিমি) অঞ্চল অধিকার করে রাখে। তখন পর্যন্ত বিশ্বের দেখা সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ ছিল। অস্তিত্বের সময়কালের দিক থেকে এটি ছিল পঞ্চম। পরবর্তীতে ১৩২ হিজরি/ ৭৫০ ঈসায়ীতে আব্বাসীদের হাতে এই খিলাফতের পতন ঘটে। আর এই পরিবারের একটি শাখা উত্তর আফ্রিকা হয়ে আন্দালুস চলে যায় এবং সেখানে উমাইয়া সাম্রাজ্য (আন্দালুস) প্রতিষ্ঠা করে। এ খিলাফত ৪২২ হিজরি (১০৩১ ঈসায়ী) পর্যন্ত টিকে ছিল এবং আন্দালুসের ফিতনার পর এর পতন হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির বলেন, "উমাইয়া রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সর্বদা উজ্জীবিত ছিল। তাদের যেন জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো ব্যস্ততাই ছিল না। তাদের শাসনামলে পৃথিবীর পূর্বে-পশ্চিমে, জলে স্থলে সর্বত্র ইসলামের কালিমা সমুন্নত হয়। তারা কুফর ও কুফুরি শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছেন। উমাইয়া শাসনামলে কাফির মুশরিকদের অন্তরাত্মা মুসলিম জাতির

প্রভাব-ভীতিতে প্রকম্পিত থাকত। মুসলিম অভিযাত্রীগণ যে অঞ্চলেই অভিযান পরিচালনা করত , তা-ই জয় করত।”

উমাইয়া খিলাফতের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিঃ

- **কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা:** উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফা ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এর শাসনামলে ইরাকের কুফাবাসীর প্রতারণামূলক আহ্বানে হযরত হুসাইন রাদি. বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে কুফার দিকে গমন করেন। ৬১ হিজরি সনের ১০ মুহার্‌রম (৬৮০ ঈসায়ীর ১০ অক্টোবর) তারিখ হযরত হুসাইন রাদি. কারবালার সন্নিকটে ইরাক থেকে আগত কুফার গভর্নর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বাহিনীর হাতে শহিদ হন। এরপর হুসাইন রাদি. এর কর্তিত মস্তক খলিফা ইয়াযিদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হযরত হুসাইন রাদি. কে হত্যা করার ইচ্ছা ইয়াযিদের ছিল না, তিনি কেবল চেয়েছিলেন হুসাইন রাদি. যেন বিদ্রোহ থেকে সরে এসে তার হাতে বাইয়াত দেন। হুসাইন হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে ইয়াযিদ ব্যথিত হয়ে অশ্রুপাত করেন এবং হুসাইন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সদাচরণ করেন।
- **ইসলামী রাষ্ট্রের নিজস্ব মুদ্রা চালু:** ৭৬ হিজরি সনে (৬৯৫ ঈসায়ীতে) উমাইয়া পঞ্চম খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করেন এবং এর দ্বারা মুসলিম সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হয়।
- পঞ্চম খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বাইতুল মুকাদ্দাসের কুব্বাতুস্ সাখরা (The Dome of the Rock) নির্মাণ করেন।
- **আন্দালুস বিজয়:** তাঞ্জিয়ার প্রশাসক তারিক বিন যিয়াদ রাহি. ৯৩ হিজরী সনে (৭১২ ঈসায়ী) আন্দালুসের রাজধানী টলেডো (বর্তমান স্পেনের অন্যতম প্রাচীন নগরী) জয় করেন।
- **বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধ:** আন্দালুসের প্রশাসক আব্দুর রহমান আল গাফিকি’র নেতৃত্বে ১১৪ হিজরিতে (৭৩২ ঈসায়ী) ফ্রান্সের তুরস্ (Tours) নগরীতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক বিপর্যয় হয়। অনেক মুজাহিদ শহীদ হন।

- **হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. এর খিলাফত: [৯৯-১০১ হিজরি (৭১৭-৭২০ ঈসায়ী)]**
  তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের অষ্টম খলিফা। তাঁর মাতা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. এর পুত্র আছিমের কন্যা। তিনি ছিলেন হিজরি প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক। 'আদল ও ইনসাফের' জন্য তাঁকে ইসলামের খোলাফায়ে রাশেদার পঞ্চম খলিফা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জনৈক ক্রীতদাস বনু উমাইয়ার পক্ষ হতে ষড়যন্ত্র করে তার খাবার বা পানীয়তে বিষ প্রয়োগ করে শহিদ করে।

- **বুখারা ও সমরখন্দ বিজয়:** বীর সেনানী কুতায়বা বিন মুসলিম আল বাহিলি রহ. ৯০ হিজরি সনে (৭০৯ ঈসায়ী) তুর্কিস্থানের বুখারা এবং ৯৩ হিজরি সনে (৭১১ ঈসায়ী) সমরকন্দ জয় করেন।

- **ভারতবর্ষে অভিযান:** উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ৯০ হিজরি সনে একটি আরব বণিক কাফেলা সরনদ্বীপ (সিলন/বর্তমান শ্রীলংকা) থেকে আঠারটি জাহাজে করে ইরাকে ফেরার পথে সিন্ধুর দেবল বন্দর (বর্তমানে পাকিস্তানের করাচী) অতিক্রম করার সময় একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা জাহাজগুলোকে লুট করে ও মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের দেবলে নিয়ে কারাগারে আটকে রাখে। এই ঘটনার পিছনে সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের সরাসরি মদদ ছিল। এই খবর তৎকালীন ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পৌঁছলে তিনি প্রথমে কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথমে পরপর দুটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যার দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয় এবং দুজন সেনাপতিই শহিদ হন।
  অতঃপর ৯২ হিজরি সনে হাজ্জাজ তার ভাতিজা ও জামাতা মুহাম্মাদ বিন কাসিম আস্ সাকাফির নেতৃত্বে সিন্ধু অভিমুখে বার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম পথিমধ্যে অনেক অঞ্চল জয় করে অবশেষে ৯৩ হিজরীতে দেবল নগরী ও দেবল দুর্গ জয় করে মুসলমান নর-নারী আর শিশুদের উদ্ধার করেন।

এরপর মুহাম্মাদ বিন কাসিম আরো কিছু অঞ্চল জয় করে একই বছর মুসলমান বাহিনী নিয়ে জয়পুরে শিবির স্থাপন করেন। সিন্ধু পৌঁছলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আরও চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। সব মিলিয়ে মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ষোল হাজার।

কাছেই রাজা দাহিরের শিবির ছিল। রাজা দাহির একশ হাতিসহ পাঁচ হাজার রাজপুতদের একটি বিশেষ বাহিনী, দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য (সব মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য) নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ অসম এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অবশেষে রব্বে কারীমের সাহায্যে তাওহীদবাদী মুজাহিদগণ বিজয় অর্জন করেন।

- **উমাইয়া খিলাফতের পতন:** উমাইয়া খিলাফতের শেষ সাত বছর ছিল নানা ট্রাজেডি এবং 'মানহাজে নববী' হতে বিচ্যুতির ইতিহাস। কুদরতের নিয়ম মেনেই তখন 'সুন্নাতুল্লাহ' কার্যকর হয়, উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে আর বনু আব্বাসের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়: আন্দালুসের ইতিহাস

- **আন্দালুস বিজয়:**

সিউটা প্রশাসক জুলিয়ানের আহ্বানে তাঞ্জিয়ার প্রশাসক তারিক বিন যিয়াদ রাহি. ৯২ হিজরি সনে (৭১১ ঈসায়ী) মোট বার হাজার সৈন্য নিয়ে আন্দালুসে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন। আইবেরিয়ান উপদ্বীপকেই অতীতে আন্দালুস বলা হত। আধুনিক রাষ্ট্রসীমার স্পেন, পর্তুগাল ও অ্যান্ডোরা এই তিনটি দেশের, পাশাপাশি ফ্রান্সের অংশ এই আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অন্তর্ভূক্ত। আন্দালুসের শাসক রডারিক রাজধানী টলেডো হতে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হয়। উভয় বাহিনী সাজুনা নগরীর নিকটবর্তী বারবাত বা লুক্কা উপত্যকায় মুখোমুখি হয়। একটানা আটদিন যুদ্ধ চলার পর রডারিক বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। তারিক বিন যিয়াদ বিজয়াভিযান অব্যাহত রেখে ৯৩ হিজরী সনে (৭১২ ঈসায়ী) আন্দালুসের রাজধানী টলেডো (বর্তমান স্পেনের অন্যতম প্রাচীন নগরী) জয় করেন।

মানচিত্র: উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম আন্দালুস (সবুজ অংশ)

সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ রাহি. ছিলেন আফ্রিকার প্রশাসক মুসা বিন নুসায়রের রাহি. অধীন। বাহিনীর নিরাপত্তা-ঝুঁকি বিবেচনা করে তারিকের প্রতি মুসা বিন নুসায়রের নির্দেশ ছিল, তিনি যেন আন্দালুসের বেশি গভীরে প্রবেশ না করেন। কিন্তু একের পর এক সহজ বিজয় তারিক বিন যিয়াদকে সম্মুখে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে। এক পর্যায়ে তিনি পুরো বাহিনী সহ নিজেকে অবরুদ্ধ আবিষ্কার করেন। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি মুসার কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে ৯৩ হিজরিতে মুসা বিন নুসায়ের রাহি. আঠার হাজার সৈন্য নিয়ে

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজেই আন্দালুসে পা রাখেন এবং উভয়ে মিলে একের পর এক নগরী জয় করতে থাকেন।

মুসলিম জাহানের তৎকালীন খলিফা ছিলেন ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। মুসা বিন নুসায়ের তার কাছে বিজয়-বার্তা পাঠালে তিনি কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হয়ে পড়েন।

- **বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধঃ**

আন্দালুসের প্রশাসক আব্দুর রহমান আল গাফিকি রাহি. ১১৪ হিজরিতে (৭৩২ ঈসায়ী) সত্তর হাজার (মতান্তরে এক লক্ষ) মুসলিম সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে ফ্রান্স আক্রমন করেন। ফ্রান্সের তুরস্ (Tours) নগরীতে ফ্রাঙ্কদের সাথে মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হয়। আটদিন চলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের পাল্লা মুসলমানদের দিকে ভারী ছিল। ফ্রাঙ্ক বাহিনীর একটি অংশ মুসলমানদের সারি ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের পূর্বে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্তুপের কাছে পৌঁছে যায়। গনিমত হারানোর চিন্তায় মুসলমানদের মাঝে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেনাপতি আব্দুর রহমান আল গাফিকি রাহি. মুসলিম সৈন্যদের যুদ্ধে অবিচল থাকার এবং গনিমতের জন্য অস্থির না হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেনাপতি নিজে শহীদ হন। অনেক মুসলিম সৈন্য এ যুদ্ধে শহীদ হন। যে গনিমতের লোভে মুসলমানদের পরাজয় হল সেগুলোকে রাতের আঁধারে ফেলে রেখে মুসলিম বাহিনী গোপনে কেটে পড়ে।

প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) বলেন, "আরবরা যদি তুরসের যুদ্ধে জয়লাভ করতো, তাহলে আজ অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসির চর্চা হতো।"

- আন্দালুসে বনু উমাইয়ার স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র একশ বছর পর ২৩৮ হিজরি থেকে ৩০০ হিজরি পর্যন্ত সময়ে ইসলামি আন্দালুস খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কয়েকটি এলাকা নিয়ে একেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হতে থাকে এবং বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলো নিজেদেরকে সাম্রাজ্য দাবী করতে থাকে। অপরদিকে বনু উমাইয়ার শাসন ও কর্তৃত্ব রাজধানী কর্ডোভা ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো, এই রাষ্ট্রগুলো

একে অপরের বিরুদ্ধে পার্শ্ববর্তী উত্তরের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর কাছে সহযোগিতা কামনা করা শুরু করে।

- উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আন নাসির লি দ্বীনিল্লাহ্-এর নেতৃত্বে ইসলামি আন্দালুস পুনরায় একক সাম্রাজ্যের পরিণত হয়। তার শাসনকাল ৩০০-৩৫০ হিজরি (৯১৩-৯৬১ ঈসায়ী)। ৩১৬ হিজরি সনে আন্দালুসে আব্দুর রহমান আন-নাসির নিজেকে স্বতন্ত্র খলিফা ঘোষনা করে। এরফলে মুসলিম বিশ্ব তখন খিলাফত প্রশ্নে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়- বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসী খিলাফাহ, কর্ডোবা কেন্দ্রিক উমাইয়া খিলাফাহ আর আফ্রিকায় মিশর কেন্দ্রিক উবায়দি (ফাতিমি শিয়া) খিলাফাহ।

মানচিত্র: আব্দুর রহমান আন নাসির লি দ্বীনিল্লাহ্‌র সময় ইসলামিক আন্দালুসে বিজয়াভিযান। (হলুদ অংশ)

- ৪২২ হিজরি সনে (১০৩১ ঈসায়ী) খলিফা মুতামিদ বিল্লাহ্‌র পতনের মধ্য দিয়ে আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে। আন্দালুসে মোট উমাইয়া শাসকের সংখ্যা ছিল উনিশজন।
উমাইয়াদের পতনের পর আন্দালুস আবারো খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। একে তাইফা (বিভক্ত) শাসকদের যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

- হায়! তৎকালীন আন্দালুসের খ্রিস্টান অংশের প্রতাপশালী নেতা ষষ্ঠ আলফোন্সোকে ইসলামী শাসকগণ উপহার সামগ্রী ও উচ্চ মূল্যের কর প্রদান করে তার সুদৃষ্টি ও সহযোগিতা লাভের প্রতিযোগিতা করত। মুসলিম শাসকদের এই নতজানু নীতি এবং ইসলামী আন্দালুসের অস্থিতিশীল

মানচিত্র: ষষ্ঠ আলফোন্সোর সময় ইসলামিক আন্দালুস (সবুজ অংশ)

ও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি আলফান্সোকে ইসলামি ভূ-খণ্ডের প্রতি লালায়িত করে তোলে এবং সে মুসলমানদের কাছ থেকে লাভ করা সম্পদ ব্যবহার করেই ইসলামি ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে একের পর এক ইসলামি দুর্গ জয় করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪৭৮ হিজরি (১০৮৫ ঈসায়ী)-তে আন্দালুসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী টলেডো জয় করে ফেলে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই সে পুরো ইসলামী আন্দালুস গিলে ফেলবে।

- **ইউসুফ বিন তাশফীনঃ লাঞ্ছনার মাঝে এক টুকরো বীরত্ব-গৌরব!**

এসময় মুসলিম শাসকবৃন্দ অনুভব করেন যে, প্রণালির ওপারের আফ্রিকার মুরাবিতি সাম্রাজ্যের শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনই পারেন এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইসলামি আন্দালুসের সহায়তায় এগিয়ে আসতে। ইউসুফ বিন তাশফিনের নেতৃত্বাধীন মুরাবিতি সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন মাগরিব অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। আর তাই আন্দালুসবাসী তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র প্রতি সহজাত আকর্ষণের দাবীতে ইউসুফ বিন তাশফিন তাদের ডাকে সাড়া দেন।

- **জাল্লাকার যুদ্ধঃ (The Battle of Zallaqa/ Sagrajas):**

ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বাহিনী নিয়ে 'জাবালে তারিক' (জিব্রাল্টার) প্রণালি পাড়ি দিয়ে আন্দালুস উপকূলের জাযিরাতুল খাযরায় অবতরণ করেন।

এদিকে খ্রিস্টান অধিপতি ষষ্ঠ আলফোন্সো এক বিশাল বাহিনী গঠন করে। তার বাহিনীর বিশালতা দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই বলে উঠে, "এই সুবিশাল বাহিনী নিয়ে আমি জিন-মানুষ এমনকি আসমানের ফেরেশতাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারি।" তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে সর্বোচ্চ যে হিসাব পাওয়া যায় তা এই- তার বাহিনীর অশ্বারোহীই ছিল আশি হাজারের উপর। পদাতিক ছিল দুই লক্ষের উপর। সব মিলিয়ে তিন লক্ষের উপর। [ইসলামী ইতিহাস, ড. রাগেব সারাজানী] অন্যদিকে, মুসলিম সৈন্যদের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। তবে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সম্পর্কে সর্বনিম্ন যে হিসাব পাওয়া যায় সে অনুযায়ী মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র বিশ হাজার। [https://bit.ly/zallaqa]

বাতালইয়ুসের নিকটবর্তী জাল্লাকা প্রান্তরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়।

যখন উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের দিন নির্দিষ্ট করার জন্য পত্র বিনিময় হয়, তখন আলফোন্সো প্রতারণার আশ্রয় নেয় এবং বলে যে, "আগামীকাল শুক্রবার আর তা মুসলিমদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। তাই সেদিন আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই না। তার পরের দিন শনিবার, আর তা ইহুদীদের আনন্দের দিন। যেহেতু আমাদের এ অঞ্চলে প্রচুর ইহুদী আছে, তাই আমাদের উচিত তাদের দিকটিও খেয়াল রাখা। আর এর পরদিন হলো রোববার, আমাদের আনন্দের দিন।। সুতরাং , আসুন, আমরা এসব আনন্দের দিনগুলোর সম্মান বজায় রাখি। সোমবারেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হবে।"

৪৭৯ হিজরি সনের ১২ রজব (১০৮৬ ঈসায়ীর ২৩ অক্টোবর) শুক্রবার বাদ ফযর ইউসুফ বিন তাশফীন যখন ফজরের নামাজের উদ্দেশ্যে বের হন, তখনই খ্রিস্টান বাহিনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য আন্দালুসের খ্রিস্টানদের সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় মুসলিমরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। শুরু হয় ইতিহাসের অন্যতম আরেকটি ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধ। মুসলিম বাহিনী প্রবল বিক্রমে খ্রিষ্টান সৈন্যদের মুলা-গাজর আর টমেটোর মত কাটতে থাকে। অল্পসময়ের মাঝে সুবিশাল খ্রিষ্টান বাহিনীর পতন ঘটে। এরপর আলফোন্সো বাহিনীর কী হল, জানেন কী? দাম্ভিক আলফোন্সো মাত্র পাঁচশ ক্রুসেডার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হয়। তার মানে?

তার মানে হল, প্রায় তিন লক্ষ ক্রুসেডার সৈন্য মুজাহিদদের হাতে একদিনেই নিহত হয়। অন্যদিকে মাত্র তিন হাজার মুজাহিদ শহিদ হন। সুব্হানাল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য, যিনি মুজাহিদদের পাশে সব সময় থাকেন।

وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ١٢٦

"আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে।" (সূরা আল ইমরান ৩:১২৬)

فَلَمۡ تَقۡتُلُوهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمۡۚ وَمَا رَمَيۡتَ إِذۡ رَمَيۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ।" (সূরা আনফাল ৮:১৭)

- **আন্দালুসে মুরাবিতি শাসনঃ**
  আন্দালুসের শাসকদের বিভক্তি, অবাধ্য আচরণ, খ্রিস্টানদের সঙ্গে সখ্যতা, বিলাসিতা, অপচয় ও প্রজাদের উপর অন্যায় করারোপ, অন্যদিকে মুসলিম জনগণের চাহিদা, ন্যায় শাসন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন রাহি. এর প্রতি উলামায়ে কেরামের ফতোয়া-ইত্যাদি বিবেচনা করে তিনি আন্দালুসের বিজয়াভিযান পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ হন। গ্রানাডা হতে তিনি তার অভিযান শুরু করেন এবং ৪৯৫ হিজরি (১১০২ ঈসায়ী) পর্যন্ত ব্যাপ্ত অভিযানের মাধ্যমে বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এর ফলে পুরো ইসলামী আন্দালুস আফ্রিকার মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। মুরাবিতি শাসনের মাধ্যমে শান্তি ফিরে আসায় আন্দালুসের মুসলমানগণ সীমাহীন আনন্দিত হয়।

- এরপর আন্দালুসে মাগরিবকেন্দ্রিক মুওয়াহিদি শাসন চলে ৫৪১-৬২০ হিজরি (১১৪৭-১২২৪ ঈসায়ী) পর্যন্ত। এই আমলে ইকাবের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী খ্রিস্টানদের হাতে পরাভূত হয় এবং মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইকাব যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আন্দালুসের অধিকাংশ বড় বড় নগরী খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যায়। একমাত্র গ্রানাডা থেকে যায় মুসলিমদের হাতে। এবং সেখানে বনু আহমার (বনু নাসর) এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর প্রায় আড়াইশ বছর মুসলিম গ্রানাডা অঞ্চল খ্রিস্টান স্পেনের মোকাবিলায় টিকে থাকে।

চিত্র: বনু্ আহমারের সময় ইসলামিক আন্দালুস। (সবুজ অংশ)

- **আন্দালুসের পতনঃ** কালের পরিক্রমায় আন্দালুসের মুসলমানগণ ঐশ্বর্য ও বিলাসী জীবনের হাতছানিতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভুলে যায় নিজেদের পরিচয় এবং শত্রুর পরিচয়। তারা ভুলে যায় 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ্'র আকীদা। ভুলে যায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র আদর্শ! ভুলে যায় যুগে-যুগে কারা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে এবং কারা তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে একজোট হয়েছে। আর তাই আন্দালুস ও ইসলামের শত্রুরা যখন তরবারিতে শান দিচ্ছিল

এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আন্দালুসের মুসলমানরা তখন মত্ত ছিল সুর ও সুরার নেশায় এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতায়। ফলাফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছিল।

গ্রানাডার মুসলমান শাসকরা যখন বিলাসী জীবনে গা ভাসিয়ে দিচ্ছিল, খিস্টান স্পেন তখন নবোদ্যমে জেগে উঠে ঐক্যের শক্তি অর্জনে সচেষ্ট ছিল। অ্যারোগানের শাসক ফার্ডিনান্ড এ সময় ক্যাস্টোলার রানি ইসাবেলাকে বিয়ে করে এবং গ্রানাডার বিরুদ্ধে উভয় খ্রিস্টান রাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়। ফার্ডিনান্ড বাহিনী একের পর এক অভিযান চালিয়ে গ্রানাডার বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে থাকে। অবশেষে ৮৯৭ হিজরি সনের ২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৪৯২ ঈসায়ীর ২ জানুয়ারি আন্দালুসের শেষ ইসলামি দুর্গ গ্রানাডার পতন ঘটে।

গ্রানাডার পতনের পর পোপের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণে বাধ্য করার নির্দেশ জারি করা হয়। মুসলমানদের উপর নেমে আসে ভয়াবহ-দুর্বিষহ অত্যাচার, নির্যাতনের ষ্টীমরোলার আর গণহত্যা। রানি ইসাবেলা মরিস্কোদের (আন্দালুসী মুসলিম) নির্যাতন করার জন্য স্প্যানিশ তদন্ত কমিশন (The Tribunal of Inquisition) নামে খুনি একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। শতাব্দীকাল পরেই ১০১৭ হিজরি সনের (১৬০৯ ঈসায়ীর) মধ্যে স্পেন মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। স্পেনের পতনের পর সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ মুসলমানকে। অপরদিকে যারা স্প্যানিশ খ্রিস্টানদের নির্মম গণহত্যার শিকার হয়, তাদের সংখ্যাও এর কম নয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন.........

হায়! কোথায় গ্রানাডা, কোথায় লড়াই, কোথায় সংগ্রামের পুন্যভূমি? কোথায় হাজারো সিংহপুরুষ, বীর মুজাহিদের হুংকারধ্বনি?! কোথায় গ্রানাডার সেই বিখ্যাত মসজিদ? হাজারো নামাজির তিলাওয়াতের গুঞ্জরণ? কত আলিম, কত আলোক প্রদীপ! কোথায় তাদের জ্ঞান বিতরণ?? কোথায় হারাল আল্লাহপ্রেমে গণ্ডদেশে অশ্রুতুফান! কত আবিদ! কত আল্লাহপ্রেমিক! কত রোনাজারি আর কত ক্রন্দন!

পঞ্চম অধ্যায়: আব্বাসী খিলাফত

সময়কালঃ ১৩২-৯২৩ হিজরি (৭৪৯-১৫১৭ ঈসায়ী)।

শাসন এলাকার বিস্তৃতিঃ পশ্চিমে জাযীরাতুল আরব, আফ্রিকার উত্তর অংশ, পূর্বে ভারতবর্ষের ও চীনের কিছু অংশ, উত্তরে শামদেশ ও রাশিয়ার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। আয়তন ১,১১,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

(বর্তমানে দেশসমূহঃ অ্যান্ডোরা, আজারবাইজান, আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, ইসরায়েল, উজবেকিস্তান, ওমান, কাজাখস্তান, কাতার, কিরগিজিস্তান, কুয়েত, জর্জিয়া, জর্ডান, জিব্রাল্টার, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, পর্তুগাল, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, মাল্টা, মিশর, রাশিয়া, লিবিয়া, লেবানন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সাইপ্রাস, সিরিয়া, সৌদি আরব।)

আব্বাসী খিলাফতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

আব্বাসীয় খিলাফত নবী মুহাম্মদ (সা) এর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের কর্তৃক ১৩২ হিজরি (৭৫০ ঈসায়ী) কুফায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আস্‌-সাফাহ আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. এর বাহিনী উমাইয়াদের সমূলে নিঃশেষ করে উমাইয়া খিলাফতের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ আন্দালুস ব্যতীত পুরো মুসলিম বিশ্বে আব্বাসী খিলাফা কায়েম করেন। ৭৬২ ঈসায়ীতে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। এই যুগে মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়। এক পর্যায়ে খলিফারা বিলাসিতায় গা ভাসালে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ দখলের পর ১২৫৮ ঈসায়ীতে (৬৫৬ হিজরি) আব্বাসীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়। এর পর মামলুক শাসিত মিশরে অবস্থান করে তারা ১৫১৭ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত নামে মাত্র ধর্মীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব থাকে। ১৫১৭ সালে (৯২৩ হিজরি) মিশরে উসমানীয়দের দ্বারা মামলুকদের পতন ঘটলে আব্বাসী খিলাফাতের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটে ও উসমানী খেলাফত শুরু হয়।

আব্বাসী খিলাফত আমলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহঃ

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে আব্বাসি খিলাফত বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এসব রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণই স্বাধীন ও আব্বাসী খলিফার কর্তৃত্বমুক্ত। সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে এসব বিচ্ছিন্নতা দাবীদারদের দমন করার শক্তি তখন খিলাফতের ছিল না। আব্বাসী খলিফাদের উপর তুর্কি মামলুকদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে ইসলামী খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা তারা কেবল প্রভাব বিস্তার করেই তুষ্ট ছিল, খিলাফতকে শক্তিশালী করার কোন ফিকির তাদের ছিল না। ফলে আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নররা খিলাফতের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এসব

স্বাধীনরাষ্ট্রের মধ্যে কিছু ছিল আব্বাসি খিলাফতের সাথে মিত্রতা বজায়কারী, তারা মিম্বরে খুৎবায় আব্বাসি খলিফার জন্য দুআ করতো, মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করত। আর বিপরীতে কিছু রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচয়ধারী। এরা আব্বাসী খিলাফতের সাথে সম্পর্ক তো রাখতই না, বরং খিলাফতের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করতো।

নিম্নে তৎকালীন সময়ের কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা হল-

১. আন্দালুস রাষ্ট্র।
২. মসুল ও আলেপ্পো কেন্দ্রিক জিনকি রাষ্ট্র।
৩. আফ্রিকার মিশরে ছিল যথাক্রমে উবায়দিদের (ফাতিমি শিয়া) শাসন, আইয়ুবী শাসন, মামলুক শাসন।
৪. মরক্কোয় ছিল ইদরিসি শাসন।
৫. মিশর ও শামে ছিল ইখশিশিদের শাসন।
৬. ইরাকে ছিল দায়লামিদের শাসন।
৭. আম্মান, ইয়েমেন, বাহরাইন ও বসরার বাদিয়া অঞ্চলে ছিল কারামাতিয়াদের শাসন।
৮. পারস্য ও আহওয়াজে ছিল শিয়া বুওয়াইহি পরিবারের শাসন।
৯. মাওরাউন নাহার ও খোরাসানের কিছু অংশ নিয়ে ছিল সামানি পরিবারের শাসন।
১০. খোরাসান ও মাআরাউন নাহার কেন্দ্রিক খাওয়ারিজম রাষ্ট্র।
১১. বর্তমান আফগানিস্তানে ছিল গজনবি বা সুবুক্তগীন রাষ্ট্র, ইত্যাদি।

বি.দ্রঃ উমাইয়া শাসনব্যবস্থার পতন ও আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠার পর ইসলামি বিশ্বের নানা অংশে বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও আব্বাসি খলিফা ব্যতীত কেউ নিজেকে খলিফা দাবী করেনি। ২৯৭ হিজরি সনে যখন উবায়দি (ফাতিমি শিয়া) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উবায়দুল্লাহ আল মাহদি নিজেকে খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন দাবি করে, মূলত তখনই মুসলিমবিশ্ব প্রথমবারের মত খিলাফত প্রশ্নে বিভক্তির শিকার হয়। উনিশ বছর পর ৩১৬ হিজরি সনে আন্দালুসে আব্দুর রহমান আন-নাসিরও নিজেকে খলিফা ঘোষণা করে, তখন মুসলিম বিশ্ব খিলাফত প্রশ্নে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাতাশি বছর পর ৪০৩ হিজরিতে কর্ডোভা কেন্দ্রিক খিলাফতব্যবস্থার পতন ঘটলে মুসলিমবিশ্ব

আবারো দুই খলিফার যুগে প্রবেশ করে। এরপর ৫৬৭ হিজরিতে উবায়দি (ফাতিমি) খিলাফতের পতন হলে, মুসলিম বিশ্ব আবারো একক আব্বাসী খলিফার অধীনে চলে আসে।

আব্বাসী খিলাফতের সময় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা:

আব্বাসী খিলাফতের দীর্ঘ সময়কালকে ছয়টি মৌলিক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **প্রথম ভাগ: আব্বাসী খিলাফতের প্রতাপ ও সমৃদ্ধিকালের খলিফাগণের শাসনামল:**

সময়কাল: ১৩২-২৪৭ হিজরি (৭৪৯-৮৬১ঈসায়ী)

খলিফাগণ: ১-১০নং আব্বাসী খলিফা

✓ বাগদাদ নগরী নির্মাণ: দ্বিতীয় খলিফা মানসুর ১৪৬ হিজরি সনে আঠারো লক্ষ দিনার ব্যয়ে বাগদাদ নগরী নির্মাণ করেন। খলিফা মানসুর ইসলামী বিশ্বের প্রত্যেক অঞ্চল ও নগরী হতে আলিমদেরকে এনে বাগদাদে সমবেত করেন। আব্বাসি শাসনামলে বাগদাদ পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র, সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী এবং ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগারে পরিণত হয়। একসময় বাগদাদের জনগণ বিশ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

✓ পঞ্চম খলিফা হারুনুর রশিদ প্রতিদিন নিজ সম্পদ হতে এক হাজার দিনার সাদাকা দিতেন এবং প্রতিদিন একশ রাকাত নফল নামায পড়তেন। তিনি মোট নয়বার হজ্ব করেন। তিনি এক বছর হজ্বে যেতেন, আরেক বছর জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্য় বের হতেন। তিনি সশরীরে সাতবার জিহাদে বের হয়েছেন এবং স্থল ও নৌপথে জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন বিশটি বাহিনী। তিনি বাগদাদে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা প্রায় পাঁচ শতক ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠাগার বলে বিবেচিত হয়।

✓ সপ্তম খলিফা মামুনের আমলে মুসলিম বিশ্বে ইলমুল কালাম চর্চার সূচনা ও উৎকর্ষ ঘটে। মেধা ও যুক্তিনির্ভর এই শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হলো আকিদা-বিশ্বাস, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ। উমাইয়া শাসনামলের শেষের দিকে উদ্ভূত ভ্রান্ত মুতাজিলা সম্প্রদায় আব্বাসি আমলে উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি লাভ করে। এতে খলিফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিকের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের

সাথে মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধিভিত্তিক মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য ঘটে, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল- আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন নিত্য ও শাশ্বত, নাকি মাখলুক ও সৃষ্ট?

- ✓ অষ্টম খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ ছিলেন বীর, দুঃসাহসী ও সুউচ্চ সংকল্পশক্তির অধিকারী। তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারী। কয়েকজন পুরুষের ভার একাই বহন করতে পারতেন। বড় বড় বীর যোদ্ধারা অক্ষম হওয়ার পর তিনি কয়েকবার লোহাকে দু-টুকরা করতে পারতেন।
- ✓ বাইজান্টাইন সম্রাট থিওফেল (Theophilos) আব্বাসী রাষ্ট্রের সীমান্ত নগরী যিবাতরায় হামলা চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি অনেক মুসলিম মা-বোনকে বন্দি করে নিয়ে যায়। জনৈক হাশিমি বোন রোমানদের হাতে বন্দি অবস্থায় 'হায় মু'তাসিম!' বলে চিৎকার করেছে, খলিফা মুতাসিম যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তখন সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন, লাব্বাইক! আমি উপস্থিত আছি, হে আমার বোন। এরপর তিনি নফীরে আম-এর ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত নগরী 'আম্মুরিয়া'কে পঞ্চান্ন দিন অবরোধ করে রাখার পর মুজাহিদ বাহিনী তা জয় করে এবং অপহৃত হাশিমি মুসলিম বোনকে উদ্ধার করে।
- ✓ খলিফা মামুনের মতো মুতাসিমও 'কুরআন মাখলুক/সৃষ্ট'-এই আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। সে জনগণকে এ মতবাদ মেনে নিতে চাপ প্রয়োগ করে। বিশেষ করে বিখ্যাত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-কে জেলবন্দি ও তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়।
- ✓ নবম খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ্ পূর্ববর্তী দুই খলিফার মতো মুতাজিলা মতাদর্শী ছিল। সে রাতদিন খালকুল কুরআন মতাদর্শ প্রচার করত। তার সবচেয়ে গর্হিত ও অমার্জনীয় অপরাধ ছিল 'কুরআন সৃষ্ট' এই মতবাদ বিরোধী বিশিষ্ট আলিম আহমাদ বিন নছর বিন মালিক রাহি. কে নিজ হাতে শহীদ করা এবং তার কর্তিত মস্তক ২৩১-২৩৭ হিজরি (৮৪৬-৮৫২ঈসায়ী) পর্যন্ত বাগদাদে ঝুলিয়ে রাখা।

২. দ্বিতীয় ভাগ: তুর্কি মামলুকদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসী খলিফাগণের বিবরণ:

সময়কাল: ২৪৭-৩৩৩ হিজরি (৮৬১-৯৪৪ ঈসায়ী)

খলিফাগণ: ১১-২১ নং আব্বাসী খলিফা

- ✓ আরবি 'মামলুক' (বহুবচন 'মামালিক') অর্থ ক্রীতদাস। আব্বাসী খলিফা মামুন এবং পরবর্তী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ দাস বাজার থেকে প্রচুর দাস ক্রয় করেন এবং কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাদানের পাশাপাশি সুদক্ষ প্রশিক্ষণ ও সুবিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইসলামি সামরিক চিন্তাধারায় গড়ে তুলে সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উচ্চপদে তাদের অধিষ্ঠিত করেন। এদেরকে মামলুক বলা হত। এসব দাস মা-অরাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা) অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হত। কেননা এসব অঞ্চলে যুদ্ধ লেগেই থাকত। আর এসব এলাকায় তুর্কি আদিবাসীরা বসবাস করত। তাই এসব মামলুক অধিকাংশ তুর্কিই হত। ইসলামের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে তারা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ ও তাতার-মোঙ্গল আগ্রাসন মোকাবিলায় মামলুকদের ভূমিকা ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে।
- ✓ এসময় আব্বাসী সাম্রাজ্যে তুর্কি মামলুকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। তাদের ক্ষমতার হাত খলিফাদের ব্যক্তিজীবনেও প্রবেশ করে। পুতুল খলিফাদের আড়ালে মূলত তুর্কি মামলুকরাই সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকে। তারা যাকে ইচ্ছা খলিফা বানাত, যাকে ইচ্ছা অপমান-অপদস্তির সাথে হত্যা করতো।

৩. তৃতীয় ভাগ: শিয়া বুয়াইহি পরিবার-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসী খলিফাগণের বিবরণ:

সময়কাল: ৩৩৪-৪৪৭ হিজরি (৯৪৫-১০৫৫ ঈসায়ী)

খলিফাগণ: ২২-২৬ নং আব্বাসী খলিফা

- ✓ ইতিহাসের এই স্তরে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা যদি ইসলামি বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব- এক সময়ের সুবিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্ময়করভাবে বহুধা বিভক্ত এবং বিভিন্ন রাজ পরিবারের করতলগত।
- ✓ ৩৩৪-৪৪৭ হিজরি-এই সময় আব্বাসী খলীফাদের কোনো কর্তৃত্বই আর বাকী থাকেনি। খিলাফতের অধীনস্থ অতি সীমিত অঞ্চলও আমিরুল উমারা পদবিধারী শিয়া বুওয়াইহি পরিবারের সুলতানগণই শাসন করত। তারা

খলিফার জন্য নামমাত্র ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কখনো কখনো তা প্রদান না করা হলে খলিফাকে নিজ আসবাবপত্র বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। খলিফার কাজ শুধু এতটুকু ছিল যে, বাইরের কোনো দূত আগমন করলে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা আর সুলতানের নির্দেশমত কথাবার্তা বলা। খলিফা পদটি এখন আর প্রশাসনিক পদ রইল না, নিছক একটি ধর্মীয় সম্মানজনক পদ হয়ে গেল।

- ✓ ২২ নং আব্বাসী খলিফা মুসতাকফি বিল্লাহ্ ইরাকের সুলতান শিয়া বুওয়াইহি পরিবারের আহমাদ বিন বুওয়াইহিকে 'মুইযযুদ্দৌলা' উপাধি প্রদান করে।
- ✓ ৩৫২ হিজরি সনের ১০ মুহাররম (৯৬৩ ঈসায়ী) মুইযযুদ্দৌলা ফরমান জারি করে যে, এখন থেকে ১০ মুহাররম সবধরণের কাজকর্ম বন্ধ রেখে সবাইকে বিলাপ করতে হবে, কৃত্রিম গম্বুজ তৈরি করতে হবে, নারীদের মুখে কালি মেখে পরিধেয় বস্ত্র বিদীর্ণ করে 'হায় হুসাইন! হায় হুসাইন! মাতম করে সড়ক প্রদক্ষিণ করতে হবে। একই বছর হতে শিয়ারা ১৮ জিলহজ 'ঈদুল গাদির' নামে ঈদ পালন করা শুরু করে।

৪. চতুর্থ ভাগ: তুর্কি সেলজুক পরিবার-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসী খলিফাগণের বিবরণ:

সময়কাল: ৪৪৭-৫৯০ হিজরি (১০৫৫-১১৯৪ ঈসায়ী)

খলিফাগণ: ২৬-৩৪ নং আব্বাসী খলিফা

- ✓ ২৬ নং আব্বাসী খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহ্ এর আমলে ৪৪৭ হিজরি সনে (১০৫৫ ঈসায়ী) সেলজুক সুলতান তুগরুল বেগ বাগদাদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর হতে এক শতাব্দীর অধিক কাল ব্যাপ্ত বুওয়াইহি শাসনের যবনিকাপাত ঘটে।
- ✓ খলিফা কায়িম বি আমরিল্লাহ্র আমলেই ৪৪৩ হিজরি সনে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা শুরু হয় এবং উভয় পক্ষের প্রচুর মানুষ নিহত হয়। তুর্কি সেলজুক পরিবারের সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ৪৪৮ হিজরি পর্যন্ত দাঙ্গা চলতে থাকে।

✓ **মানজিকার্টের যুদ্ধ (The Battle of Manzikert):** (৪৬৩ হিজরি/১০৭১ ঈসায়ী)

কায়িম বি আমরিল্লাহ্‌র খিলাফত আমলেই তুগরুল বেগের ইন্তেকালের পর স্থলাভিষিক্ত হন সেলজুক সুলতান আলপ আরসালান।

৪৬৩ হিজরি সনে (১০৭১ ঈসায়ী) বাইজান্টাইন সম্রাট চতুর্থ রোমানোস (Romanos IV Diogenes) দুই লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ করার লক্ষ্যে রওনা হয়।

এদিকে সুলতান আলপ আরসালান মাত্র বিশ হাজার মুজাহিদের এক বাহিনী নিয়ে মানজিকার্টের নিকটবর্তী যাহওয়া নামক স্থানে বাইজেন্টাইন বাহিনীর মুখোমুখি হন। প্রতিপক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সুলতান আলপ আরসালান ঘোড়া থেকে নেমে সিজদায় পড়ে যান এবং আপন মুখমণ্ডল মাটিতে ঘর্ষণ করে আল্লাহর দরবারে সাহায্য কামনা করে দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সুন্নাতকে বাস্তবায়িত করেন। তাঁর সাহায্যে অসম এ যুদ্ধে মুমিনদের বিজয় লাভ হয়। বাইজান্টাইন বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতির কারণে ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'দ্বিতীয় ইয়ারমুকের যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

✓ সুলতান আলপ আরসালানই প্রথম বাগদাদে নিযামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৫৮ হিজরি সনে (১০৬৬ ঈসায়ী) এর প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত হয়।

✓ বাগদাদের উজির নিযামুল মুলক ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠতম আলেমদের একজন এবং তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগীও ছিলেন। তিনি অনেকগুলো মাদরাসা স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারেই মাদরাসাগুলোকে 'নিযামিয়া মাদরাসা' বলা হয়। এই মাদরাসারই ছাত্র ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও ইসলামী দার্শনিক হযরত ইমাম গায্‌যালী রহ., ইতিহাস-কাঁপানো বীর সিপাহ্‌সালার সালাহ্‌উদ্দিন আইয়ুবী রহ., বিখ্যাত মনীষী ও ঐতিহাসিক বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ রহ. প্রমুখ।

✓ ৩৪ নং আব্বাসী খলিফা আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি আব্বাসি খলিফা। তার খিলাফতকাল ছিল সাতচল্লিশ বছর। তার আমলে খাওয়ারিজম রাষ্ট্রের সুলতান আলাউদ্দিন তিকিশের হাতে তৃতীয় তুগরুল বিন আরসালান শাহর হত্যার মধ্য দিয়ে ইরাকে সেলজুক সালতানাতের পতন ঘটে।

সুলতান আলাউদ্দিন তিকিশের পর তার স্থলাভিষিক্ত হয় তার পুত্র সুলতান আলাউদ্দিন মোহাম্মাদ।

৫. পঞ্চম ভাগ: তাতারদের আগ্রাসন চলাকালীন আব্বাসী খলিফাগণের বিবরণ:

সময়কাল: ৬১৫-৬৫৬ হিজরি (১২১৮-১২৫৮ ঈসায়ী)

খলিফাগণ: ৩৪-৩৭ নং আব্বাসী খলিফা

- ✓ ৬৫৬ হিজরির ১২ মুহাররাম মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র তাতার শাসক হালাকু খান তাতারী বাহিনী নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালায় এবং পুরো বাগদাদ নগরী ধ্বংস করে দেয়।
- ✓ বাগদাদের পতনের মাধ্যমে বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের ইতি ঘটে।
- ✓ এরপর মিশরের মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহি. এর নেতৃত্বে ৬৫৮ হিজরি সনের রমজান মাসে (১২৬০ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বর মাসে) আইনে জালুতের প্রান্তরে মুজাহিদ বাহিনী ও তাতারদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তাতার বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এই যুদ্ধে সাইফুদ্দিন কুতুজ. রাহি.-র সেনাপতি ছিলেন রুকনুদ্দিন বাইবার্স।

৬. ষষ্ঠ ভাগ: তাতারদের হাতে বাগদাদ পতন-পরবর্তী সময়ের মিশর কেন্দ্রিক আব্বাসী খলিফাগণের বিবরণ:

সময়কাল: ৬৫৯-৯২৩ হিজরি (১২৬১-১৫১৭ ঈসায়ী)

- ✓ আইনে জালুতের যুদ্ধ হতে মিশরে ফেরার পর সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহি.কে হত্যা করে মিশরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ✓ **খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা:** বাগদাদের পতনে পুরো মুসলিম বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে, বিশেষতঃ মুসলমানদের ঐক্য, সম্প্রীতি ও অবিচ্ছিন্নতার প্রতীক খিলাফাহ্ বিদায় নেয়ায় মুসলিম বিশ্ব উদ্বিগ্ন ছিল। অন্যদের মত তৎকালীন মিশরকেন্দ্রিক মামলূক রাষ্ট্রের অধিপতি সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সও খিলাফতশূন্যতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। ৬৫৯ হিজরি সনে (১২৬১ ঈসায়ীতে) তিনি আব্বাসী বংশের আবুল কাসিম আহমাদকে আল মুসতানসির বিল্লাহ (২য়) উপাধি দিয়ে মুসলিম জাহানের খলিফা ঘোষণা করেন।

✓ **আব্বাসী খিলাফতের চূড়ান্ত পতন:** মিশরকেন্দ্রিক এই আব্বাসী খিলাফত আড়াইশ বছর টিকে ছিল। ১৩২ হিজরি সনে (৯২৩ ঈসায়ী) প্রথম আব্বাসী খলিফা আস্ সাফ্ফাহর দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে যে খিলাফতের সূচনা হয়েছিল, দীর্ঘ আট শত বছর পর ৯২৩ হিজরি সনে (১৫১৭ ঈসায়ী) উসমানি সুলতান ১ম সেলিম কর্তৃক মিশর জয়ের মাধ্যমে ও ৫৪ নং আব্বাসী খলিফা ৩য় মুতাওয়াককিলের পতনের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস

মুসলিম ভূ-খণ্ডে খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের হিংস্র ও বর্বর আগ্রাসন আব্বাসী খিলাফতের প্রতি অনুগত দুটি মহান রাষ্ট্রের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়- জিনকি রাষ্ট্র ও আইয়ুবি রাষ্ট্র। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই দুটি রাষ্ট্রকে যেন সৃষ্টিই করেছিলেন-ইসলামি প্রাচ্যে ইউরোপীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে এবং তাদের এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ছয়শ বছরেরও অধিক সময় পিছিয়ে দিতে।

প্রথম ক্রুসেড:

বাইতুল মোকাদ্দাসকে মুসলমানদের হাত হতে ছিনিয়ে নিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে তিন লক্ষ সৈন্যের বহুজাতিক খ্রিস্টান বাহিনী ফ্রান্স হতে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে তারা সেলজুক মুসলিম ও সাধারণ জনগণের দ্বারা প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। অবশেষে তারা আল কুদ্‌স এ পৌঁছে যায়। আল কুদ্‌স তখন উবায়দি (ফাতিমি শিয়া)-দের দখলে ছিল। একচল্লিশ দিন অবরোধের পর ক্রুসেডাররা আল কুদ্‌স জয় করে এবং ব্যাপক গণহত্যা চালায়। মুসলমানদের রক্তে কুদ্‌স নগরী প্লাবিত হয়। প্রায় সত্তর হাজার সাধারণ মুসলমান ক্রুসেডারদের হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়।

৪৯২ হিজরি সনের শাবান মাসে (১০৯৯ ঈসায়ীর জুলাই মাসে) বাইতুল মুকাদ্দাসের পতন ঘটে।

এদিকে খ্রিস্টানরা যখন বাইতুল মুকাদ্দিস দখল করে তখন তাদের সাথে (সাথে আগত তিন লক্ষ সৈন্যের মধ্যে) সৈন্য ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার। পথিমধ্যে এডেসা অভিযানের জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য আলাদা হয়ে যায়। তার মানে হল- সেলজুক ও সাধারণ জনগণের প্রতিরোধের মুখে খ্রিস্টানদের দুই লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়।

সুব্হানাল্লাহ! প্রিয় ভাই, একটু চিন্তা করি। যদি সকল মুসলিম শক্তি ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হত, তাহলে কেমন হত ক্রুসেডারদের পরিণতি??

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুসেড হামলার মধ্যবর্তী সময়ের পরিস্থিতিঃ

- ✓ ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করার এক বছরের মধ্যে তারা চতুর্দিকের মুসলিম শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক আক্রমনের সম্মুখীন হতে থাকে।
- ✓ ৫২১ হিজরি পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডারদের মোকাবিলায় অনন্যসাধারণ ভূমিকা রাখেন সুলতান ইমামুদ্দিন জিনকি ও তার বংশধরগণ।
- ✓ ইরাকের মসুল, জাযিরা ও শামের বিজিত এলাকাগুলোতে ইমাদুদ্দিন জিনকির হাতে সূচিত হয় জিনকি রাষ্ট্র।
- ✓ ৫৩৯ হিজরিতে (১১৪৪ ঈসায়ী) সুলতান ইমামুদ্দিন জিনকি অর্ধশতাব্দী ক্রুসেডার কর্তৃক অধিকৃত এডেসা নগরীকে পুনরুদ্ধার করেন।
- ✓ ৫৪১ হিজরি (১১৪৬ ঈসায়ী) ইমাদুদ্দিন জিনকি শিয়া ইসমাইলি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।
- ✓ ইমাদুদ্দিন জিনকির মৃত্যুর পর তার রাষ্ট্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন তার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র সাইফুদ্দিন গাজি, এ অংশের কেন্দ্র ছিল মসুল। আর পশ্চিম অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দ্বিতীয় পুত্র নুরুদ্দিন মাহমুদ, এ অংশের কেন্দ্র ছিল আলেপ্পো।

দ্বিতীয় ক্রুসেডঃ

১১৪৫ ঈসায়ীর ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন পোপ তৃতীয় ইউজেন দ্বিতীয় ক্রুসেডের ডাক দেয়। এই ক্রুসেডের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের হাত হতে এডেসাসহ অন্যান্য অঞ্চল যেগুলো মুসলমানরা খ্রিস্টানদের থেকে দখল করে, সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করা ও শাম অঞ্চলে খ্রিস্টানদের অবস্থান দৃঢ় করা। দ্বিতীয় ক্রুসেড অভিযানে নেতৃত্ব দেয় ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই (Loius VII) ও জার্মানির রাজা তৃতীয় কনরাড।

জার্মান বাহিনী উপকূলীয় পথ ধরে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে দোরিয়ালুমে রোমান সেলজুক বাহিনী তাদের উপর হামলা করে

শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। বিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে আঠারো হাজার সৈন্যই নিহত হয়। জার্মান রাজা তৃতীয় কনরাড মাত্র দুই হাজার সৈন্য নিয়ে চরম নিঃস্ব, রিক্ত ও লাঞ্ছনাকর অবস্থায় কোনোমতে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছায়। অন্যদিকে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুইও সেলজুকদের আক্রমণ হতে রেহাই পায়নি। বাধ্য হয়ে মূল লক্ষ্য এডেসা পুনরুদ্ধারের চিন্তা ভুলে গিয়ে সে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে।

বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছার পর সেখান থেকে তারা সুবিশাল ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে (৭ম লুই আর তৃতীয় কনরাডের নেতৃত্বে) ৫৪৩ হিজরি সনে (১১৪৮ ঈসায়ী) শামের (বর্তমান সিরিয়ার) দামেশক অবরোধ করে। ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলায় দামেশকের এক লাখ ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী বেরিয়ে আসে। উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের প্রথম দিন দুই শত মুজাহিদ শহিদ হন। আর খ্রিস্টানদের অগণিত জাহান্নামবাসী হয়।

যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে দামেশকের প্রশাসক মুজিরুদ্দিন আবিক আলেপ্পোর অধিপতি নুরুদ্দিন মাহমুদ ও তার ভাই মসুলের শাসক সাইফুদ্দিন গাজির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তারা দুজন অন্যান্য আরো সেনাপতিসহ দ্রুত সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে দামেশকের উদ্দেশ্যে অবতরণ করেন। নুরুদ্দিন ও সাইফুদ্দিনের আগমনের কথা শুনে ক্রুসেডার বাহিনী পলায়ন করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং অসংখ্য খ্রিস্টান সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠায়।

- ✓ এদিকে উবায়দি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীন দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টান অধিপতি তৃতীয় বল্ডউইন ৫৪৮ হিজরি (১১৫৩ ঈসায়ী) সনে আসকালান নৌবন্দর দখল করে নেয়। এর ফলে পুরো শাম ও ফিলিস্তিনের উপকূলীয় অঞ্চলে ক্রুসেডারদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিশ্চিত হয়।
- ✓ আসকালানের পতনের পর নুরুদ্দিন জিনকি ৫৪৯ হিজরিতে (১১৫৪ ঈসায়ী) দামেশক অবরোধ করে দামেশক প্রশাসক মুজিরুদ্দিনের কাছ থকে দামেশক দখল করে নেন। কারণ দামেশকের কারণেই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অগ্রসর হতে পারছিলেন না।
- ✓ ৫৫৮ হিজরি সনে ক্রুসেডাররা বিশাল সামরিক শক্তি নিয়ে মিশর দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু নুরুদ্দিন জিনকি তাদের প্রতিহত করেন।

✓ ইসলামের এই ক্ষণজন্মা মহান শাসক ও সেনানায়ক নুরুদ্দিন জিনকি রাহি. একের পর এক ক্রুসেডীয় আগ্রাসন মোকাবিলা করার পাশাপাশি বহু অঞ্চল খ্রিস্টানদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেন।

✓ এদিকে মিশরকে কেন্দ্র করে নাটকীয় নানা ঘটনা ঘটতে থাকে এবং উবায়দি (ফাতিমি শিয়া) খিলাফতের পতন ঘটে। অবশেষে মিশরের শাসনভার চলে আসে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কাছে। ৫৬৭ হিজরি সনের প্রথম জুমার দিন (১১৭১ ঈসায়ী) সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে মিশরে আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা পাঠ করার নির্দেশ জারি করেন। এর মাধ্যমে সালাহুদ্দিনের শিক্ষক নুরুদ্দিন জিনকি পুরো বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্‌র একক খিলাফাহ্‌র ঘোষনা করলেন। এ পদক্ষেপের মাধ্যমেই তিনি মিশরের উবায়দি সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটান।

✓ ৫৬৯ হিজরির ১১ শাওয়াল (১১৭৪ ঈসায়ীর ১৫ মে) বুধবার আটান্ন বছর বয়সে সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি রাহি. আপন প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেন। আল্লাহ্‌ সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উপর রহম করুন।

✓ সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির মৃত্যুর পর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক সুবিশাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যার ব্যাপ্তি ছিল উত্তর ইরাক (কুর্দিস্থান), শাম, মিশর ও বারকা অঞ্চলজুড়ে। এটিই ইতিহাসে 'আইয়ুবি রাষ্ট্র' হিসেবে পরিচিত।
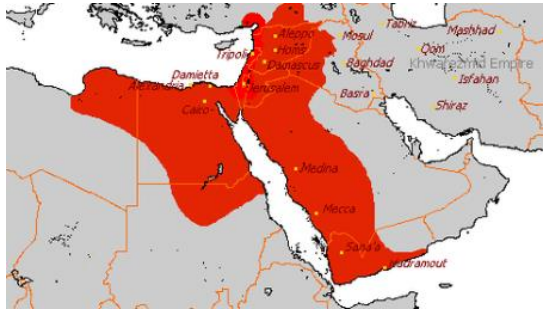
✓ ৫৮২ হিজরি সনে বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের অধীনস্থ কারাক অঞ্চলের প্রশাসক রেনাল্ড মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করে। অথচ বাইতুল মুকাদ্দাস রাজ্যের সাথে তখন সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির শান্তিচুক্তি কার্যকর ছিল। অভিশপ্ত রেনাল্ড কাফেলার সদস্যদের বন্দি করে এবং রাসূলুল্লাহ্‌

এর প্রতি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বন্দিদেরকে বলে, ‘তোমরা যদি মুহাম্মাদের ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তাহলে তাকে ডাকো, সে এসে তোমাদের মুক্ত করুক এবং এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুক!’ সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি রেনাল্ডকে বন্দি করতে পারলে নিজ হাতে হত্যা করার শপথ করেন।

খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের এই চরম ধৃষ্ঠতাপূর্ণ আচরণের পর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি দ্রুত যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার সংকল্প করেন।

✓ হিত্তিনের যুদ্ধঃ

৫৮৩ হিজরি সনে (১১৮৭ ঈসায়ী) সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে দামেশক থেকে বের হন। এদিকে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিস্তৃত পরিকল্পনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সমকালীন খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। উভয় বাহিনী হিত্তিন নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী পূর্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশের পানির উৎসগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় ক্রুসেডার বাহিনী এসময় প্রচণ্ড পানির স্বল্পতার সম্মুখীন হয়।

উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। চরমভাবে পরাজিত ক্রুসেডার বাহিনীর একজন সদস্যও পালিয়ে যেতে পারেনি। তারা হয়তো নিহত হয়, নতুবা বন্দী হয় । যুদ্ধে নিহত ক্রুসেডার সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা গাই (Guy of Lusignan) ও কারকের প্রশাসক রেনাল্ড মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। অতঃপর দুই বন্দীকে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর সামনে উপস্থিত করা হয় এবং সুলতানের তাঁবুর ভিতরে বসানো হয়। সীমালঙ্গনকারী শাতিমে রাসূল বদবখত রেনাল্ডকে সুলতান নিজ হাতে হত্যা করে তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেন। অপরদিকে, বাইতুল মুকাদ্দাসের রাজা ও তার জীবিত অনুচরদের সসম্মানে দামেশকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

✓ **বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারঃ**

অবশেষে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী ৫৮৩ হিজরি (১১৮৭ ঈসায়ী)-তে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেন। আল কুদ্স জয় করার পর সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীদের সাথে তিনি অত্যন্ত সদাচরণ করেন।

প্রিয় ভাই! মনে আছে একশ বছর আগের কথা, যখন খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিল, একদিনে সত্তর হাজার মুসলিমকে গণহত্যা করেছিল। আহ! কত ব্যবধান ৪৯২ হিজরি ও ৫৮৩ হিজরির মাঝে! এটাই ইসলামের শিক্ষা। মুসলিম জাতিই পৃথিবীকে দান করেছে ন্যায় ও সুবিচার, সদাচরণ ও উদারতার শিক্ষা।

তৃতীয় ক্রুসেডঃ

✓ ইউরোপের রাজন্যবর্গ সালাহুদ্দিনের হাত হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তৎকালীন পোপ অষ্টম গ্রেগরির নির্দেশে তৃতীয় ক্রুসেড অভিযানে বের হয়। এ অভিযানের নেতৃত্বে ছিল-

- জার্মানির রাজা প্রথম ফ্রেডেরিক (ফ্রেডেরিক বারবারোসা)- সে পথিমধ্যে পানিতে ডুবে মারা যায়।
- ফরাসি রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ (ফিলিপ অগাস্টাস)
- ইংল্যান্ডের রাজা 'সিংহহৃদয়' খ্যাত প্রথম রিচার্ড।

৫৮৭ হিজরি সনের ১৭ জুমাদুল উখরা (১১৯১ ঈসায়ীর ১২ জুলাই) আক্কা নগরী ক্রুসেডারদের বর্বর গণহত্যার শিকার হয়। ষাট হাজার মুসলমান শহিদ হওয়ার পর আক্কা নগরীর কর্তৃত্ব চলে যায় ক্রুসেডার কুকুরদের হাতে।

এরপর আরসুফের (Apollonia) যুদ্ধেও ক্রুসেডাররা জয় লাভ করে। তাদের দৃষ্টিতে এ বিজয় ছিল হিত্তিনের যুদ্ধের প্রতিশোধ।

এরপর ৫৮৮ হিজরিতে কুকুররা দারুম দুর্গ দখল করে নেয় এবং দুর্গের অভ্যন্তরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, অসংখ্য নাগরিককে হত্যা করে এবং শিশুদেরকে বন্দি করে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অবশেষে তারা একযোগে আল-কুদ্সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবী মুজাহিদদের নিয়ে তাদের প্রতিরোধে বের হন। উভয় দল মুখোমুখি হলে শয়তানের দল পলায়ন করে। সুলতান আল-কুদ্সে ফিরে আসেন।

✓ এরপর ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড (আল্লাহ্ তার উপর অভিসম্পাত করুন) মুসলমানদের একটি ছোট্ট দলের উপর রাতের আঁধারে হামলা চালায় এবং অনেক মুসলমানকে হত্যা করে। বন্দি হয় পাঁচশ মুসলমান। তিন হাজার উটসহ প্রচুর ঘোড়া ও খচ্চর তারা মুসলমানদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্দ সম্পদ হিসেবে লাভ করে। অবশেষে অভিশপ্ত প্রথম রিচার্ড উপকূলীয় খ্রিস্টান বহুজাতিক বাহিনী নিয়ে আল কুদ্স অবরোধ করে।

সুলতান আইয়ুবি (আল্লাহ্ পাক তার উপর রহম করুন) খ্রিস্টানদের প্রতিহত করার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেখেছিলেন। তিনি নগর প্রাচীর নির্মাণ করেন, নগরীর চারপাশে গভীর পরিখা খনন করেন, প্রাচীরের উপর মিনজানিক ক্ষেপনাস্ত্র স্থাপন করেন এবং আল কুদসের পার্শ্ববর্তী পানির উৎসগুলোর পানি সেচে ফেলার নির্দেশ দেন। অতঃপর সুলতান সিজদাবনত হয়ে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া ও কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এই সংকট হতে মুক্তি প্রার্থনা করতে থাকেন।

এদিকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছায়, শত্রপক্ষ নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের রাজা চাচ্ছে অবরোধ অব্যাহত রেখে আল-কুদ্স জয় করতে আর ইংরেজরা চাচ্ছে ফিরে যেতে। ইংরেজদের যুক্তি হল- এই নগরী অবরোধ করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, আশেপাশের পানির উৎসগুলো ফুরিয়ে গেছে। দীর্ঘ কষ্টের পর যতদিনে আমাদের কাছে পানি পৌঁছবে, ততদিনে আমাদের অবরোধ প্রচেষ্টাই কেবল ব্যর্থ হবে না; সৈন্যদের প্রাণও ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে। অবশেষে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সাথে তারা ঐতিহাসিক 'রমলা' চুক্তি করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়।

✓ এর কিছুদিন পর মহান সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বারো দিন অসুস্থ থাকার পর ৫৮৯ হিজরি সনের ২৭ সফর (১১৯৩ ঈসায়ীর ৩ মার্চ)

বুধবার তার বিদেহী আত্মা পরম প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন। এসময় তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে ছিল মাত্র সাতচল্লিশটি দিরহাম এবং একটি দিনার। এ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল না।

চতুর্থ ও পঞ্চম ক্রুসেড:

সুলতান সালহুদ্দিন আইয়ুবির মৃত্যুর পরই তার কাছ থেকে হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মীয় গুরু পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ইউরোপে নতুন ক্রুসেডের ডাক দেন। তার ডাকে পরপর দুটি ক্রুসেড অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় দুটিই ব্যর্থ হয়।

ষষ্ঠ ক্রুসেড:

✓ ৬২৫ হিজরি সনে (১২২৮ ঈসায়ী) জার্মানির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনী এ অভিযানে তার সাথে যোগ দেয়নি। তখন আইয়ুবি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিল সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চাচাতো ভাই সুলতান আল কামিল। সে দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের সাথে এই শর্তে সন্ধিচুক্তি করে যে, আল কামিল আল কুদ্স, (তীর্থ যাত্রীদের যাত্রাপথে অবস্থিত) আক্কা ও জাফার নিয়ন্ত্রন ফ্রেডেরিকের হাতে ছেড়ে দিবেন এবং বন্দি ফিরিঙ্গিদের মুক্তি দিবেন। অপরদিকে আল কামিল যখন যে কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, হোক সে খ্রিস্টান, ফ্রেডেরিক তখন কামিলকে সহায়তা করবেন এবং পরবর্তী সাড়ে দশ বছর শামে অন্যান্য ক্রুসেড শাসকের কাছে কোনো ধরনের সামরিক সাহায্য পৌঁছতে বাধা প্রদান করবেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এভাবে জার্মান রাজা ফ্রেডেরিক বিনা যুদ্ধেই আল কুদসের কর্তৃত্ব লাভ করে। আল কামিল নিজের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের পবিত্র ভূমি আল-কুদ্স সহ বিভিন্ন ইসলামি ভূ-খণ্ড খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেয়।

হায় আল কামিল! তোমাকে তোমার সেই সাধের ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়েছে, ত্যাগ করতে হয়েছে পৃথিবীর মায়াও, পৃথিবীর ক্ষমতা তুমি ধরে রাখতে পারনি, পারেনি তোমার পরবর্তী প্রজন্মও। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস তোমাকে ভুলেনি,

ইসলামী ইতিহাস তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবে না! কী কাজে এসেছে তোমার প্রচুর মাদরাসা নির্মাণ, তোমার বিদ্যানুরাগ, উলামায়ে কেরামের মজলিসে শরিক হওয়া?

✓ আল কামিলের মৃত্যুর পর তার পুত্র (দ্বিতীয় আদিল) সাইফুদ্দিন আবু বকর তার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু তিনি শাসনকার্যে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে খেল-তামাশায় লিপ্ত হন। ফলে প্রশাসকগণ তাকে অপসারণ করেন।

✓ দ্বিতীয় বার আল কুদ্স পুনরুদ্ধার:

এরপর আইয়ুবি রাষ্ট্রের হাল ধরেন আল কামিলের আরেক পুত্র আল মালিকুস সালিহ আইয়ুব। সালিহ আইয়ুব ছিলেন আইয়ুবি রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি সব ধরণের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা নির্মূল করে যথাযথভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

সুলতান আস্ সালিহ আইয়ুব ৬৪২ হিজরি সনে (১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে) আল কুদ্স পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার ঘোষনা দেন। তেরো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তিনি রওনা হন আল-কুদ্স অভিমুখে। সংবাদ পেয়ে শামের বিভিন্ন এলাকার ক্রুসেডাররা সমবেত হয়ে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটায়।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়!! এ সময় হিমস ও আলেপ্পোসহ শামের বিভিন্ন এলাকার আইয়ুবি প্রশাসকগণ ক্রুসেডারদের সমর্থনে আল মালিকুস্ সালিহ্র প্রতিরোধের লক্ষ্যে ক্রুসেডারদের সঙ্গে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে জড়ো হয়!!! সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় বিশ হাজার। আল-কুদসের পথে গাজার নিকটে আল-মালিকুস্ সালিহের বাহিনী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এরপর তারা সামনে অগ্রসর হয়ে আল-কুদ্স অবরোধ করে। মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমনে এগারো হাজার সৈন্যবিশিষ্ট আল-কুদসের স্থানীয় ক্রুসেডার বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে; পনেরো বছর পর আবারও আল কুদ্সে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সালাম তোমায় হে আল মালিকুস্ সালিহ!!!

এরপর থেকে একটানা ছয়শ তিরানব্বই বছর পবিত্র আল-কুদ্স নগরী ইসলামী শাসনাধীন ছিল। ১৩৩৫ হিজরি সনে (১৯১৭ ঈসায়ী) ব্রিটিশ বাহিনী আল-কুদ্স দখল করে নেয় এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৪৭ ঈসায়ীতে ইহুদীদের হাতে তুলে দেয়।

সপ্তম ক্রুসেড:

সুলতান আস সালিহ আইয়ুবের হাতে আল কুদসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বিক্ষুব্ধ ইউরোপ নতুন করে ক্রুসেডের ডাক দেয়। ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ইউরোপজুড়ে ক্রুসেড যুদ্ধের প্রচারণা চালায় এবং তৎকালীন পোপ ৪র্থ ইনোসেন্ট-এর সমর্থন লাভ করে। দীর্ঘ তিন বছর ব্যাপক প্রস্তুতির পর আস্ সালিহ আইয়ুবের শাসনামলের শেষদিকে ৬৪৬ হিজরি (১২৪৮ ঈসায়ী) লুই আঠারোশ জাহাজের একটি বিশাল নৌবহর নিয়ে মিশর অভিমুখে রওনা হয়। ক্রুসেডার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লক্ষের অধিক।

এরইমধ্যে সুলতানের মৃত্যু হলে সুলতানের স্ত্রী শাযারাতুদ-দুর তার মৃত্যুসংবাদ গোপন করে নকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করে বুঝাতে চান যে, সুলতানই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি সেনাপতি ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের সমবেত করে জানান যে, সুলতান তাদেরকে সুলতানপুত্র তুরান শাহের নামে বায়আত গ্রহণ করতে বলেছেন। তুরান শাহ তখন জাযিরা অঞ্চলে ছিলেন। ফলে সকলে তুরান শাহের নামে বাইয়াত গ্রহণ করে।

এদিকে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি অংশ রাজা নবম লুইয়ের ভাই রবার্টের নেতৃত্বে মূল বাহিনী থেকে গোপনে সরে পড়ে এবং এবং আল বাহরুস সগির নামক নদী পেরিয়ে পেছন দিক থেকে ছোট্ট একটি মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলে।

তুরান শাহ না থাকায় শাজারাতুদ দুর তার স্বামির প্রতিষ্ঠিত বাহরি মামলুক বাহিনীকে প্রেরণ করেন। বাহরি মামলুক বাহিনীর প্রবল আক্রমনে নদী অতিক্রমকারী বাহিনীটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

শাজারাতুদ দুরের আহ্বানে তুরান শাহ ইতোমধ্যে উপস্থিত হন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য আগত রসদপত্র বোঝাই একটি নৌবহর আক্রমন করে আশিটি জাহাজ আটক করেন। ফলে ক্রুসেডার শিবিরে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তুরানশাহ তার বাহিনী নিয়ে ফারিস্কুর নামক স্থানে ক্রুসেডারদের নৌবাহিনীর মোকাবিলা করে পাঁচ হাজার সৈন্যকে হত্যা করেন। এদিকে রাজা নবম লুইয়ের নেতৃত্বে মূল ক্রুসেডার বাহিনী নদী পাড়ি দিয়ে মামলুক বাহিনীর মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমনে প্রায় ত্রিশ হাজার ক্রুসেডার জাহান্নামী হয়। তাছাড়া নদীতে ডুবে জাহান্নামী মিছিলে যোগ

দেয় বহু সৈন্য। রাজা নবম লুই জীবিতাবস্থায় বন্দী হয়। প্রায় এক কোটি ফ্রাংক মুক্তিপণ আদায় করে সে ও তার পরিজন অন্যান্য বন্দিসহ মুক্তি লাভ করে।

মিশরে মামলুকদের উত্থান:

তুরান শাহ ক্রুসেডারদের দমন করার পর আইয়ুবি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি শাজারাতুদ দুরের নিকট পিতার সম্পদ দাবি করেন এবং মামলুক দের বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে থাকেন। অবশেষে দায়িত্ব গ্রহণের সত্তর দিনের মাথায় মামলুকরা তুরান শাহকে হত্যা করে এবং শাজারাতুদ দুরকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো নারী মুসলমান দের শাসক নিযুক্ত হল। মিশরের নারী নেতৃত্ব নিয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বে হইচই শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অবশেষে তিন মাস পর শাজারাতুদ দুর নিজেই দায়িত্ব হতে নিজেকে সরিয়ে নেন।

এরপর মামলুকরা আইয়ুবি পরিবারের জনৈক রাজপুত্র আট বছর বয়সী আল আশরাফ মুসা বিন ইউসুফকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করে এবং আল মালিকুস সালিহের কৃতদাস ইযযুদ্দিন আইবেক তুর্কমানিকে অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। ইযযুদ্দিন শাজারাতুদ দুরকে বিবাহ করেন এবং কিছুদিন না যেতেই মূসাকে অপসারণ করে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। এরই মধ্য দিয়ে মিশরে আইয়ুবি রাষ্ট্রের পতন ঘটে এবং মামলুক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়।

কিন্তু ৬৫৫ হিজরি সনে (১২৫৭ ঈসায়ী) ইয্যুদ্দিন আইবেক নিহত হন। কিছু দিন পর শাজারাতুত দুরকেও হত্যা করা হয়। এরপর ইযযুদ্দিনের পুত্র নুরুদ্দিন আলি মিশরের শাসনভার গ্রহণ করে। সুলতানের বয়স তখন এগারোও পেরোয়নি। ফলে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহি.। নুরুদ্দিনের আমলেই মুসলিম উম্মাহর জীবনে এক বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়- তাতারদের হাতে বাগদাদের পতন হয় ও খিলাফতব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সাইফুদ্দিন কুতুয রাহি. আলিম উলামাদের পরামর্শ ও ফতোয়াক্রমে কিশোর সুলতানকে অপসারণ করে ৬৫৭ হিজরি (১২৫৯ ঈসায়ী) সনে 'আল মালিকুল মুযাফ্ফার' উপাধি ধারণ করে মিশরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

এরপর ৬৫৮ হিজরি সনের রমজান মাসে (১২৬০ ঈসায়ী) আইনে জালুতের প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী সাইফুদ্দিন কুতুয রাহি. এর নেতৃত্বে তাতারদের কঁচুকাটা করেন। মিশরে ফেরার পর সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহি.র সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স তাকে হত্যা করে মিশরের শাসনক্ষমতা দখল করেন।

মামলুক রাষ্ট্রকে একই সঙ্গে তিন তিনটি প্রবল শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। একদিকে ছিল ধেয়ে আসা তাতারিদের হুমকি, আরেকদিকে ছিল খ্রিস্টান ক্রুসেডীয় আগ্রাসন। আর তৃতীয় শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল শিয়া বাতিনি গোষ্ঠী।

সুলতান রুকনুদ্দিনের সময় তাতারিদের সাথে আরো কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়, যার সবগুলোতেই মুসলমানরা জয়লাভ করে।

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স শামের শিয়া বাতিনিদের সবকটি দুর্গের পতন ঘটান। এর ফলে পৃথিবী শিয়া বাতিনী গোষ্ঠীর বর্বরতা থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করে।

সুলতান বাইবার্স ৬৬১ হিজরি সনে (১২৬৩ ঈসায়ী) শামের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ লড়াই শুরু করেন। তিনি খ্রিস্টানদের কাছ থেকে একে একে নাজারেথ, আরসুফ, আথলিথ, কায়সারিয়া, কিলিকিয়া, সাফাদ, আসকালান, জাফা নগরীসমূহ জয় করেন। এভাবে 'বাইতুল মুকাদ্দাস' ক্রুসেড রাজ্যের দফারফা করে সুলতান বাইবার্স ৬৬৬ সনে (১২৬৮ ঈসায়ী) এন্টিয়কে অভিযান পরিচালনা করে তা জয় করে নেন।

অষ্টম ক্রুসেড:

এন্টিয়কের পতন যেন ছিল ইসলামি প্রাচ্যে ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত পতনধ্বনি। দুই ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক ও এডেসা ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট দুই রাজ্য বাইতুল মোকাদ্দাস ও ত্রিপোলি টিকে আছে কোনমতে। স্বভাবতই ইউরোপ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। তৎকালীন পোপ চতুর্থ ক্লিমেন্ট তাই নতুন করে ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দেন।

এ যুদ্ধে ইংল্যান্ড, সাইপ্রাস ও ফ্রান্স যোগ দেয়। সঙ্গী হিসেবে তারা পেয়ে যায় তাতার রাজ্য ইলখানাতের শাসক ও হালাকু খানের পুত্র আবাগা খানকে।

রাজা নবম লুইয়ের নেতৃত্বে ফরাসি বাহিনী ৬৬৮ হিজরি (১২৭০ ঈসায়ী) সনে তিউনিসিয়ায় পৌঁছেই মহামারির শিকার হয় এবং আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে অনেক সৈন্য ইহধাম ত্যাগ করে। খোদ রাজা লুই ও পটল তোলেন। এ সংবাদ শুনে ইংল্যান্ড ও সাইপ্রাসের বাহিনী এবং আবাগা খানের তাতার বাহিনীরও অভিযান পরিচালনার খাহেশ উবে যায়।
এদিকে সুলতান বাইবার্স ১২৭১ ঈসায়ীর শুরুতে ত্রিপোলি রাজ্যের বুর্জসাফিতা জয় করেন। এরপর তিনি অবরোধ করেন ত্রিপোলি নগরী।

নবম ক্রুসেড:

ত্রিপোলি অবরোধের সংবাদ জানতে পেরে ইউরোপের টনক নড়ে ওঠে। আল-কুদস, এডেসা, এন্টিয়ক সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন যদি ত্রিপোলি ও আক্কারও পতন ঘটে, তাহলে ইসলামী প্রাচ্য থেকে ক্রুসেডারদের নাম নিশানাই মুছে যাবে। তাতারদের সহায়তায় এবার ঘোষিত হয় নবম ক্রুসেড।
অষ্টম ক্রুসেডের মত এবারও যুদ্ধে অংশ নেয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সাইপ্রাস ও তাতার রাজ্য ইলখানাত।
৬৭০ হিজরি সনে (১২৭১ ঈসায়ী) তাতার আবাগা খানের সেনাপতি সামাগারের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী উত্তর দিক থেকে মামলুক রাষ্ট্রে হামলা করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সংবাদ পেয়ে রুকনুদ্দিন বাইবার্স তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে সংবাদ পেয়েই তাতার বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করে। বাইবার্স তাদেরকে ধাওয়া করে মামলুক সাম্রাজ্যের শেষ সীমায় খাবুর নদী পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু তার আগেই তাতাররা পালিয়ে তাদের ইলখানাত রাজ্যে চলে যায়।
ঐদিকে ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিন অঞ্চলে হামলা চালায়। বাইবার্স তাতারীদের তাড়িয়ে দিয়ে বিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে বত্রিশ হাজার সৈন্য বিশিষ্ট ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলা করতে আক্কায় পৌঁছান। বাইবার্সের আগমনে ইংল্যান্ডের যুবরাজ অ্যাডওয়ার্ডের যুদ্ধস্পৃহা মুহূর্তেই নিভে যায়। সে বাইবার্সের কাছে দূত প্রেরণ করে সন্ধিচুক্তির আবেদন জানায়। ৬৭০ হিজরি সনে (১২৭২ ঈসায়ী) উভয়পক্ষের মধ্যে ঐতিহাসিক 'কায়সারিয়ার চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।
৬৭৬ হিজরির ২৭ মুহাররম (১২৭৭ ঈসায়ীর ৩০ জুন) সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স ইন্তেকাল করেন।

বাইবার্সের ইন্তেকালের পর তার দুই পুত্র পরপর ক্ষমতায় আসে। অবশেষে মিশরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন আল মালিকুল মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন আস্ সালিহি। তার সময়ই তাতারদের সাথে ৬৮০ হিজরি (১২৮১ ঈসায়ী) সনে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী হিম্সের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। যুদ্ধে তাতাররা পরাজিত হয়।

ত্রিপোলি (বর্তমান লেবাননের ২য় বৃহত্তম নগরী) পুনরুদ্ধার:

তাতারদের দমন করে সুলতান কালাউন ক্রুসেডারদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তিনি লাতাকিয়া অবরোধ করে তা জয় করে নেন। এরপর ত্রিপোলির খ্রিস্টানরা মুসলিম বণিক কাফেলার উপর হামলা চালিয়ে চুক্তিভঙ্গ করলে তিনি ত্রিপোলি অভিযানে বের হন। ৬৮৮ হিজরি (১২৮৯ ঈসায়ী) সুলতানের নির্দেশে মামলুক বাহিনী ত্রিপোলিতে চূড়ান্ত হামলা চালিয়ে ত্রিপোলি জয় করে নেয়।

৫০৩ হিজরি সনে খ্রিস্টান কর্তৃক দখলকৃত ত্রিপোলি দীর্ঘ একশ পঁচাশি বছর পর সুলতান কালাউন আবারো উদ্ধার করেন।

বিদায় হে কুকুরের দল!

ত্রিপোলির পতনের পর শামে ক্রুসেডারদের দখলে রয়ে যায় কেবল সুর, আক্কা ও বৈরুত নগরী।

সুলতান কালাউনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল আশরাফ সালাউদ্দিন খলিল ৬৯০ হিজরি (১২৯১ ঈসায়ী) সনে ক্রুসেডারদের সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী আক্কা জয় করেন। ইতিপূর্বে সুলতান বাইবার্স ও সুলতান কালাউন বহু চেষ্টা করেও যে আক্কা নগরী জয় করতে পারেননি, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আল আশরাফের হাতে সেই বিজয় দান করেন।

আক্কার পতনের পর সুর, সিডন ও বৈরুতসহ একে একে শামের অবশিষ্ট খ্রিস্টান নগরী গুলোরও পতন ঘটে এবং শামে খ্রিস্ট রাজ্যের পতন ঘটে। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি মুসলিম উম্মাহ্র জন্য জিহাদের বিধান নাযিল করেছেন।

বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট ক্রুসেডাররা শাম থেকে পালিয়ে শামের সন্নিকটে নতুন দুটি খ্রিস্টানরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। একটি হলো আর্মেনিয়া, অপরটি দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাস। পরবর্তীতে ৮২৯ হিজরি (১৪২৬ ঈসায়ী) সনে মামলুক

সুলতান আল আশরাফ বার্সবাই সাইপ্রাস জয় করেন। আর উসমানিরা আর্মেনিয়া জয় করেন।

সংক্ষেপে:

আল কুদ্‌স ও শামের বিভিন্ন অঞ্চল জবরদখল করার পর খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা দামেশকসহ অবশিষ্ট শাম এবং পরে মিশর জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে সুলতান ইমাদুদ্দিন জিনকি রাহি. এক অব্যাহত জিহাদের ধারা শুরু করেন। তার সুযোগ্য উত্তরসুরি নুরুদ্দিন জিনকি রহ. সে ধারাকে আরো বেগবান করেন। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রাহি. পবিত্র নগরী আল কুদস পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে তাকে চূড়ান্ত লক্ষ্যপানে একধাপ এগিয়ে নেন। আর এর সফল পরিসমাপ্তি ঘটে চার মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ, রুকনুদ্দিন বাইবার্স, সাইফুদ্দিন কালাউন ও আল আশরাফ খলিলের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ পাক তাদের সকলের উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

সপ্তম অধ্যায়: তাতারীদের ইতিহাস

✓ **তাতারদের পরিচয়:** প্রাচীন শামানি (Shamanism) ধর্মের অনুসারী যাযাবর, বর্বর, কুখ্যাত তাতার জাতির বাস ছিল চীন ও মঙ্গোলিয়ার বিস্তীর্ণ গোবি মরুভূমি অঞ্চলে। এরা তারকারাজির উপাসনা করতো, সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের প্রণাম করতো, কুকুরসহ সব ধরণের প্রাণির মাংস ভক্ষণ করত। হত্যা, লুটপাট, রাহাজানি, হানাহানি ও প্রতারণার জন্য তাতারদের

কুখ্যাতি ছিল। দুইভাই তাতার ও মোঙ্গল- এর বংশধরদের যথাক্রমে তাতার ও মোঙ্গল নামেই অভিহিত করা হয়। অবশ্য অনেকে মোঙ্গলদেরকে তাতার বংশের অংশ মনে করেন। চেঙ্গিস খান ছিল মোঙ্গল গোত্রীয়। আর তৈমুর লং ছিল তাতার গোত্রীয়। বর্তমানে রাশিয়া, সাইবেরিয়া ও ক্রিমিয়া উপদ্বীপে বসবাসকারী গোত্রসমূহকে তাতার বলা হয়। আর চীন ও আফগানিস্তানে বিদ্যমান গোত্রসমূহকে বলা হয় মোঙ্গল।

✓ **চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে ইসলামি ভূ-খণ্ডে তাতারি আগ্রাসন:**

চেঙ্গিস খান এমন এক সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল, যার অধিবাসীর সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তার রাজধানী ছিল মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত কারাকোরাম নগরী। প্রজাদের জন্য সে একটি জীবন বিধান/সংবিধান প্রণয়ন করেছিল তার নাম ইয়াসাক বা ইয়াসা। চেঙ্গিস খান বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে আগ্রাসন চালালেও তার ভিতরে মুসলিম ভীতি ছিল। তাই সে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সাথে শান্তি-চুক্তি করে রেখেছিল।

খাওয়ারিজম রাষ্ট্র তখন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি ছিল। যার অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল পাঁচ লক্ষ।

খাওয়ারিজমের শাহ (সুলতান) আলাউদ্দিন মুহাম্মাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জের ধরে অদূরদর্শী আব্বাসী খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ্ই চেঙ্গিস খানকে খোয়ারিজম রাষ্ট্র আক্রমন করতে প্ররোচিত করেছিল। যদিও চেঙ্গিস খান তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি, তবে সে মুসলমানদের দুর্বলতা (অনৈক্য) বুঝে ফেলে যে, এই মুসলিম জাতি পূর্বের সেই মুসলিম জাতি নয়।

সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ কর্তৃক সম্পদের লোভে চারশ সদস্য বিশিষ্ট একটি মোঙ্গল বণিক কাফেলার সদস্যদের হত্যার জের ধরে চেঙ্গিস খান মুসলিম খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ৬১৬ হিজরি সনের ৪ জিলহজ্জ (১২২০ ঈসায়ীর ফেব্রুয়ারি মাসে) তাতাররা বুখারায় প্রবেশ করে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। দুদিনের আগের সুবিশাল ও সুসমৃদ্ধ বুখারা নগরী পরিণত হয় বিধ্বস্ত এক ধ্বংসস্তুপে, যেন গতকালও সেখানে কেউ বসবাস করেনি। ৬১৭ সালের মুহাররাম মাসে (১২২০ ঈসায়ীর মার্চ মাসে) একই ভাবে সমরকন্দকেও ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়। এরপর তাতাররা মুসলমানদের অন্যান্য ভূমিগুলোতে একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।

চেঙ্গিস খান যখন মুসলিম ভূ-খণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক আব্বাসি খলিফা নাসির লি দ্বীনিল্লাহ তখন ব্যস্ত জনসাধারণের উপর জুলুম করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠনে এবং নারী ও ভোগবিলাসের মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে!

৬২৪ হিজরি (১২২৭ ঈসায়ী) সনে চেঙ্গিস খান মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ পাক তাকে অভিশপ্ত করুন এবং তার উপযুক্ত বদলা দান করুন। আমীন।

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য তার চার পুত্রের মাঝে চার ভাগ হয়ে যায়।

✓ বাগদাদের শেষ আব্বাসি খলিফা (৩৭ নং) ছিল মুসতাসিম বিল্লাহ। তার উজির ছিল মুআইয়াদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আলকামি। সে ছিল কট্টরপন্থি শিয়া মতান্তরে ইহুদি বংশোদ্ভূত। স্বভাবতই তার অন্তরে আব্বাসি খিলাফত এবং সুন্নী মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ লুকিয়ে ছিল এবং যেকোনো মূল্যে আব্বাসী খিলাফত ধ্বংস করে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব ছিল। উজির তাতারদের কাছে মুসলিম সাম্রাজ্যের যাবতীয় গোপন তথ্য সরবরাহ করত এবং তাতারদের কর্মতৎপরতার সংবাদ খলিফার কাছে পৌঁছতে বাধা দিত।

বিশ্বাসঘাতক এই গাদ্দারকে খলিফা খুব বিশ্বাস করতো। অথচ এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের হুকুম ছিল- وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ

"তোমরা তোমাদের দ্বীনী ভাই ব্যতীত অন্য কাউকে বিশ্বাস করো না।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৭৩)

কোনো বেদ্বীন কাফের-মুশরিক, মুরতাদকে প্রশাসনের দায়িত্বে বসানো আত্মহত্যার শামিল। যার পরিণতি মুসলমানরা বার বার ভোগ করেছে কিন্তু খুব কমই আমাদের শিক্ষা হয়েছে।

✓ এরপর এলো ৬৫৬ হিজরি। এ বছরেই ১২ মুহাররাম মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র তাতার শাসক হালাকু খান পুরো বাহিনী নিয়ে বাগদাদে উপস্থিত হয়। তার বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। হালাকু খানের উজির ছিল গাদ্দার নাসিরুদ্দিন তুসি। অন্যদিকে, বাগদাদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, অশ্বারোহী সৈন্য দশ হাজারও হবে না। রাফিজি উজির আলকামির প্ররোচনায় খরচ কমাতে খলিফাতুল মুসলিমীন সেনাবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষ থেকে দশ হাজারে কাট-সাট করে নিয়ে এসেছিল আগেই। এরপর হালাকু বাহিনী পুরো বাগদাদে চল্লিশ দিন ব্যাপী স্মরণকালের ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস গণহত্যা চালায়। সর্বমোট বিশ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু-তরুণ-বয়োবৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করা হয়। বাগদাদের অলি-গলিতে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। আমিরুল মুমিনীনকে বস্তায় ভরে পদদলিত করে হত্যা করা হয়।

হায়! পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাজা-বাদশাই এমন অপমানজনক মৃত্যু লাভ করেনি। আল্লাহ পাক যা চান!! অন্যদিকে, আল্লাহ্ পাক রাফিজি উজির ইবনুল আলকামির অনিষ্ট করুন, তাকে অভিশপ্ত করুন; জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত! আল্লাহ্ পাক ইবনুল আলকামির জন্য সেই ফয়সালাই করেছিলেন, যা তিনি পৃথিবীর অপরাপর অন্যান্য গাদ্দারদের জন্য করে থাকেন। এই ঘটনার দুই মাসের মধ্যেই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। দুঃখ, পরিতাপ ও নিরাশাকে সঙ্গী করেই তার মৃত্যু হয়, এবং আপন ঠিকানায় পৌঁছে যায়। এর কিছু দিন পর তার পুত্র (পিতার পরবর্তী উজির) ইযযুদ্দিন ইবনুল ফজল মুহাম্মাদ তার সাথে একই ঠিকানায় মিলিত হয়। আলকামির স্বপ্নগুলো স্বপ্নই রয়ে গেল, মাঝখানে ধ্বংস হল একটি জাতি!!

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। আল্লাহ পাক তাঁর সুন্নাহ্র ব্যতিক্রম করেন না।

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ۝١

"যারা কুফুরী করে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় বাধাপ্রদান করে, আল্লাহ্ তাঁদের কর্মকে ব্যর্থ করে দেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:০১)

✓ প্রিয় ভাই! মুসতাসিম বিল্লাহর পূর্বসুরী বিশজনের মধ্যে সতেরজনই খলিফা ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন ধার্মিক, সংযমী ও সচ্চরিত্রবান। তিনি মুখস্থ ও বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের অধিকারী ছিলেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শারফুদ্দিন দিময়াতি রহ. তার সনদে ৪০ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার হাদীস বর্ণনার ইজাজত (শাস্ত্রীয় অনুমতি) ছিল। তবে তার মধ্যে দূরদর্শিতা ও সাহসের অভাব ছিল। ছিল জিহাদের ব্যাপারে গাফলতি। ফলে তার ভাগ্যে তাই ঘটল যা আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত বিধান। ফলে তার সেই সুউচ্চ বংশমর্যাদা ও পিতৃ-পরিচয়, তার ধার্মিকতা, তিলাওয়াত, পরহেযগারী আল্লাহ্র দরবারে কোনো কাজে আসেনি। জিহাদের গাফলতির কারণে, উম্মাহ্র এই পরিণতির পাপ তার ঘাড়ে বর্তায়, যার ফলে আল্লাহ্ তার কপালে এমন জিল্লতি আর অপদস্তি রেখে ছিলেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন, আর আমরা তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهٗ حَتىّٰ تَرْجِعُوْا اِلىٰ دِيْنِكُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' পদ্ধতিতে (এক ধরনের সুদ ভিত্তিক ব্যবসা) ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরে

আসবে।" (আবু দাউদ ৩৪৬২, বায়হাকী ১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস ১৬০৩, কানযুল উম্মাল ১০৫০৩, বুলুগুল মারাম ৮৪১)

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِلَّا ضَرَبَهُمْ اللهُ بِذِلٍّ وَلَا أَقَرَّ قَوْمٌ الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ اِلَّا عَمَّهُم اللهُ بِعِقَابٍ

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেছেন, যদি কোন জাতি জিহাদ ছেড়ে দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। আর যদি কোন জাতি তাদের মধ্যে কোন অন্যায়কে আশ্রয় দেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করেন।" (জামে'আ আহাদীস ২৭০৩৫, মুজামুল আওসাত ৩৮৩৯, কানযুল উম্মাল ৮৪৪৭)

প্রিয় ভাই! ঘোড়ার ললাটে ইয্যত রয়েছে। আর গরুর লেজে রয়েছে লাঞ্ছনা।

বাগদাদের মুসলমানরা ব্যবসা, বাণিজ্য, চাষাবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দ্বীনচর্চা, দ্বীনী গবেষণা- সকল ক্ষেত্রে ছিল অগ্রগামী। কিন্তু কেবল এক ক্ষেত্রে তারা গাফেল ও অপ্রস্তুত ছিল, আর তা হলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করলেন।

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٖ قَدِيرٌ ٣٩

"যদি তোমরা (আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য) বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (সূরা তাওবাহ ৯: ৩৯)

سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٣

"এটাই আল্লাহ্র সুন্নাত/রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। আর তুমি আল্লাহ্র সুন্নাতের কোনো পরিবর্তন পাবে না।" (সূরা ফাত্হ ৪৮:২৩)

তাতারি আগ্রাসন মোকাবিলায় মুসলমানদের অভিযান:

বাগদাদে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর হালাকু খান এবার শাম দখলের পরিকল্পনা করে। ৬৫৮ হিজরিতে হালাকু খান সাত দিনের অবরোধের পর আলেপ্পোতে প্রবেশ করে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। আলেপ্পোতে বাগদাদের চেয়েও বেশি মুসলমান হালাকু বাহিনীর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এরপর মোঙ্গল বাহিনী কোনোরূপ বাধাবিপত্তি ছাড়াই দামেশক জয় করে নেয়। তাতারীরা মুসলমানদের খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য, বাগদাদ এবং শামের পতন ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনার পর এবার দৃষ্টি দেয় মামলুক নিয়ন্ত্রিত মিশরের প্রতি। মিশরের পর হালাকু খানের পরবর্তী টার্গেট ছিল মক্কা ও মদীনা। এই পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই ইসলাম ও মুসলমানদের খেল খতম হয়ে যেত, দুনিয়া থেকে মুছে যেত একসময়ের একটি মহাপরাক্রমশালী জাতি। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পর্যায়ে এসে তাঁর অপর এক সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করলেন। কী ছিল সেটি?..........

"ইসলাম কখনো ধ্বংস হবে না।" হ্যাঁ ভাই, এটি একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠিত সত্য। আল্লাহ্ পাকই এর হেফাযতকারী।

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ٣٢ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٣

"৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর (ইসলাম)-কে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। ৩৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (০৯ সূরা তাওবা:৩২-৩৩)

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢١

"আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে: আমি (আল্লাহ) এবং আমার রাসূলগণ (ও তাঁদের অনুসারীরা) অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (৫৮ মুজাদালাহ: ২১)

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ٥٦

"আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (তারাই আল্লাহ্‌র দল), আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।" (০৫ সূরা মায়েদাহ্: ৫৬)

ইসলামের এই কঠিন দুর্যোগপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে (যখন আর মাত্র দুটো অঞ্চল জয় করলেই ইসলাম দুনিয়া থেকে মুছে যাবে ঠিক তখনি) আল্লাহ্ পাক তার এক বান্দা সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহি.কে মিশরের মামলুক রাষ্ট্রের সুলতান বানিয়ে দেন। আল্লাহ্‌র এই মর্দে মুজাহিদ বান্দা দুর্বল ও মৃতপ্রায় মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে অজেয়, দুর্নিবার, মহাশক্তিধর তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেন।
সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহি. সার্বিক দিক বিবেচনা করে তাতাররা মিশরে আগমনের পূর্বে নিজেই অগ্রসর হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর সেনাপতি ছিল রুকনুদ্দিন বাইবার্স। তিনি তার বাহিনী প্রস্তুত করে শাম অভিমুখে রওনা হন। সংবাদ পেয়ে হালাকু খানের প্রধান সহকারী, ধূর্ত-খুনি কাতবুগা'র নেতৃত্বে নব্বই হাজার সৈন্যের বিশাল তাতার বাহিনী কুতুজের বাহিনীর দফারফা করতে অগ্রসর হয়।

৬৫৮ হিজরি সনের রমজান মাসে (১২৬০ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বর মাসে) আইনে জালুতের প্রান্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত হয়। কী ছিল এই যুদ্ধের ফলাফল? জানেন কি? তাতারী বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বলতে পারেন, আইনে জালুতের যুদ্ধের পর কতজন তাতারী জীবিত ছিল? গোটা তাতারী বাহিনী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। একজন তাতারীও বেঁচে ছিল না।

আপনারা কি এমন ঘটনা পূর্বে কখনো শুনেছেন? যেই বাহিনী অর্ধ দুনিয়া জয় করেছিল, মুহূর্তেই তারা ধ্বংস হয়ে গেল। যারা লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তপাত ঘটাল, শত শত শহর বিরানভূমিতে পরিণত করল, মুহূর্তেই তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ল। সুব্হানাল্লাহ!!!

أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٣ قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ١٤

"তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ- যদি তোমরা মুমিন হও। যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিজয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।" (সূরা তাওবাহ ৯: ১৪)

জিহাদ! জিহাদ!! এটাই জিহাদের শক্তি!!! পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, একমাত্র জিহাদই সর্বকালে সর্বযুগে মুসলমানদের গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে এনেছে। জিহাদ যতদিন আছে, ইসলাম থাকবে। তাতারী আগ্রাসন, যা ছিল দুনিয়ার ইতিহাসে মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বর্বরতম ও নিকৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞগুলোর একটি, সেখান থেকেও মুসলমানরা উত্তোরণ লাভ করে কেবলই জিহাদের বরকতে। তাই মুসলমানদের উপর সকল প্রকারের যুলুম-নির্যাতন আর আগ্রাসনের সবচেয়ে সুন্দরতম জবাব হল এই জিহাদ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার।

আইনে জালুতের যুদ্ধের পরবর্তী তাতারদের ইতিহাস:
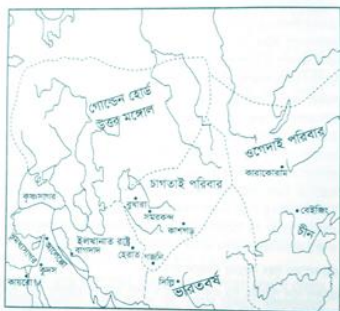
আইনে জালুতের যুদ্ধের পরাজয়ের পর তাতারদের মাঝে অন্তর্বিরোধ শুরু হয়। আগেই বলা হয়েছিল, চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য তার চার পুত্রের মাঝে ভাগ হয়ে যায়। চেঙ্গিস সাম্রাজ্যের প্রথম অংশ পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়া অঞ্চলের শাসক ছিলেন হালাকু

খানের চাচাতো ভাই বার্কে খান বিন জোচি খান বিন চেঙ্গিস খান। এই বার্কে খান ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ পাক তার উপর রহম করুন। আর চেঙ্গিস সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় অংশ ইলখানিয়া সাম্রাজ্য তথা পারস্য, খোরাসান এবং আরব ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলের শাসক ছিল হালাকু খান। কিছুদিন পরই বার্কে খান ও হালাকু খানের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধে খবীস্ হালাকু খান পরাজিত হয়।

৬৬৩ হিজরি সনে (১২৬৫ ঈসায়ী) মৃগিরোগে আক্রান্ত হয়ে হালাকু খানের মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অভিশপ্ত করুন।

হালাকু খানের পর তার পুত্র আবাগা খান ইলখানিয়া তাতারদের শাসনভার গ্রহণ করেন। বার্কে খান আবাগা খানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাকে পরাজিত করেন এবং বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন।

৬৬৫ হিজরি সনে (১২৬৬ ঈসায়ী) বার্কে খানের মৃত্যু হয়। তার পর মানকুতামুর বিন বাতু বিন জোচি খান বিন চেঙ্গিস খান উত্তর সাম্রাজ্যে তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও মুসলমান ছিলেন।

এদিকে খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের সহায়তায় আবাগা খানের নেতৃত্বাধীন তাতাররা শামের মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। কিন্তু ৬৬৯ হিজরিতে আবাগা খান ও তার জ্ঞাতি ভাই মানকুতামুরের মাঝে লড়াই হলে আবাগা খান পরাজিত হয়।

হিমসের যুদ্ধঃ

৬৮০ হিজরি (১২৮১ ঈসায়ী) সনে হিম্‌সের যুদ্ধ সংঘটিত হয় । প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে এর তুলনা চলে আইনে জালুতের যুদ্ধের সঙ্গে। আবাগা খান শাম অঞ্চলে আবারো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার ভাই (হালাকু খানের আরেক পুত্র) মিংগু তিমুর এর নেতৃত্বে এক লক্ষাধিক সৈন্যের বাহিনীকে শাম অভিমুখে প্রেরণ করে।

মিশরে তখন শাসক ছিলেন কালাউন পরিবারের সুলতান আল মালিকুল মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন আস্ সালিহ। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত মুজাহিদ সংগ্রহ করে হিমসের উপকণ্ঠে তাতারিদের মুখোমুখি হন।

প্রথম দিকে জয়ের পাল্লা তাতারদের দিকে থাকলেও মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমণে তাতাররা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। প্রচুর তাতার সৈন্য নিহত হয়। বাকীরা পলায়নের পথ ধরলে মুজাহিদ বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

হিমসের যুদ্ধে চরম ছ্যাঁকা খেয়ে কিছুদিন পরই আবাগা খান অক্কা পায়।

হালাকু খানের বংশধর গাজানের ইসলাম গ্রহণ:

৬৯৪ হিজরি (১২৯৪ ঈসায়ী) সনে তাতার রাষ্ট্র ইলখানাতের শাসনভার গ্রহণ করে হালাকু খানের প্রপৌত্র গাজান বিন আরগুন বিন আবাগা খান বিন হালাকু খান। তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করায় তার অনুসরণে তাতার জনগোষ্ঠীর প্রায় এক লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করে। সে দিনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক দিন। তিনি নিজের নাম রাখেন 'মাহমুদ'। তিনি বহু গির্জা ধ্বংস করেন এবং খ্রিস্টানদের উপর জিজিয়া আরোপ করেন। তার শাসনামলেই তাতারদের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। এই মাহমুদ গাজান থেকে শুরু করে পরবর্তী ইলখানাত শাসকরা মুসলমান ছিল।

কিন্তু দুঃখজনক হল, গাজান তার রাজ্য মিশর ও শাম অঞ্চলেও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে শামের মুসলমানদের সাথে একাধিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, যার কোনো কোনটি ছিল চরম রক্তক্ষয়ী।

তাতারি দুর্যোগ মোকাবিলায় এই সময় ইবনে তাইমিয়া রাহি. অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। একদিকে তিনি মুসলমানদের উপর আগ্রাসী মুসলিম তাতারদের 'খারেজী' ফতোয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন, অপরদিকে তাতারদেরকে সহীহ ইসলামের তালিম দেয়ার চেষ্টা করেন, যেন তারা মুসলমান ভাইদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকে এবং বন্দিদেরকে মুক্ত করে দেয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মুসলিম বন্দিদেরকে তাতাররা মুক্তি দেয়।

শাকহাবের যুদ্ধ:

কিন্তু এতকিছুর পরও তাতাররা ৭০২ হিজরি সনের রমজান মাসে (১৩০৩ ঈসায়ী) দামেশকের দক্ষিণে শাকহাব প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

তাতারী বিরোধী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ইবনে তাইমিয়া রাহি., তৎকালীন সুলতান আন্ নাসির মুহাম্মাদ বিন কালাউন ও সমকালীন আব্বাসি খলীফা ২য় মুসতাকফি বিল্লাহ।

৭০৩ হিজরিতে গাজান মৃত্যুবরণ করেন।
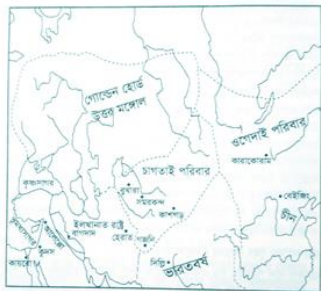
তাতারি হুমকি আরো একবার!

চেঙ্গিস খানের বিভক্ত রাজ্যের আরেক অংশ যা গঠিত ছিল পুরো তুর্কিস্তান, উইঘুরদের রাজ্য কাংসু এবং মা-অরাউন নাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চলসমূহ নিয়ে, তার শাসক ছিল তৈমুর লং। তাতাররা ৭৯৫ হিজরি (১৩৯৩ ঈসায়ী) সনে সেনাপতি তৈমুর লং এর নেতৃত্বে বাগদাদে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ৭৯৭ হিজরি সনে পুরো মেসোপটেমিয়া অঞ্চল তাতারদের অধিকারে চলে যায়।

৮০৩ হিজরি সনে তৈমুর লং আলেপ্পোকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দামেশক অভিমুখে রওনা হয়। অতঃপর তৈমুর লং দামেশকে প্রবেশ করে আলেপ্পোর মতো দামেশকেও প্রচুর ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাত ঘটায়।

মজার বিষয় হল, তৈমুর লং এর নেতৃত্বে এবার তাতাররা ছিল সবাই মুসলমান!!! তৈমুর লং ছিল শিয়া মতালম্বী আর নামে মাত্র মুসলমান। ইসলামের বিন্দুমাত্র চেতনাও যার মধ্যে ছিল না। ইসলামের দুশমনরা বারবার তাকে ব্যবহার করেছিল। মুসলিম হওয়ার পরও তার মাধ্যমে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। তার কর্মকাণ্ডের উপর ইসলামের কোনো ছাপ ছিল না।

তাতারদের মধ্যে ইসলামের প্রসার:

প্রিয় ভাই, তাতার কিংবা মোঙ্গল নাম শুনলেই আজ আমাদের কল্পনায় পাশবিকতা, ধ্বংসলীলা ও নির্মমতার এমন সব চিত্র ভেসে ওঠে- যার সাথে মানবতার ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। কিন্তু আমরা জানি কি, মুসলমানদের ভূ-খণ্ডে প্রবেশের পঁয়ত্রিশ বছর পর মোঙ্গলদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং একশ বছরের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে তাতাররা প্রায় সকলেই কলেমা পড়নেওয়ালা আমাদের ভাই-বোন হয়ে যান??? তারা এসেছিল মুসলমানদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে মুসলিম ভূমিগুলোকে জয় করতে, কিন্তু তার আগেই 'ইসলাম' তাদের সকলের অন্তর জয় করে নেয়! আলহামদুলিল্লাহ!!!

আমরা তো শুধু তাতারদের উত্থানকালের বর্বরতা আর আইনে জালুতের প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে তাদের পরাজয়ের ইতিহাসই জানি। কিন্তু আমরা কি জানি, তাতারদের এর পরের ইতিহাস? চেঙ্গিস খান, হালাকু খান আর তৈমুর লং-এর পরের ইতিহাস?? শোষণ আর হত্যা ছাড়া মুসলমানদের ইতিহাসে মোঙ্গলদের আর কোনো অবদান ছিল কি??

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইতিহাসে অদ্বিতীয় নিপীড়ন ও রক্তক্ষরণের ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষণকালের মধ্যেই মোঙ্গল ভাইয়েরা সর্বোচ্চ মানবতা ও সম্প্রীতির এক অধ্যায় রচনা শুরু করে। আমাদের অনেক তাতার ভাইদের দিয়ে আল্লাহ্ পাক ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। বহু ভূ-খণ্ড বিজয় করে তারা সেখানে মুসলমানদের ভিত মজবুত করেছেন, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। বরং তাদের অনেকে ইসলামের খাতিরে স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধও করেছেন।

আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল, আমরা ওই সকল বীর ও মহাত্মা দাঈ ভাইদের নাম এখনো জানতে পারিনি, যারা মোঙ্গলদের মত একটি বর্বর জাতিকে ইসলামের ছায়াতলে এনে এক বিস্ময়কর ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন।

আমরা অস্বীকার করছি না, মোঙ্গল ভাইদের অনেকে ইসলাম গ্রহণের পরও পূর্ববর্তীদের অভ্যাস-চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তবে সেটা ছিল সাময়িক আর আমাদেরই দা'ওয়াহ্র ত্রুটি! আমাদেরকে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মুসলমানদের ইতিহাসে তাদের অবদান ও ইসলামি ভূ-খণ্ডের

সীমা বৃদ্ধি করতে তাদের পদক্ষেপ এমন অভূতপূর্ব ছিল, আজ পর্যন্ত যার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। এমনইভাবে, যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা পা ফেলতে পারেনি, সেখানেও তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তাতার মুসলমান ভাইয়েরা প্রাচ্য থেকে আরব ও মধ্য ইউরোপের সীমান্ত পর্যন্ত ইসলামের ভূ-খণ্ড বিস্তৃত করেছিল। তাদেরকে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তারা সেসব অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। এজন্য তারা অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছে এবং আজও সহ্য করে যাচ্ছে। এতসব বিপর্যয়ের মাঝেও তারা তাদের প্রাণের ধর্ম ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আছে।

তাতাররা শুধু নামেই মুসলমান হয়নি; বরং তাদের মধ্যেও জন্ম নিয়েছেন অনেক ফকীহ, আলেম, মুজাহিদ, দাঈ, দরবেশ। যারা ছিলেন সততা ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসের অধিকারী। তারা ইতিহাসের কঠিন একেকটি মুহূর্তে ইসলামকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন।

নিম্নে মুসলিম তাতারদের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ও অবস্থা তুলে ধরা হল:
চেঙ্গিস খান পৃথিবীর বড় একটি অংশ দখল করে নিয়েছিলেন এবং তার সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার তার চার ছেলের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মোঙ্গলরা (মোঘল) ভারতবর্ষও জয় করেন। তাই মুসলিম তাতারদের ইতিহাস পাঁচটি ভাগে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

তাতার সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ:

পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়ায় মোঙ্গল শাসন

✓ **তাতার অধিকৃত অঞ্চলসমূহ:** চেঙ্গিস খানের বড় ছেলে জোচি খানকে প্রদেয় রাশিয়া, বুল গেরিয়া, ককেশাস অঞ্চল, পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়া । এই অঞ্চলকে গোল্ডেন হোর্ড-ও বলা হয়। এর রাজধানী ছিল সারাই শহর।
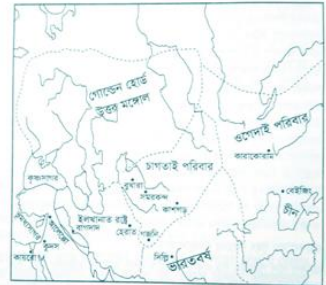
- ✓ **গুরুত্বপূর্ণ শাসকবৃন্দ:** বাতু খান, বারকে খান (প্রথম মুসলিম তাতার শাসক), মাংকো তৈমুর, তোদান মাংকো, গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মাদ উজবেক, মাহমুদ জানিবেগ, মুহাম্মাদ বারদি বেগ ইত্যাদি।

- ✓ মাহমুদ বারদি বেগের মৃত্যুর পর উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং প্রকাশ্যেই ভাগ-বিভক্তি শুরু হয়। এ সময় তৈমুর লং উত্তর সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। এরপর আবার উত্তর মোঙ্গলদের মধ্যে কয়েকটি রাজ্য আত্মপ্রকাশ করে, যেমন: ক্রিমিয়া, কাজান, আস্ট্রাক্যান, সাইবেরিয়া ও খাওয়ারিজম। এ সবগুলোই রাজধানী সারাই শহর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং পরস্পরে লড়াই শুরু করে। উত্তরাঞ্চলীয় মোঙ্গলদের রাজ্যে যেন স্পেনের করুন দৃশ্য পুনরায় চিত্রায়িত হয়। বিভিন্ন সুযোগে রুশরা একের পর এক এসব রাজ্য হজম করতে থাকে।

- ✓ ৯৫৯ হিজরি (১৫৫২ ঈসায়ী) সনে মস্কোর গভর্নর ইভান রাহিব স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক শাইখ আলির সহায়তায় রুশ বাহিনী নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তুমুল লড়াই করে কাজান দখল করে নেয় এবং সেখানকার তাতার মুসলিম ভাই-বোনদের উপর নিকৃষ্ট নির্যাতনের সূত্রপাত করে। মুসলিম তাতারদের উপর বিভিন্ন জুলুম অত্যাচারের কারণে গভর্নর ইভানকে রাহিব (ভয়ানক) নামক উপাধিতে স্মরণ করা হয়।

- ✓ ইভান রাহিবের নেতৃত্বে রুশ বাহিনী ৯৬৫ হিজরি (১৫৫৮ ঈসায়ী) সনে গাদ্দার দরবেশ আলি খানকে উৎখাত করে আস্ট্রাক্যান দখল করে নেয় এবং তাতার মুসলমানদের ওপর নৃশংস নিপীড়ন চালায়।

- ✓ ১০০৩ হিজরি (১৫৯৪ ঈসায়ী) রুশ বাহিনী সাইবেরিয়া অঞ্চলও তাতার মুসলিমদের থেকে দখল করে নেয়।

- ✓ ১১৯৭ হিজরি (১৭৮৩ ঈসায়ী) সনে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিষ্ঠার পর তারা ইউক্রেনকে উপহার হিসেবে ক্রিমিয়া প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরও ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অধিভুক্তই রয়ে যায়।

- ✓ এভাবে রাশিয়া মুসলিম তাতার শাসিত অনেক অঞ্চল হজম করে ফেলেছিল। যেমন: উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্য, ককেশাস, তুর্কিস্তান ইত্যাদি। দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে রাশিয়া তাতার মুসলমানদের উপর কঠিন নির্যাতনের পন্থা অবলম্বন করত, যা স্পেনের মরিস্কো মুসলমানদের উপর কৃত অত্যাচারকেও হার মানায়। খুন, ইজ্জতলুণ্ঠন, দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা, বাড়িঘর ধ্বংস করা, মসজিদগুলোকে ভেঙে সেগুলোকে গির্জা, ঘোড়ার আস্তাবল, সেনাক্যাম্প, নাট্যশালা, মদের আড্ডা ইত্যাদিতে পরিণত করা, দ্বীনি মাদরাসা-মক্তবগুলোকে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকেন্দ্র বানানো, মুসলমানদের উপর দুঃসাধ্য করের বোঝা চাপানো, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা ইত্যাদি- এরূপ বহুবিধ পন্থায় তাতার মুসলমানদের উপর নির্যাতন করা হত। অবশ্য কেউ যদি ধর্মত্যাগ করত, তাহলে সে সব ধরনের চাপ থেকে মুক্তি পেত। তবে, আলহামদুলিল্লাহ্, ধর্মত্যাগীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এছাড়া অনেক তাতার ভাই-বোনেরা যুগ যুগ ধরে নিজেদের ঈমান গোপন রেখে বংশপরম্পরায় দ্বীন রক্ষা করে চলছিল।

- ✓ সোভিয়েত আমলে মুসলিমদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত নেতা স্টালিনের শাসনকালেই প্রায় ১১ মিলিয়ন (এক কোটি দশ লক্ষ) মুসলিমকে হত্যা করা হয়। (আল্লাহ পাক স্টালিনকে অভিশপ্ত করুন এবং সে ও তার মত অন্যদেরকে তাদের প্রাপ্য উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিন।)

- ✓ ১৪১১ হিজরি (১৯৯১ ঈসায়ী) সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙনের সময় যে সকল মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলো রাশিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ করে সেগুলো হল: আজারবাইজান, কাজাখস্থান, উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান। তারপরও অনেকগুলো মুসলিম রাজ্য রাশিয়ার মধ্যে হারিয়ে যায়, যথা: বাশকোরতোস্তান, তাতারস্তান, চুভাকিয়া প্রজাতন্ত্র, মরদোভিয়া প্রজাতন্ত্র, মারি এল প্রজাতন্ত্র, আডমুর্ড প্রজাতন্ত্র, ওরেনবুর্গ প্রদেশ।

- ✓ তাতার মুসলিমরা রাশিয়া থেকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাতারস্তান, বাশকোরতোস্তান, ক্রিমিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের তাতাররা স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দিলে রুশ বাহিনী গুড়িয়ে দেয় তাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা রাশিয়া হতে মুক্তি পেতে জার্মান বাহিনীকে সহায়তা করে ও প্রতিরোধ না করে আত্মসমর্পন করে। কিন্তু খবিস

হিটলার তাতার মুসলিমদের মর্যাদা রক্ষা করেনি। তাদেরকে হত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু তাতার মুসলিমদের দুর্ভোগ আরো বাকী ছিল।

✓ জার্মানদের পরাজয়ের পর রাশিয়া তাতার মুসলিমদের থেকে আরো বড় প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। জার্মানদের সহযোগিতা করায় তাদেরকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে, মসজিদ ধ্বংস করে, কুরআন পুড়িয়ে অবমাননা করে, নিরস্ত্র তাতারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জীবিতদের নির্বাসিত করা হয় সাইবেরিয়ার দুঃসহ বরফাবৃত এলাকায়। সেখানে অনেক তাতার মুসলমান মারা যায়। এরপর হাতেগোনা কিছু মুসলিম ছাড়া ক্রিমিয়া উপদ্বীপে আর কোনো তাতার মুসলিম অবশিষ্ট রইল না।

✓ হায়!!! বর্তমানে যেসব মুসলিমের বংশধর যারা রাশিয়ায় বাস করে, তারা ভুলে গেছে তাদের ধর্মীয় পরিচয়। ক্রমাগত রাশিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন এবং ইসলামের উপর প্রোপাগান্ডার দরুন তাতার মুসলিমরা আজ হারিয়ে গেছে ভ্রান্তির অতলে। কে আমাদের এই তাতার ভাই-বোনদের রুশ আগ্রাসন থেকে রক্ষা করবে, কে তাদের ঈমান, আমল আর ইজ্জত-আব্রুর হেফাযত করবে?

তাতার সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ভাগ:

ইলখানিয়া সাম্রাজ্য তথা পারস্য, খোরাসান এবং আরব ও এশিয়া মাইনর অঞ্চল। চেঙ্গিস খানের পুত্র তুলুইকে এই অংশ দেয়া হয়।
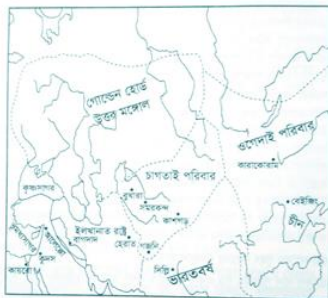
✓ শাসকবৃন্দঃ হালাকু খান, আবাকা খান (হালাকু খানের পুত্র), তেকুদার (হালাকু খানের আরেক পুত্র ও প্রথম মুসলিম শাসক), আরগুন, গাজান (মুসলিম ছিলেন এবং তার পরবর্তী ইলখানাত শাসকবৃন্দ মুসলমান ছিলেন), উলজাতু, আবু সাইদ ইত্যাদি। আবু সাইদ ছিলেন ইলখানিয়া সাম্রাজ্যের শেষ শাসক।

✓ ৭৮৪ হিজরি (১৩৮২ ঈসায়ী) সনে তৈমুর লং এই এলাকায় অভিযানের উদ্দেশ্যে আগমন করে এবং ৮০৭ হিজরী (১৪০৪ ঈসায়ী) সনে সে পুরো

সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। তৈমুরের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য আবারো টুকরা টুকরা হয়ে তার বংশধরদের মাঝে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে পড়ে। তৈমুর ছিল শিয়া রাফেজি মতবাদের অনুসারী। এ মতবাদ তার বংশধরদের মাঝেও চলতে থাকে। তৈমুরীয় অঞ্চলে শিয়া মতবাদের বিস্তারে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

- ✓ তৈমুরের বংশধররা দুর্বল হতে থাকে, এই সুযোগে ইলখানিয়া সাম্রাজ্যে সাফাভিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইল সাফাভি। সাফাভি রাজবংশ ছিল পারস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশগুলোর একটি। একে আধুনিক পারস্যের ইতিহাসের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। এই রাজবংশ ইস্‌না আশারিয়া (বার ইমামপন্থি) শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের শাসনকাল ছিল ১৫০১-১৭৩৬ ঈসায়ী।

- ✓ সাফাভিদের পর এই অঞ্চলে আসে যথাক্রমে আফশারি শাসন, জানদি শাসন, কাজার শাসন, পাহলভি শাসন। অবশেষে পাহলভি শাসক শাহ মুহাম্মাদ রেজার অনাচার, অত্যাচার, পাপাচারের কারণে শিয়াদের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনির ডাকে ১৩৯৯ হিজরি (১৯৭১ ঈসায়ী) ইরানে তথাকথিত ইসলামি (?) বিপ্লব সংঘটিত হয়।

- ✓ বর্তমানে ইরানে সুন্নি মুসলমানের সংখ্যা ৩৬%। শিয়াদের সংখ্যা ৬২%। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল সাফাভি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় ইরানি জনসংখ্যার মাত্র ১০% এর মত ছিল শিয়া। কিন্তু প্রায় দুইশ বছরের শিয়া সাফাভি শাসন ইরানি জনগোষ্ঠির মাঝে শিয়া মতবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নির্যাতন, জবরদস্তিসহ নানা উপায়ে দীর্ঘকাল ধরে সুন্নিদেরকে শিয়া মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এর ফলে একদিকে শিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বহু সুন্নি পরিবার হিজরতের পথে হাঁটে। এরপরও যারা আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে, তাদের বরণ করে নিতে হয়েছে দুর্বিষহ জীবন।

তাতার সাম্রাজ্যের তৃতীয় ভাগ:

অঞ্চলসমূহ: চেঙ্গিস খানের পুত্র ওগেদাইয়ের শাসিত অঞ্চলসমূহ তথা চীন, মোঙ্গল ও পূর্ব তুর্কিস্তান (উইঘুর অঞ্চল)

শাসকবৃন্দ: ওগেদাই, গুয়ুক খান। গুয়ুক খানের পর ওগেদাইয়ের সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম ভাগে, মঙ্গোলিয়া ও পূর্ব তুর্কিস্তানে (উইঘুর অঞ্চল) ওগেদাইদের শাসন চলে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলের শাসনে চাগতাই পরিবার প্রবেশ করে। এ অঞ্চলের রাজধানী ছিল কারাকোরাম।

অন্যদিকে বিশাল চীনা অঞ্চলের শাসক হন কুবলাই খান। তার রাজধানী ছিল বেইজিং।
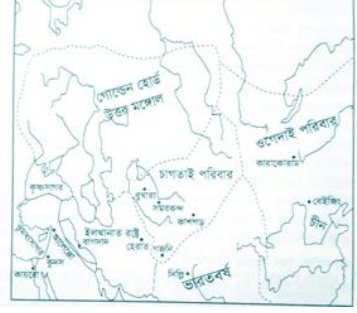
চীন ভূ-খণ্ডে ইসলাম:

✓ চীনে ইসলাম আগমন করে মহান সাহাবী ও তৃতীয় খলিফা উসমান রাদি. এর শাসনামলে। মুসলিম ব্যবসায়ী ও দাঈদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। উমাইয়া শাসনামলে ১৬টি আর আব্বাসি আমলে ১২ টি দাওয়াতি কাফেলার আগমন ঘটে। তবে ইসলাম প্রচার-প্রসারের মূল সময়টা ছিল কুবলাই বংশের মোঙ্গল শাসনামলে। তুর্কিস্তান ও মাআরাউন নাহারের বিপুল মুসলিম সৈন্য চীনে আগমন করে। কোনো সময়ে ১২ টি প্রদেশে সৃষ্ট চীনা সাম্রাজ্যের ৮টি প্রদেশেরই প্রশাসক ছিল মুসলিমরা। চীনে অবস্থিত অধিকাংশ মসজিদই তাতার তথা মোঙ্গল আমলেরই। চীনে সে সময় মুসলিমদের বেশ কদর ছিল। জাগতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই তাদের ছিল অনন্য ভূমিকা। ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুণের ফলে সর্বদাই তারা ছিল উচ্চ সব পদে অধিষ্ঠিত।

✓ চীনে মোঙ্গল শাসনের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে মিং বংশের শাসন। এ সময় পর্যন্ত মুসলিমরা পূর্বের মত মর্যাদা লাভ করত।

- ✓ এরপর আসে মাঞ্চু বংশের শাসন। (১০৫৪-১৩২৯ হি./১৬৪৪-১৯১১ ঈ.)। মাঞ্চুদের শাসন শুরু হতেই অবস্থা বদলে যেতে লাগল। মাঞ্চুরা মুসলিমদের অবস্থান ও কর্তৃত্ব তাদের রাজত্বের জন্য হুমকি মনে করা শুরু করে। তারা হাজার হাজার মুসলমানদেরকে হত্যা করে। মুসলমানরা কয়েকবার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু সে আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার জন্য মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিরোধই যথেষ্ট ছিল। সামান্য বিষয় ও সাধারণ ফিক্‌হি মাস্‌আলাও তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে যথেষ্ট ছিল।

- ✓ অতঃপর, গণতান্ত্রিক চীন শাসনামলে (১৩২৯-১৩৬৯ হি./১৯১১-১৯৫০) পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে ফিরে আসে। এসময় অনেক ইসলামি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

  তবে পূর্ব তুর্কিস্তানে (উইঘুরে)-র পরিস্থিতি তখনও সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

পূর্ব তুর্কিস্তানে (উইঘুরে) মুলমানদের টিকে থাকার সংগ্রাম:

- ✓ বীর সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম এই অঞ্চল জয় করার পর দীর্ঘকাল এখানে ইসলামি শাসন ছিল। এরপর আসে মোঙ্গলরা। তাদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্য বিস্তার করে মাঞ্চুরা। তারা এই অঞ্চলের নাম দেয় শিনচিয়াং (Xinjiang/নতুন অঞ্চল)।

- ✓ এরপর পূর্ব তুর্কিস্তান ও কাংসুতে বিভিন্ন কারণে মুসলিমরা একের পর এক বিদ্রোহ করতে থাকে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, ১২৭১ হিজরি (১৮৫৫ ঈসায়ী) সনে ইয়াকুব বেগের নেতৃত্বে চীন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে গণতান্ত্রিক পূর্ব তুর্কিস্তান (উইঘুর)। তবে এই স্বাধীনতা টিকে ছিল মাত্র ১৩ বছর। ১২৯১ হিজরিতে (১৮৭৫ ঈসায়ীতে) চাইনিজদের হাতে পুনরায় পূর্ব তুর্কিস্তানের পতন হয়। হত্যা করা হয় ইয়াকুব বেগকে।

- ✓ এরপর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্টরা মাও সে তুং এর নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়ানক হত্যাকান্ড চালাতে শুরু করে এবং চীনাদেরকে পূর্ব তুর্কিস্তানে এসে বসবাস করার জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ করে দেয়,

ব্যক্তি মালিকানা নিষিদ্ধ করে, বাজেয়াপ্ত করা হয় মুসলামনদের সমস্ত ধনসম্পদ, এমনকি মহিলাদের অলংকারগুলোও এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করা হয় ইসলাম সম্পূর্ণ আইনবিরোধী মতবাদ। কোন মুসলমান অন্য কোন দেশে হিজরত করা কিংবা চাইনিজ ছাড়া অন্য কেউ এই প্রদেশে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, মসজিদ ও মাদরাসাগুলোতে তালা দেয়া হয় এবং মসজিদগুলোকে সৈনিকদের ক্লাবে পরিণত করা হয়।

✓ পূর্ব তুর্কিস্তানের (উইঘুরের) স্বাধীনচেতা মুসলিমরা এখনো স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু চীনের কঠিন দমন নীতির ফলে স্বাধীনতার স্বপ্ন যেন ডানাভাঙা কোনো পাখি। যে কোনো আন্দোলন সেখানে কঠোর উপায়ে দমন করা হয়।

✓ **দখলদার চীনা সরকারের উরুমচি গণহত্যা:**

দখলদার চীন পূর্ব তুর্কিস্তান দখল করে নেয়ার পর থেকেই পূর্ব তুর্কিস্তানে মুসলিমদের উপরে চালাচ্ছে শতাব্দীর অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যা। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের উপর ঘটে যাওয়া এমনই একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা হল উরুমচি গণহত্যা। ২০০৯ সালের জুলাই মাসের ৫ তারিখ দখলদার চীনা সরকার পূর্ব তুর্কিস্তানের উরুমচি শহরে মুসলিমদের উপর এক বর্বর হত্যাকাণ্ড চালায়। এতে হাজার হাজার মুসলিমকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।
কয়েক হাজার মুসলিম সেদিন জড়ো হয়েছিল তাদের উপর চীনা দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ করতে। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদটুকুও সহ্য হয়নি দখলদার অপশক্তির। সেদিন তারা নির্বিচারে গুলি চালায় প্রতিবাদি মুসলিমদের উপরে। গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় মুসলিমকে, তাদেরকে জোর পূর্বক প্রেরণ করা হয় বন্দীশিবিরে। জোর করে বাড়িঘর থেকে তুলে নিয়ে নিখোঁজ করে দেওয়া হয় অসংখ্য অগণিত মুসলিমকে।

মুসলিম জনগোষ্ঠীকে চীন ও এর সংস্কৃতির জন্য হুমকি উল্লেখ করে জাতিগত নির্মূল অভিযান চালায় তারা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের যাঁতাকলে নিরস্ত্র উইঘুর মুসলমানরা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয় দেশটিতে। ইসলামি নীতি-আদর্শকে মুছে ফেলতে চতুর্মুখী আগ্রাসন চালায় তারা।

গণহত্যার পর থেকে চীনা কর্তৃপক্ষ লজ্জাবতী পর্দানশীন মুসলিম নারীদের ফ্যাশন শো এবং সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মতো কাজে অংশ নিতে বাধ্য করেছে। পর্দার বিধানকে নির্মূল করতে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করেছে। চীনা হান পুরুষদের বিয়ে করতে বাধ্য করেছে।

এছাড়াও মুসলিম পুরুষদের বন্দিশিবিরে আটকে রেখে বাড়িতে চীনা হান পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীদের ঘুমাতে বাধ্য করা হয়েছে।

✓ বর্তমানে কেমন আছে উইঘুরে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনেরা?? সে সম্পর্কেও চীন বিশ্বমিডিয়াকে অন্ধকারে রেখেছে।

বর্তমানে চীনের স্বায়ত্তশাসিত শিনচিয়াং প্রদেশে পুনঃশিক্ষার নাম দিয়ে শুধু ১০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে রাজনৈতিক বন্দিশিবিরে রাখা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৩০ লাখ মুসলিমকে বন্দী শিবিরে আটক রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন। (https://bit.ly/uighur1) চীনের দাবি, তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা দিতে এই 'পুনঃশিক্ষা' শিবিরে রাখা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে বেড়ে উঠতে না পারে সেজন্য উইঘুর মুসলমান সন্তানদের তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে চীন। সেখানে বন্দীদেরকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করছে, যৌন হয়রানি করছে, মদপান ও শূকর খেতে বাধ্য করছে। এমনকি বন্দীদেরকে কুরআনের উপর মলত্যাগ করতে বাধ্য করছে শূকরের সম্প্রদায় এই চাইনিজরা। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।)

(লিংক: https://alfirdaws.org/2022/10/27/60235/)

বন্দিদেরকে তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না।

জনসংখ্যা কমাতে সেখানে উইঘুর মুসলমান নারীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ডিভাইস ব্যবহারে বাধ্য করছে চীন। যেসব নারীর সন্তান সংখ্যা দুইয়ের কম তাদের জরায়ুতে জোর করে জন্মনিয়ন্ত্রণ ডিভাইস প্রতিস্থাপনের আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। অন্যদের অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বন্ধ্যা করা হয়। এছাড়া যেসব নারীর সন্তান সংখ্যা দুইয়ের বেশি তাদের বড় অংকের জরিমানা করা হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিনজিয়াংয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নাটকীয়ভাবে কমে এসেছে। ২০১৫ ও ২০১৮ সালের মধ্যে উইঘুরদের দুটি অঞ্চলে জন্মহার ৮৪ শতাংশ কমেছে। ২০১৯ সালে এই হার আরও কমেছে।

চীনা সরকার সে দেশের মসজিদগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক নামমাত্র পারিশ্রমিক কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে কায়িক পরিশ্রমে বাধ্য করছে।...............

(উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতনের সর্বশেষ সংবাদ জানতে টর ব্রাউজার দিয়ে নিয়মিত ব্রাউজ করুন এই লিংকে: https://bit.ly/uighurmuslim)

তাতার সাম্রাজ্যের চতুর্থ ভাগ:

অঞ্চলসমূহ: পুরো তুর্কিস্তান, উইঘুরদের রাজ্য কাংসু এবং মা-অরাউন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা)

শাসকবৃন্দ: চাগতাই, মোবারক শাহ (এ অঞ্চলের প্রথম মুসলিম শাসক), বুরাক খান, মুহাম্মাদ খান, তুঘলক খান, তৈমুর লং। তৈমুরের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। এরপর আসে মোঙ্গল শাইবানি ও জানিয়া বংশের শাসন।
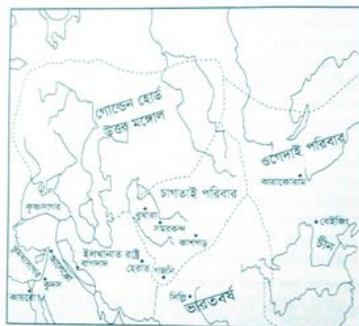
এরপর রুশ আগ্রাসনের শিকার হয় প্রায় সমগ্র তুর্কিস্তান।

কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর ১৩৩৮ হিজরি (১৯২০ ঈসায়ী) সনে রুশ বাহিনীর হাতে বুখারার পতন হয়। ইসলামের প্রাচীনতম শহরটিতে কম্যুনিস্ট লাল পতাকা উড্ডীন হয়।

উত্তর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের আলোচনাকালে রাশিয়ান তাতারদের সাথে রুশ সরকারের আচরণ যেমনটি ছিল, তুর্কিস্তান দখল করেও সেই একই আচরণ করে তারা এই অঞ্চলের মুসলমানদের সাথে।

তাতার সাম্রাজ্যের পঞ্চম ভাগঃ ভারতবর্ষের মোঙ্গল বা মোঘল সাম্রাজ্য। এ সম্পর্কে আমরা দশম অধ্যায়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

অষ্টম অধ্যায়: উসমানী খিলাফতের ইতিহাস

প্রিয় ভাই, চলুন! আমরা আবারো ফিরে আসি খিলাফতের ইতিহাসে।

উসমানী খিলাফতের শাসনকাল: ৬৯৮-১৩৪২হিজরি (১২৯৯-১৯২৪ ঈসায়ী)

সুলতান ও খলিফাগণ: উসমানি সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান ছিলেন প্রথম উসমান। ০৯ নং সুলতান প্রথম সেলিমের সময় ৯২৩ হিজরি/১৫১৭ সালে উসমানি সালতানাত খিলাফতে রূপান্তরিত হয়। তাই প্রথম সেলিম উসমানী খিলাফতের প্রথম খলিফা। সর্বশেষ খলিফা ছিলেন দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ (৩৭ তম সুলতান)।

শাসন এলাকার বিস্তৃতি:

উসমানীরা পৃথিবীর এমন সব ভূ-খণ্ডে ইসলামকে বিজয়ী করেছিল, যা দ্বিতীয় কোনো মুসলিম শাসকের শাসন করার সৌভাগ্য হয়নি।

হ্যাঁ! একমাত্র উসমানিরাই পেরেছিল ইউরোপের হৃদপিণ্ডে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে। তারা জয় করেছিল- গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া (বর্তমান সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও ক্রোয়েশিয়া), বসনিয়া, হার্জেগোবিনা, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, মালদোভা, ইউক্রেন, সাইপ্রাস, রাশিয়ার বিরাট অংশ, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, ইতালী। তথা তৎকালীন অর্ধ ইউরোপ ছিল উসমানিদের পদানত। এদিকে সম্পূর্ণ এশিয়া মাইনর তথা আধুনিক তুরস্ক, আর্মেনিয়া, জর্জিয়াসহ সমগ্র ককেশাস অঞ্চল, আফ্রিকার উত্তর অংশ, জাজিরাতুল আরব, ইরাক, শাম উসমানীদের শাসনের আওতাধীন ছিল। আয়তন ছিল ৫২,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। অবশেষে উসমানিদের বিজয়যাত্রা ভিয়েনার দুর্গপ্রাচীর পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়।

উসমানী খিলাফতকালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি:

- **উসমানিদের উত্থান** হয়েছিল ৬৯৮ হিজরি (১২৯৯ ঈসায়ী) সনে। এই সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা উসমান গাজীর পিতা আর্তুগ্রুল গাজী। (মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তান থেকে আগত) তুর্কি বংশোদ্ভূত আর্তুগ্রুল গাজী উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ার দায়িত্ব পান রোমান সেলযুক সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃক, প্রথম দিকে রোমান সেলযুক সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকলেও (মোঙ্গলদের আক্রমণে) রোমান সেলজুক সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে উসমান গাজী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন।
- **জেনিসারি বাহিনীর ইতিবৃত্তঃ** ইতিপূর্বে সেনাসদস্যরা কেবল যুদ্ধের ডাক পড়লেই উপস্থিত হতো, নিয়মিত ব্যারাকে থাকত না। এদিকে প্রত্যেক গোত্রের সেনাসদস্যরা যে কোনো সময় গোত্রের পক্ষে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসত। (২য় সুলতান) সুলতান গাজি প্রথম উরখানের সময় খাইরুদ্দিন পাশা নামে একজন বিশ্বস্ত উজির ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, অসহায় , দরিদ্র ও যুদ্ধে নিহত হওয়া খ্রিস্টান বাইজান্টাইন সৈনিকদের এতিম সন্তানদেরকে ইসলামের উপর প্রতিপালন করে বিশেষ সেনাবাহিনী গঠন করার। তাদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণে মগ্ন রাখা হবে, যাতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা ছাড়া আর কোনো কাজ তারা জানবে না। আর সুলতান ছাড়া আর কাউকেও তারা চিনবে না বা মানবে না। সরাসরি সুলতান হবেন তাদের প্রধান। এতে তারা একদিকে অসহায়ত্ব ও বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রেহাই পাবে, অন্যদিকে তারা

লাভ করবে ইসলামের মহান দৌলত এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার মহাগৌরব। এই বাহিনীর নামকরণ করা হয় 'ইয়ানি তাশরি' বা নতুন বাহিনী। ইতিহাসে যারা জেনিসারি বাহিনী নামে পরিচিত। অচিরেই এই বিশেষায়িত বাহিনী উসমানিদের অন্যতম শক্তি হিসেবে দেখা দিল। ইউরোপজুড়ে দিগ্বিজয়ী অভিযানে তারা নেতৃত্ব দিতে লাগল। প্রকৃত রহস্য জানার পর ব্যাপারটা ক্রুসেডারদের জন্য মারাত্মক ক্রোধ উদ্দীপক হলো। কারণ, তারা দেখছিল এই দুর্ধর্ষ বাহিনীটি তাদের ধর্ম থেকে আসা তরুণদের দিয়ে তৈরি, যারা ইসলাম কবুল করেছিল। আর শুধু ইসলাম কবুলেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তারা ইসলামের দিগ্বিজয়ী অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিল।

তবে জেনিসেরিদের ব্যাপারে সুলতানগণ সবসময় সঠিক নীতি অবলম্বন করতে পারেননি। কোনো কোনো সুলতান জেনিসেরিদের রাজনীতিতে নাক গলানোর সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের কারণে। এসব কারণে ১২৪২ হিজরিতে (৩০ নং সুলতান) খলিফা দ্বিতীয় মাহমুদ জেনিসারি বাহিনী বিলুপ্ত করে দেন।

- **(৩য় সুলতান) প্রথম মুরাদ এর জিহাদী প্রেরণা:**

সুলতান গাজি মুরাদ তার পূর্বসূরিদের ধারা বজায় রেখে এশিয়া ও ইউরোপ দুই দিকেই অভিযান চালিয়ে যান। তিনি ৭৬২ হিজরিতে (১৩৬১ ঈসায়ী) এডির্নে জয় করেন। এই শহরটি কনস্টান্টিনোপল থেকে কিছুটা উত্তরে। গুরুত্বপূর্ণ শহরটি দখল করেই সুলতান মুরাদ রাজধানী সেখানে স্থানান্তর করেন, যেন ইউরোপে অভিযান পরিচালনা সহজ হয়। তার এই পদক্ষেপ ছিল কনস্টান্টিনোপল জয়ের প্রথম কার্যকরী ধাপ। ৮৫৭ হিজরিতে সুলতান ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল জয় করার আগ পর্যন্ত আদ্রিয়ানোপল উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে বহাল থাকে।

এরপর সুলতান মুরাদ ফিলিপা (বর্তমান দক্ষিণ বুলগেরিয়া), কালজামিনা, ওয়ারদার জয় করেন। এর ফলে কার্যত চারদিক থেকেই কনস্টান্টিনোপল উসমানিদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে।

প্রথম মুরাদ কর্তৃক বলকান জয়ের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্য বহু মহাদেশীয় সাম্রাজ্য হয়ে উঠে।

কসোভোর যুদ্ধের আগের রাতে সুলতান দোয়া করেছিলেন: "হে আল্লাহ, আপনার ইজ্জত ও জালালের কসম! আমি এইসব জিহাদের দ্বারা অস্থায়ী

দুনিয়ার কোনো কিছুই কামনা করিনি। আমি কামনা করি আপনার সন্তুষ্টি। হে আমার রব, আপনি আমাকে জিহাদের পথে পরিচালিত করে সম্মানিত করেছেন। হে আমার মালিক, এখন আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিয়ে আরও সম্মানিত করুন।"

কসোভোর যুদ্ধের পর সুলতান মুরাদ নিহত সার্ব সৈন্যদের মাঝে ঘুরে দেখছিলেন। এক সার্ব সৈনিক নিহতদের মাঝে পড়ে ছিল। সুলতানকে দেখতে পেয়ে লাশের স্তুপ থেকে উঠে সুলতানকে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে। দেহরক্ষীরা তৎক্ষণাৎ ঘাতককে হত্যা করে ফেলে, কিন্তু সুলতান এই আঘাতেই শহীদ হয়ে যান।

- (৪র্থ) সুলতান বায়েজিদ ইলদিরিম: (৭৯১-৮০৪ হিজরি/১৩৮৯-১৪০২ ঈ.)
সুলতান বায়েজিদ সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে। তার রাজত্বের পুরোটা সময়জুড়ে তিনি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্য় মশগুল ছিলেন এবং দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

জিহাদের প্রচণ্ড উদ্দীপনা, দুরন্ত গতি ও আকস্মিকতায় শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন বলে তার নাম হয়ে যায় 'ইলদিরিম' বা বজ্র।

সুলতান বায়েজিদের সময়ই কুখ্যাত, নামধারী মুসলমান তাতার তৈমুর লং উসমানী সাম্রাজ্যে হামলা করে সাম্রাজ্যকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। সুলতান নিজেও বন্দী হন। এরপর সুলতান গাজি মুহাম্মাদ প্রথম (৫ম সুলতান) উসমানী সাম্রাজ্যের প্রাণ ফিরিয়ে আনেন।

- কনস্টান্টিনোপল বিজয়:
উসমানিদের গৌরবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সপ্তম উসমানী সুলতান ২৩ বছর বয়সী (দ্বিতীয়) মুহাম্মাদ আল ফাতিহ্‌র হাতেই ৮৫৭ হিজরি (১৪৫৩ ঈসায়ী) সনে কনস্টান্টিনোপল বিজিত হয়েছিল এবং এরই মাধ্যমে উসমানিরা বাইজেন্টাইন (রুম) সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে। অথচ সুদীর্ঘ ৭০০ বছর বহু মর্দে মুজাহিদ অসংখ্যবার চেষ্টা করেও এই নগরীটির চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি। সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রিয় নবীজি -এর এই ভবিষ্যদ্বানী যথেষ্ট:

(لَتُفْتَحَنَّ الْقُسطَنْطِينِيَّةُ فلنعمَ الأميرُ أميرُها ولنعمَ الجيشُ ذلك الجيش) رواهُ أحمدُ والحاكم

"কনস্টান্টিনোপল অচিরেই বিজয় হবে। কতই না উত্তম তার বিজেতা, আর কতই না উত্তম সেই বাহিনী।"

কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের পর সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ্ তার বিজয়াভিযানে মনোনিবেশ করেন। এরপর তিনি সার্বিয়া, মুরা (দক্ষিণ গ্রীস), ওয়ালাচিয়া (বর্তমান রোমানিয়ার অংশ), বসনিয়া, ক্রিমিয়া, ক্রোয়েশিয়ার কিছু অংশ, মন্টেনিগ্রো, আলবেনিয়ার কিছু অংশ, ট্রান্সসিলভানিয়া (প্রাচীন পশ্চিম রোমানিয়া), ইতালীর অটারেন্ট শহর, আনাতোলিয়ার সর্বশেষ খ্রিস্টান রাজ্য ট্রাবজোন, কিরমান রাজ্য ইত্যাদি জয় করেন।

এই মহান সুলতান জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি একের পর এক রাজ্য জয় করেছিলেন। এজন্য তার উপাধি হয়ে যায় আল-ফাতিহ্ বা বিজেতা। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র দিগ্বিজয়ী যিনি এই উপাধি লাভ করেন। সর্বশেষ তিনি ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র ইতালি জয় করারও প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাকদীরের ফয়সালা ছিল ভিন্ন। তিনি রবের সান্নিধ্যে গমন করেন। আল্লাহ পাক তাকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

- সালতানাত থেকে খিলাফত:
  সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রায় সোয়া দুইশ বছর পর ৯২৩ হিজরি (১৫১৭ ঈসায়ী) সনে উসমানি খলীফা প্রথম সেলিম (আব্বাসীয় খিলাফাহ্কে হটিয়ে) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

- ১৩৪১ হিজরি (১৯২৩ ঈসায়ী) সনে খিলাফতের পতন পর্যন্ত উসমানিরা সর্বতোভাবে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে গিয়েছিল এবং এই সুদীর্ঘ ৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের বুকে ইসলামের পতাকা উন্নীত করে রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে তারা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে মোকাবিলা করেছে ইসলামের দুশমনদের। পশ্চিম সীমান্তে তুমুল যুদ্ধ চলছিল ইউরোপের খ্রিস্টান ক্রুসেডার বাহিনীর সাথে। দক্ষিণে জাজিরাতুল আরবে পর্তুগিজ বাহিনীকে বারবার রুখে দিয়েছিল। উত্তর সীমান্তে রুশ বাহিনীর হাত থেকে তাতার ও শারকাসি মুসলিমদের রক্ষার লড়াই চলছিল। আর পূর্বে লড়াই চলছিল শিয়া গাদ্দারদের সাথে, যারা ক্রুসেডারদের সাথে যোগসাজশে

ব্যাপকভাবে আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের সাথে আর বিশেষভাবে খিলাফতে উসমানিয়াদের সাথে লড়ছিল।

উসমানি খিলাফতের পতন:

- **খিলাফতের পতনে ইহুদী-নাসারাদের অপচেষ্টা:**

এদিকে ক্রুসেডার খ্রিস্টান আর ইহুদীরা সম্মুখ সমরে পরাস্ত হয়ে খিলাফাহ ধ্বংস করতে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়।

তাতার মুসলিমগণ ক্রিমিয়ায় রুশবিরোধী এক অভিযানকালে অত্যন্ত সুন্দরী এক রুশ ইহুদী তরুণী আটক করে। তার নাম রোকসালানা। খলিফা সুলাইমান কানুনি (দশম সুলতান ও দ্বিতীয় খলিফা) এই সর্পিণীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সে রাষ্ট্রের নানাকাজে হস্তক্ষেপ করা শুরু করে। তারই প্ররোচনায় স্পেন থেকে বিতাড়িত ইহুদিদেরকে উসমানিরা কোলে তুলে নিয়েছিল। এ সকল ইহুদীদেরকে দোনমে ইহুদি বলা হয়। কিন্তু তারা উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধ দেখায়নি। পরবর্তীতে সময়ে উসমানি খিলাফতের পতনে তারাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

১৩১৪ হিজরিতে (১৮৯৬ ঈসায়ী সনে) খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের আমলে সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে অনুষ্ঠিত এক ইহুদি সমাবেশে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করে ইহদি জায়নবাদের জনক থিওডোর হার্টজেল। কিন্তু খলিফা এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইহুদী অভিভাসনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তিনি সুস্পষ্টরূপে হার্টজেলকে এক চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেন-

"তোমরা ড. হার্টজেলকে জানিয়ে দাও যে, সে যেন আজকের পর এ কাজ (ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র গঠন) করার কোনোরূপ প্রচেষ্টা না করে। কেননা, আমি এ দেশের এক বিঘত জায়গাও অন্যের জন্য খালি করে দিতে প্রস্তুত নই। দেশ আমার সম্পদ নয়; বরং এটি উম্মাহ্র সম্পদ, যা তাদের রক্তে সিক্ত। সুতরাং ইহুদিরা যেন সংযত হয়। মুসলিমরা আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষার যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইহুদিদের নিকট বিক্রি করে সে দায়িত্বে খিয়ানত করার ছাপ ইতিহাসে বহন করতে প্রস্তুত নই।"

(আল ইয়াহুদ ওয়াদ দাওলাতুল উসমানিয়া: ১১৬)

অতঃপর হার্টজেল ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইউরোপের সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় ইউরোপে গমন করে। এ সফরে সে ইউরোপের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। তার এই প্রচেষ্টা উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে উঠে।

- **অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদ ও আরব বিদ্রোহ:**

খ্রিস্টান আর ইহুদীরা আরবদের প্রলুব্ধ করে উসমানিদের বিরুদ্ধে 'আরব বিদ্রোহ' ঘটাতে সক্ষম হয়। আর এজন্য তারা 'আরব জাতীয়তাবাদ'কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।
ইউরোপীয়রা উসমানিদের পরাভূত করার জন্য সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র চালাতে লাগল। সেজন্য খ্রিষ্টান বা মুসলিম যার মাধ্যমে ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে সবাইকে তারা ব্যবহার করেছিল। আর বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী, নিষ্ঠাবান ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করত; যদিও তারা কুখ্যাত ডাকাতই হোক না কেন।

ইউরোপীয়রা জাতীয়তাবাদের মোহনীয় স্লোগান নিয়ে এসেছিল, যাতে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের জন্য একের পর এক ইসলামী অঞ্চলগুলো গিলে খাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে কাটাকাটিতে লিপ্ত থেকে মুসলিমরা সবকিছু থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। অপরদিকে, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আবিষ্কার- সবকিছুতেই ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতি ছিল বিশাল। এর ফল হলো, উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী তরুণরা ইউরোপের দ্বারস্থ হতে লাগল। অথচ দ্বীনি শিক্ষার বিষয়ে তাদের ভালো কোনো জ্ঞান ছিল না। দেখা গেল ইউরোপ থেকে যা শিখে আসে, তা দিয়েই তারা ইতিহাস রচনা করছে। ইসলামবিদ্বেষীদের চর্চিত ইতিহাস তারা মগজে করে নিয়ে আসে। ইউরোপের একেবারে আক্ষরিক আনুগত্যের শিকার এসব তরুণ সিলেবাস প্রণয়ন ও ইতিহাস রচনায় কদমে কদমে ইউরোপীয় চর্চার বিকাশ ঘটায়। ফলে বহু মুসলিমের মনে একসময় এ মারাত্মক চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মুসলিমদের পতন ও পিছিয়ে পড়ার একমাত্র কারণ উসমানি খিলাফত। আর এ থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করা। উন্নতির যে শিখরে আজ ইউরোপ অবস্থান করছে, মুসলিমদের সেখানে পৌঁছতে হলে তার অনুসরণের বিকল্প নেই। বস্তুত মুসলিম উম্মাহ তখন

ভুলে গিয়েছিল যে, নিজেদের দ্বীন পূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত তাদের মুক্তি সম্ভব নয়। এখন যা কিছু লাঞ্ছনা-বঞ্চনা তাদের কপালে জুটেছে, এর মূল কারণও হল দ্বীন ভুলে যাওয়া। সেই সাথে ইহজগতের ভালোবাসা ও প্রবৃত্তির চাহিদার সাগরে ডুব দেওয়া।

ইউরোপপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীরা তাদের চিন্তাধারার ধারক-বাহক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন তৈরি করে। এ সকল সংগঠন নাগরিকদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ইহুদি, খ্রিস্টান ও ফ্রিমেসনের বহু সদস্যকে লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে দলে টেনে নেয়া হয়। তারা সেনাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তারা ইসলামী খিলাফাহ ধ্বংস করে মানবরচিত সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদী তুরস্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'তুর্কি যুব আন্দোলন' (The Young Turk Movement) নামে মেহনত শুরু করে। 'উসমানি ঐক্য সংগঠন' নামে তাদের একটি সামরিক ইউনিট ছিল। তাদের একটি সিভিল শাখা ছিল, যার নাম 'শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন'। উভয় শাখা একত্রিত হয়ে 'ঐক্য ও উন্নয়ন'/ Committee of Union and Progress (CUP) নামে তাদের সংগঠন পরিচালিত হতে থাকে। এই সংগঠনের একজন সদস্য এবং সিরিয়াতে উসমানি সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিল কামাল আতাতুর্ক। আল্লাহ্ তাআলা তাকে অভিশপ্ত করুন।

- **পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামী খিলাফত চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্নকরণ:**

অবশেষে, পশ্চিমা শক্তি ও নামদারী মুসলিম দালালদের ধারাবাহিক অপচেষ্টায় ১৯২৩ সালে (১৩৪১ হিজরি) 'লুজান সম্মেলনে'র মাধ্যমে নাস্তিক কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক উসমানী খিলাফতের পতন ঘোষিত হয়। আর ৩ রা মার্চ, ১৯২৪ সালে খিলাফতব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়। সর্বশেষ খলিফা ছিলেন দ্বিতীয় আবদুল মাজীদ।

কামাল আতাতুর্ক খিলাফত ব্যবস্থা বাতিল করে গণতান্ত্রিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ধর্মীয় চাকরির পদ বিলুপ্ত করতে এবং নারীদের হিজাব খুলে নিতে সৈন্য নিয়োগ করে। সাংবিধানিকভাবে দেশের সর্বত্র তার মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। তুর্কি ভাষায় আজান দেওয়া এবং তুর্কি ভাষা আরবি হরফের পরিবর্তে ল্যাটিন হরফে লেখার নির্দেশ দেয়। এ ছাড়া আরও এমন বহু কুকর্ম করে, যা কোনো (প্রকাশ্য) কাফেরও করতে সাহস করে না। বড়ই আফসোস!

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানা হতে চালু থাকা খিলাফতব্যবস্থা এ নরাধমের হাতে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং যা অদ্যাবধি একই অবস্থায় রয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস্আলা:

জিহাদ ব্যক্তি পর্যায়ে ফরযে আইন হওয়ার একটি ক্ষেত্র এবং সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

প্রিয় ভাই! জিহাদ আল্লাহ্ পাকের একটি ফরয হুকুম। (সূরা বাকারা ২: ২১৬) সাধারণভাবে জিহাদ করা ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ উম্মাহ্র একটি অংশ তা আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়।

কিন্তু, পৃথিবীর বুকে ইসলামী খিলাফাহ থাক বা না থাক, মুসলমানদের আমীর থাক বা না থাক, এমতাবস্থায়-

১. যদি আগ্রাসী কোনো বাহিনী মুসলিম ভূমির দিকে কেবল অগ্রসর হয়,
২. যদি কোনো কাফের বাহিনী মুসলমানদের সীমানায় তাঁবু স্থাপন করে,
৩. কোন কাফের বাহিনী মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে,
৪. মুসলিম ভূমির এক বিগত মাটিও যদি কুফ্ফাররা দখল করে নেয়,
৫. যদি পৃথিবীর কোথাও কোন একজন মুসলিমও কুফ্ফার কর্তৃক বন্দী হয়, ঐ মুসলমানকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত জিহাদ করতে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরযে আইন হয়ে যায়।

একে দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদ বলে। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রবিশেষগুলোতে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার বিষয়টি সকল মাযহাবেই স্বীকৃত, এই ব্যাপারে কোনো মাযহাবের ইমাম, সালাফ কিংবা খালাফ, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম, কারো কোনো দ্বিমত নেই।

দেফায়ী বা প্রতিরক্ষামূলক বা প্রতিরোধমূলক বা Defensive জিহাদের ক্ষেত্রে আর কারো ঘরে বসে থাকার উপায় থাকে না। সক্ষম সকল মুসলমানের উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিকে ফিকহের ভাষায় 'নফীরে আম' বলা হয়। 'নাফীর' অর্থ 'যুদ্ধে বের হওয়া।' আর 'আম' অর্থ ব্যাপক। নফীরে আম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন অবস্থা, যখন শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সকলের জিহাদে বের

হওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, জিহাদের জন্য কারো কাছ থেকে অনুমতির প্রয়োজন নেই। সন্তানের জন্য পিতার কাছ থেকে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর কাছ থেকে, ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণদাতার কাছ থেকে, গোলাম তার মনিব থেকে, এমনকি 'নফীরে আম' অবস্থায় মুসলিম আমীরের অনুমতিরও দরকার নেই, জিহাদের জন্য বের হওয়ার ব্যাপারে তার কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞাও মান্য করা যাবে না। কেননা এমতাবস্থায় কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আল্লাহ্‌র হুকুমের খেলাফ, তাঁর নাফরমানীর শামিল। আর আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করার অনুমতি শরীয়তে নেই।

মুফতী শফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, কখনো যদি কাফেররা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ করে এবং প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত বাহিনী তাদের প্রতিরোধে যথেষ্ট না হয়, তখন উক্ত ফরয তাদের অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের উপর আরোপিত হয়। তারাও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন কুফ্‌ফারদের কোনো আগ্রাসন
থাকে না, তখন) জিহাদ ফরযে কিফায়া।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, খ. ৪, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬, রদ্দুল মুহতার, খ.৩, পৃ. ২৩৮)

الشيخ عبد الله عزام -رحمه الله:

ولذلك الجهاد فرض عين الآن على الأمة الإسلامية جمعاء، ليس من الآن، بل من يوم سقطت الأندلس، من 1492 ميلادي، قبل خمس قرون صار فرض عين، وخلال خمس قرون الأمة كلها آثمة، لأنها لم ترجع الأندلس، الآن الجهاد فرض عين، ولا ينتهي بتحرير أفغانستان، ولا بتحرير فلسطين، ينتهي فرض العين عندما نرجع كل بقعة، كانت في يوم من الأيام تحت راية لا إله إلا الله، فالجهاد فرض عين عليك حتى تموت، كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات فالجهاد لا يسقط على الإنسان إلا إذا مات أبدا، احمل سيفك وامض في الأرض، لا ينتهي فرض العين أبدا حتى تلقى الله، وكما أنه لا يجوز أن تقول صمت العام الماضي هذه السنة أريد أن أستريح، أو صليت الجمعة الماضية وهذه الجمعة أريد أن أستريح، كذلك لا يجوز أن تقول جاهدت السنة الماضية وهذه السنة أريد أن أستريح.

শাইখ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহিমাহুল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

“.......এ কারণেই জিহাদ গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরযে আইন হয়ে আছে। আর তা কেবল এখন থেকে নয় বরং যেদিন ইসলামী আন্দালুস তথা স্পেনের পতন ঘটেছে, সেই ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ তথা আজ থেকে পাঁচ শতাব্দী ধরে ফরযে আইন হয়ে আছে। আর গোটা এই পাঁচশত বছর যাবত মুসলিম উম্মাহ সামগ্রিকভাবে গুনাহগার হয়ে আছে কারণ আন্দালুস এখনো পুনরুদ্ধার হয়নি।

আজ যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে তখন তা কেবল আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিন স্বাধীন হবার মাধ্যমেই আমাদেরকে দায়িত্বমুক্ত করবে না। বরং ফরজ দায়িত্ব তখনই পুরোপুরি পালিত হবে যখন এমন প্রতিটি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে, একদিনের জন্য হলেও যেখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র পতাকা উচ্চকিত ছিল।

অতএব আপনার উপর জিহাদ ফরয থাকবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, যেমনিভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ নামাজের ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অতএব মৃত্যু অবধি সকল মানুষের উপর জিহাদ ফরজে আইন। অতএব আপনি আপনার তরবারি হাতে নিন এবং জমিনের উপর বিচরণ করতে থাকুন। আল্লাহ্র সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটবার আগ পর্যন্ত এই ফরজে আইন দায়িত্ব শেষ হবে না।

আর যেমনিভাবে কারো জন্য এ কথা বলা জায়েজ নেই যে, আমি গত বছরের সিয়াম পালন করেছি, তাই এ বছর আমি বিশ্রাম নিতে চাই অথবা আমি গত সপ্তাহের জুমার সালাত আদায় করেছি অতএব এই সপ্তাহে আমি বিশ্রাম নিতে চাই। একই ভাবে এ কথা বলাও জায়েজ হবে না যে, আমি গত বছর জিহাদ করেছি তাই এ বৎসর আমি বিশ্রাম নিতে চাই।” (نصيحة الأمة الموحدة بحقيقة الأمم المتحدة : শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ, পৃ. ১৬, ১৭)

[বিস্তারিত জানতে পড়ুন: কিতাবুত তাহ্রীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল: দ্বিতীয় পর্ব- “তাওহীদ ও জিহাদ”। লিংক- https://archive.org/details/kitabuttahrid2]

নবম অধ্যায়: খিলাফাহ্ বিলুপ্তির পর মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়া ফিতনাসমূহ

ধর্মীয় অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়া ফিতনাসমূহ:

ইসলামী খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্বে যত ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি 'আত্মঘাতী' হল 'জিহাদ বিমুখতার ফিতনা। এরকম কিছু জিহাদ বিরোধী ফিতনা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল-

- **জিহাদ বিমুখতার ফিতনা:** জিহাদ ইসলামের চূড়া। আর তাই, এটি সর্বাপেক্ষা কঠিন, ভারী এবং বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি আমল। খিলাফাহ্র পতনের পর উম্মাহ্র ভিতর জিহাদ ভীতি, মৃত্যুর ভয় ও কাপুরুষতা বিস্তার লাভ করে। ফলে উম্মাহ নানা রঙে ও পন্থায় জিহাদ বিমুখতার সবক গ্রহণ করতে থাকে। জিহাদ থেকে পালানোর নানা পন্থা বের করে সেটাকে 'হিকমাহ' নাম দিচ্ছে। যে যত বেশি জিহাদ থেকে পালানোর রাস্তা বের করতে পারে, তাকে তত বেশি হিকমতওয়ালা নাম দেয়া হচ্ছে। জিহাদের নিত্য নতুন ভ্রান্ত মাসআলা-মাসাইলের উদ্ভব ঘটছে। যেমন: আমীর ছাড়া জিহাদ হবে না, আগে খিলাফত পরে জিহাদ-এসব আকীদা সবই ভুল, বানোয়াট। ইসলামের দীর্ঘ চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে কোথাও এসব পাওয়া যায় না।
- **খণ্ডিত ইসলামের দর্শন:** খিলাফাহ্র পতনের পর মুসলিম সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে যতটুকু পেরেছে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছে। এক পর্যায়ে যে যেটা করছে বা ইসলামের যে অংশের উপর আমল করছে, সেটাকে সে বড় মনে করা শুরু করেছে। আরো খারাপ ব্যাপার হল, অনেক মুসলমান দ্বীনের একটি অংশে মেহনত করে মনে করছে, সে পরিপূর্ণ ইসলামের উপর আমল করছে। যেমন: জিহাদ বাদ দিয়ে একদল মুসলমান ইলম চর্চা নিয়ে ব্যস্ত থেকে, কিংবা দাওয়াতের মেহনত করে, কিংবা আত্মশুদ্ধির মেহনত করেই ভাবছে সেই দ্বীনের সবচেয়ে দামী মেহনত করছে, সবচেয়ে বড় নবীওয়ালা কাম করছে। কিংবা সে সেটাকেই পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করছে। অন্য মেহনতকে ছোট

করে দেখছে কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে করছে, কিংবা বাকীগুলোর বিরোধিতা করছে।

- **তাত্ত্বিক ইসলামের দর্শন:** এই ফেতনাটা মূলত কিছু উলামায়ে কেরামের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল ইলমে দ্বীনের তাত্ত্বিক অধ্যয়ন করা, শিক্ষা দেওয়া বা আলোচনা করা, বয়ান করা, ছোট খাট শাখাগত বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, ইত্যাদিকে দ্বীনদারি মনে করতে থাকা বা দ্বীনের আসল কাজ মনে করা বা এতটুকুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা। ব্যবহারিক ইসলামের দিকে না আসা, দা'ওয়াহ্, এ'দাদ ও জিহাদের পথে অগ্রসর না হওয়া।
- **জিহাদের বিকৃত/অপ-ব্যাখ্যা:** খিলাফাহ্ পতনের পর উম্মাহ ধর্মীয় অঙ্গনে যতগুলো ফেতনার শিকার হয়েছে, তার মধ্যে মনে হয় সবচেয়ে অমার্জনীয় যে অন্যায় করেছে, তা হলো জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে উম্মাহকে জিহাদ বিমুখ করেছে। আরো খারাপ কথা হলো, যে যেটা করছে সেটাকেই 'জিহাদ' বলে ঘোষণা করছে। পরাজিত মানসিকতার অধিকারী একদল লোক জিহাদের শরঈ' অর্থ বাদ দিয়ে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করছে। (শরঈ অর্থ হল-আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা; পারিভাষিক অর্থ হল-কষ্ট-মুজাহাদা করা)। যার ফলে কলমের জিহাদ, বক্তৃতার জিহাদ, নফসের জিহাদ, দাওয়াতের জিহাদ, জায়নামায-তসবীর জিহাদ, হরতাল ও ধর্মঘটের জিহাদ ইত্যাদি নানা জিহাদের (?) উদ্ভব ঘটেছে।
- **বিদআত ও বিকৃত সুফিবাদের ফিতনাঃ** কুরআন হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এটি গড়ে উঠে। জিহাদ বিহীন এক সন্ন্যাস জীবনের দর্শন এটি।
- **নব্যমুরজিয়া ও নব্যসালাফিদের ফিতনাঃ** মুরজিয়ারা সুস্পষ্ট ঈমান ভঙ্গের কারণ পাওয়া স্বত্ত্বেও কেউ মুখে কালিমা পাঠ করলে তাদেরকে কাফের মনে করে না। নব্যসালাফিরাও এমন। এরা বর্তমানে মুরতাদ শাসকদের মুসলিম শাসকের জায়গায় রেখে কার্যত জিহাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অনেক মুসলিম ও আলেম বর্তমানে জেনে বা না জেনে এই ফিতনায় লিপ্ত আছে।
- **তাগুতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী জিহাদী দলগুলোর ফিতনাঃ** এই ফিতনায় জড়িত কিছু তানজিম কোন কোন ব্যাপারে তাগুতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছে। এতে করে জিহাদের বরকত নষ্ট হচ্ছে ও জিহাদের ফসল তাগুতরা তুলে নিচ্ছে। যেমনঃ হামাস, তাহরিরুশ শাম, লস্কর ই তয়্যিবা ইত্যাদি।

- **খারেজী আই এস-এর ফিতনাঃ** ২০১৪ সালের ২৯ জুন আলকায়েদার বায়াত ভঙ্গ করে সাবেক মুরতাদ বাহিনীর কিছু অফিসারের প্ররোচনায় আবু বকর আল বাগবাদীকে খলিফা বানিয়ে 'ইসলামী খিলাফত' ঘোষণার মাধ্যমে আই এস (ইসলামিক স্টেট/দাওলা)-এর ফিতনার সূচনা হয়। শুরুর দিকে তারা ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এর পর আস্তে আস্তে তা হারিয়ে যায়। অন্যায়ভাবে তাকফির করে তারা অনেক মুসলিম-মুজাহিদ জনসাধারণ ও আলেমের রক্তপাত ঘটায়। সামরিক লক্ষ্য নির্ধারণে তাদের উল্লেখযোগ্য কোন কৌশল নেই। বর্তমানে অনেক দেশে তাদের দাওয়াহ ছড়িয়েছে। আই এসের ফিতনার কারণে শামে ও সিরিয়ার মুসলিম ও মুজাহিদদের অপূরনীয় ক্ষতি হয়, যার কারণে আজ এগুলোর প্রায় পুরোটা তাগুতের দখলে। গ্লোবাল জিহাদের সম্মানিত শাইখ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনী হাফি. এর পক্ষ থেকে ২০১৪ সালের ২৮ এপ্রিল প্রকাশিত এক বার্তায় আইএসকে সুস্পষ্ট ভাষায় 'খারিজী' (হাদীসে বর্নিত জাহান্নামের কুকুর) বলে সাব্যস্ত করেছেন।
- **মসজিদ, মাদরাসা ও মুরিদান নিয়ে প্রতিযোগিতাঃ** বর্তমানে দা'ওয়াহ, এ'দাদ ও জিহাদের ফরযিয়াত ভুলে দ্বীনদারদের মধ্যে মসজিদের কারুকার্য নিয়ে (কার মসজিদ কত সুন্দর), কার মাদরাসায় কত ছাত্র বেশি বা নামডাক বেশি, কোন্ পীরের কত বেশি মুরিদ-এসব ঠুনকো বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।
- **কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে অবহেলা করে অন্যান্য গ্রন্থের ছড়াছড়ি হওয়াঃ** কুরআন হাদীসের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন বাদ দিয়ে দলের নেতৃবৃন্দের লেখা কিতাবাদির উপর খুব বেশি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। ফলে সে তার নিজের দলের বাহিরে ইসলাম সম্পর্কে জানার ও চিন্তা করার তাওফীক পায় না।
- **আল্লাহর কালাম/দ্বীনী জ্ঞান ছেড়ে পার্থিব জ্ঞানের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করাঃ** আজ উম্মাহ্ ইলমে দ্বীন হাছিল বাদ দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করছে। আজ মুসলিম মা-বাবারা তাদের সন্তানদেরকে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি হওয়ার স্বপ্ন না দেখিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে ফিতনা সমূহ:

- **মানবরচিত আইন প্রণয়নের ফিতনাঃ** উসমানী খিলাফাতের বিলুপ্তির পর এই ফিতনা মুসলিম দেশগুলোকে গ্রাস করে। এই ফিতনার কারণে অনেক শাসক, বিচারক, বাহিনী কুফরে লিপ্ত হচ্ছে।
- **গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, জাতীয়বাদ, তথাকথিত অসাম্প্রদায়িকতার ফিতনাঃ** বর্তমানে মুসলিম এক উম্মাহর চেতনাকে পিছে ফেলে এই ভয়ংকর কুফুরি ফিতনাগুলোকে আঁকড়ে ধরছে। মুসলিম দেশগুলোতে এসব কুফুরী আকীদা ও সমাজব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। মুসলিমদের ঐক্যকে নিঃশেষ করে এই ফিতনা একক খিলাফতকে ৫৭ টি মুসলিম দেশে বিভক্ত করে দিয়েছে।
- **ইসলামী গণতন্ত্রের (!) ফিতনাঃ** কাফেরদের আগ্রাসনের মুখে পরাজিত মানসিকতার অধিকারী অথবা ভুল ব্যাখ্যায় প্ররোচিত কিছু ব্যক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে কুফুরি গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে। পূর্বেকার কিছু জিহাদী দলও বর্তমানে এটা বেছে নিয়েছে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ বা বাস্তবতা উভয়ের আলোকে এই ব্যর্থ পন্থায় লিপ্ত থাকার দরুন উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে, মানুষ জিহাদ বিমুখ হচ্ছে ও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে।
- **সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা:** গণতন্ত্রের বিস্তারের সুবাদে আজ মুসলিমরা সুদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছে।

ব্যাক্তি ও সামাজিক জীবনে ফেতনাসমূহ:

- অশ্লীলতার ব্যাপকতা-পর্নোগ্রাফি, নীল মুভির সয়লাব হয়ে যাওয়া।
- নারী-পুরুষ অবাধ মিলামিশাকে বৈধজ্ঞান করা: পবিত্র ভালোবাসার নামে অবৈধ প্রেম ও কুকর্মে লিপ্ত হওয়া।
- ইন্টারনেটের ফেতনা-ইউটিউব, ফেইসবুক, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি।
- গান-বাজনা, মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের প্রসার।
- অনর্থক খেলাধুলার প্রসার-বিশ্বকাপ, টি-টুয়েন্টি, ভিডিও গেম্‌স, মোবাইল গেম্‌স-ফ্রি ফায়ার, পাবজি ইত্যাদি।

দশম অধ্যায়: ভারতবর্ষে ইসলামের ইতিহাস

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস:

ভারতীয় উপমহাদেশ (হিন্দুস্তান/ হিন্দ) বর্তমান ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ নিয়ে গঠিত।

ইসলামের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা শাসন করত। হিন্দু রাজবংশের মধ্যে মৌর্য, গুপ্ত, হর্ষ, কুষাণ, পাল ইত্যাদি রাজবংশ উল্লেখযোগ্য, যারা বিভিন্ন সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন করেছিল।

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ঘটে বণিক, দাঈ আর সৈনিকদের হাত ধরে। হযরত উমর রাদি. এর সময় ভারতমুখী কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও ব্যাপক পরিসরে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে উমাইয়া শাসনামলে; ৯২ হিজরিতে (৭১১ ঈসায়ী) সনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক প্রেরিত তার ভাতিজা ও জামাতা ১৭ বছর বয়সী সেনানায়ক বীর মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে।

আব্বাসীয় আমলে সিন্ধের গভর্নর হিশাম বিন আমর তাগলিবি মুলতান ও কাশ্মির জয় করেন।

গজনবি শাসনঃ

আফগানিস্তানের গজনি কেন্দ্রিক গজনবী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুবুক্তগিন হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত জয় করেন।

তার পুত্র সুলতান মাহমুদ গজনবি ১৭ বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সিন্ধু অঞ্চলের এলাকাগুলো জয় করতে সক্ষম হন। জয় করেন কান্নুজ ও গুজরাট। গুজরাটের প্রাচীন সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। সুলতান মাহমুদ ছিলেন বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু, শিল্পসাহিত্যে অনুরাগী ও জিহাদ প্রেমিক।

মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনি সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। এরপর তারপুত্র মাসউদ গঙ্গা তীরবর্তী প্রাচীন শহর বানারস জয় করেন।

ঘুরি শাসনঃ

গজনবিদের পতন হয়েছিল ঘুরিদের হাতে। ১১৭০ ঈসায়ীতে গিয়াসুদ্দিন ঘুরি গজনিরাজ্য দখল করেন। আর তার ভাই শিহাবুদ্দিন ঘুরি গজনি প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। তিনিই ভারতের ইতিহাসে মুহাম্মাদ ঘুরি নামে পরিচিত। ১১৯২ ঈসায়ী সনে তিনি এক লক্ষ বিশ হাজার সৈনিক নিয়ে আজমিরের শাসনকর্তা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করেন।

ভারতবর্ষে মামলুক শাসনঃ

মুহাম্মদ ঘুরি আফগানিস্তান ফিরে যাওয়ার আগে কুতুবুদ্দিন আইবেককে উত্তর ভারতের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। ১১৯৩ ঈসায়ী সনে কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লি, কান্নুজ, গোয়ালিয়র ইত্যাদি এলাকা জয় করেন। কুতুবুদ্দিনের একজন সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০৪ ঈসায়ী সনে নদীয়া আক্রমন করলে তার হাতে সেন বংশের পতন ঘটে। এভাবে বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় তুর্কি শাসন। ১২০৬ ঈসায়ী সনে মুহাম্মাদ ঘুরি আততায়ীর হাতে নিহত হন। এরপর কুতুবুদ্দিন আইবেক নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন।

১২১০ ঈসায়ী সনে কুতুবুদ্দিন আইবেক মারা যান। দিল্লীর কুতুব মিনার ও কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ নির্মাণ তার অমর কীর্তি।

কুতুবুদ্দিনের পরের শাসকদের মধ্যে শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ বেশ বিখ্যাত। ১২২৮ ঈসায়ী সনে ইলতুতমিশ মুলতান ও সিন্ধু জয় করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক।

খলজি শাসনঃ

মামলুকদের পর দিল্লীর মসনদে আসেন খলজি শাসকগণ। আলাউদ্দিন খলজি গুজরাট ও কেরালা জয় করেন।

তুঘলক শাসনঃ

সিন্ধুর আমির গিয়াসুদ্দিন 'তুঘলক' বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তার সাম্রাজ্য ৭২০ হিজরি থেকে প্রায় একশ বছর দিল্লি শাসন করেছিল।

এই বংশের শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন বুযুর্গ শাসক। তিনি অনেক মসজিদ- মাদরাসা নির্মাণ করেন। বহু কেল্লা নির্মাণ করেন।

তুঘলক শাসনামলেই ৮০১ হিজরি (১৩৯৮ ঈসায়ী) সনে তৈমুর লং দিল্লি আক্রমণ করেন। দিল্লি শাসন করার ইচ্ছা তৈমুরের ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ভারতের মুসলিম শাসকদের দুর্বল করাই মনে হয় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাই অল্প সময় পরই তৈমুর ভারত ত্যাগ করে।

তার প্রস্থানের পর তুঘলক বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহ পুনরায় দিল্লির সিংহাসন দখল করেন।

তুঘলক শাসনের পর খিযির (সৈয়দ) বংশ, এরপর লোদি বংশ দিল্লি শাসন করেন।

মোঘল/মোঙ্গল শাসনঃ

সম্রাট বাবরঃ

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদিকে পরাজিত করে সম্রাট বাবর ভারতবর্ষে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর ছিলেন তৈমুর লং এর বংশধর।

মোঘল শাসকদের নামঃ বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, শাহজাহান, আউরঙ্গজেব (আলমগীর)

✓ সম্রাট আকবরের সময়ই মোঘল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। আকবর হিন্দুস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ও আফগানিস্তানে রাজত্ব বিস্তার করেন।

✓ পরের দুইজন শাসক জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান উভয়েই বেশ শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তারা প্রায় পুরো ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলায় মোঘলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০৮ ঈসায়ীতে ঢাকা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়।

✓ সম্রাট শাহজাহানের সময় ইউরোপীয়ানদের ব্যাপক আগমন ঘটে। এ সময় ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ ও ফরাসীরা ভারতবর্ষে আগমন করে। বাণিজ্যের আড়ালে এরা শক্তিসঞ্চয়, ধর্মান্তর ও রাজ্য দখলের পায়তারা করতে থাকে।

✓ আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামল ৫০ বছর স্থায়ী হয়। তিনি ক্ষমতায় বসে মদপান, জুয়াখেলা ও নওরোজ উৎসব নিষিদ্ধ করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ফতোয়ায়ে আলমগিরি সংকলন করান।

সাম্রাজ্য বিস্তারেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। বিহারের শাসন কর্তা দাউদ খান ১৬৬১ সালে পালামৌ জয় করেন।

তার মৃত্যুর পর থেকে মোঘলদের পতনের যুগ শুরু হয়।

✓ অবশেষে শেষ মোঘল সম্রাট সুলতান বাহাদুর শাহকে ১২৭৩ হিজরি (১৮৫৭ ঈসায়ী) সনে দেশ থেকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করার মাধ্যমে ইংরেজদের হাতে মোঘলদের পতন হয়। ইংরেজরা সম্রাটকে গ্রেপ্তার করে তার সামনেই তার সন্তানদের হত্যা করে। এমনকি তার সন্তানের গোশত রান্না করে তার সামনে পেশ করার মত নৃশংসতাও দেখিয়েছিল এই সাদা কুকুর (ব্রিটিশ) বাহিনী।

ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশঃ

ডাচ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ ও ফরাসী-এ সকল ইউরোপীয়ানরা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করার স্বপ্ন লালন করত। কিন্তু ইংরেজরাই সবচেয়ে সফল হয়। ইংরেজরা প্রথমে অবতরণ করে মাদ্রাজে।

প্রথমে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশজুড়ে জমি কিনে দুর্গ নির্মান করে। এরপর একে একে সমগ্র ভারতবর্ষই দখল করে নেয়। মীর জাফর, জগৎশেঠ আর রাজবল্লভের গাদ্দারীর ফলে ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলা দখল করে নেয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন অব্যাহত ছিল।

ভারতবর্ষে মুসলিমদের অবদান:

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক পরিসরে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে উমাইয়া শাসনামলে; ৯২ হিজরিতে (৭১১ ঈসায়ী) সনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক প্রেরিত তার ভাতিজা ও জামাতা সেনানায়ক বীর মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে।

ইসলামের আগমনের পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা একে অপরের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হত। যেমন সম্রাট আশোকের সময় ঘটে যায় পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ- কলিঙ্গ যুদ্ধ, এই যুদ্ধে কলিঙ্গ বাহিনীর এক লক্ষ সেনা ও সম্রাট অশোকের মৌর্য বাহিনীর দশ হাজার সেনা নিহত হয়। আহত হয় হাজার হাজার নর-নারী।

সে সময় ভারতীয় সমাজে জাতপ্রথা ছিল প্রবল। সমাজের নিচু স্তরের হিন্দুদের কোনো মান সম্মান ছিল না। উঁচু বর্ণের হিন্দুদের হাতে তারা ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হত। নিচু বর্ণের হিন্দু নারীদের উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করার জন্য ট্যাক্স দিতে হত। ১৮৫৯ সালে দক্ষিণ ভারতে একটি দাঙ্গা সংগঠিত হয়। এই দাঙ্গার উদ্দেশ্য ছিল, নিচু বর্ণের হিন্দু নারীদের উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করার অধিকার আদায় করা। এই দাঙ্গা 'কাপড়ের দাঙ্গা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। স্তনকরের বিরুদ্ধে কেরালার এক লড়াকু হিন্দু নারী ছিল নাঙ্গেলি। সে তার স্তন কেটে জীবন দিয়ে অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছিল। এই ছিল তখনকার সময়ের হিন্দুত্বাবাদীদের সমাজের অবস্থা।

এইরকম সামাজিক পটভূমিতে ইসলামের আগমন হিন্দুদের জীবনে বিশেষ করে নিচু জাতের হিন্দুদের জন্য বয়ে আনে আশীর্বাদ ও রহমত। এরপর থেকে

বৃটিশদের আগমনের আগ পর্যন্ত মুসলিমরা ভারত শাসন করেন। সকল জাতের হিন্দুরা নির্বিঘ্নে তাদের ধর্ম পালন করতে থাকে। সেই সময় ভারত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোর একটি। শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্যবিদ্যা সকল ক্ষেত্রেই ভারতের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর শুরু হল বৃটিশদের শাসন। মুসলিমরা ১৭৫৭ সালের পর প্রায় একশ বছরের বেশি সময় বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। পলাশীর যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ, ফকীর আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ফরায়েযী আন্দোলন, তিতুমীরের বারাসাত আন্দোলন, শাহ সৈয়দ আহমদ রহ. এর আন্দোলন, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ- যা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবেও পরিচিত, রেশমী রুমাল আন্দোলন ইত্যাদি।

নিম্নে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো-

- **শাহ সৈয়দ আহমদ রহ. এর স্বাধীনতা আন্দোলনঃ**

সৈয়দ আহমাদ বেরলভি (১৭৮৬-১৮৩১), রায় বেরিলি, ভারতের একজন মুসলিম সংস্কারক এবং "নবী মুহাম্মদের পথ" (তারিকাহ মুহাম্মাদীয়াহ), নামে একটি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তার বংশতালিকা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা.-এর সাথে মিলিত হয়েছে।

বংশীয় রীতি অনুযায়ী চার বছর বয়সেই তাকে মক্তবে পাঠানো হয়। সৈয়দ সাহেবের জীবনের প্রারম্ভ থেকেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র প্রতি প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। সূর্যোদয়ের পর তিনি এক ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যায়াম-কুস্তিতে কাটাতেন। ফলে তিনি অত্যধিক শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক সুসংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সৈয়দ আহমদ। তার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভারতে একটি অখণ্ড ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি মুসলমানদের কাছে আমিরুল মু'মিনীন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শুরু করে মর্দান পর্যন্ত এ বিশাল অঞ্চলে তিনি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু করেন।

দলে দলে মানুষেরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। এমনকি ভারতের বিখ্যাত আলিম-ওলামাও তার হাতে বায়আত গ্রহণ থেকে বাদ যাননি। শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ., শাহ কারামত আলী জৌনপুরী রহ. ও মাওলানা আব্দুল হাই রহ. প্রমুখ বিখ্যাত আলিম তার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

অবশেষে তিনি বালাকোটের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন (১৮৩১ সালের ৬ই মে মোতাবেক ২৪ জ্বিলকদ, ১২৪৬ হিজরি)। এই যুদ্ধে শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.ও শাহাদাত লাভ করেন। শিখদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০ জন, আর শিখদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার। এই যুদ্ধে শিখ সেনাদের অধিকাংশ নিহত হয়।

(https://bit.ly/ahmadberelvi1 , https://bit.ly/imanjaglo)

হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলনঃ

হাজী শরীয়তুল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০) জন্ম তৎকালীন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর শাসনাধীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ফরিদপুর জেলার চর শামাইল গ্রামের এক দরিদ্র তালুকদার পরিবারে।

তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় সংস্কারক, নীলকর ও সামন্তবাদ বিরোধী নেতা এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তক। তিনি শুধু ধর্মীয় সংস্কারকই ছিলেন না, বরং তিনি কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের মাঝে দিনে দিনে যে ধর্মীয় কুসংস্কার প্রবেশ করেছে তা উচ্ছেদ করে তাদের ইসলামের মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলমানদের ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদেরকে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী শিক্ষা দেয়াই ছিল এই সংস্কার আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি ওয়াহাবি

আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইসলামের প্রধান করণীয় কাজকে বলে "ফরজ"। এচিন্তা থেকেই তার সংস্কার আন্দোলনের নাম হয় 'ফরায়েজি আন্দোলন'।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাওহীদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ অনুশীলনের উপর তিনি জোর দেন এবং মূল বিশ্বাস বা মতবাদ থেকে বিচ্যুতিকে তিনি 'শির্ক' ও 'বিদআত' বলে ঘোষণা করেন। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক আচার অনুষ্ঠান যেমন ছটি, পট্টি, চিল্লা, শাবগাস্ত মিছিল, ফাতিহা, মীলাদ ও ওরস নিষিদ্ধ করেন। পীরপূজা, পীরের প্রতি অতিশ্রদ্ধা প্রদর্শন, মহরমে তাজিয়া নির্মাণকেও শির্ক বলে ঘোষণা করেন। তিনি ন্যায়বিচার, সামাজিক সাম্য এবং মুসলমানদের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণগত কুসংস্কার বিলোপ সাধনের তত্ত্ব প্রচার করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ বাংলায় ব্রিটিশ শাসনকে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করতেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বাংলায় বৈধভাবে নিযুক্ত একজন মুসলিম শাসকের অনুপস্থিতি মুসলমানদের জুমআর নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠানের সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছে। এ মত ছিল ফরায়েজী আন্দোলনের একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য যা একে ওই সময়ের অপরাপর পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন থেকে আলাদা করে তুলেছে।

ইতিহাসবিদ জেমস ওয়াইজ হাজী শরীয়তুল্লাহকে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে উদাসীন ও অসচেতন বাংলার মুসলমান কৃষকদের আত্মসচেতন ও উজ্জীবিত করার কাজে নিয়োজিত একজন একনিষ্ঠ ও সহানুভূতিশীল প্রচারকরূপে গণ্য করেন। ফরায়েজী আন্দোলন অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল), ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলাসমূহে এবং আসাম প্রদেশে বিস্তারলাভ করে। যেসব এলাকায় নব্য হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরগণ শক্তিশালী ছিল এবং কৃষকদের উপর অত্যাচার চালাত সেসকল এলাকায়ই এ আন্দোলন সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

উনিশ শতকে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নব্য জমিদারগণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন বহু অতিরিক্ত আবওয়াব (অবৈধ কর) কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেয়। ১৮৭২ সালে ফরিদপুরে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেটের এক তদন্তে প্রকাশ পায় যে, কৃষকদের উপর জমিদারদের আরোপিত অবৈধ করের সংখ্যা তেইশের কম নয়। এমনকি, তারা মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে কালীপূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য কর আদায় করত। শরীয়তুল্লাহ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং জমিদারদের এসকল অবৈধ কর প্রদান না করার জন্য তার শিষ্যদের নির্দেশ দেন। জমিদাররগণ ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে গরু জবাইয়ের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। গরু কোরবানি করা মুসলমানদের প্রচলিত ধর্মীয় প্রথা এবং মুসলমানদের খাদ্য হিসেবে অন্যান্য মাংসের তুলনায় গরুর মাংসের মূল্য কম বিধায় শরীয়তুল্লাহ এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করার জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেন।

কলকাতার সংবাদপত্র এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনাকালে ফরায়েজীদের বিদ্রোহী ভাবাপন্ন দল হিসেবে চিহ্নিত করে প্রচারাভিযান শুরু করে। ১৮৩৭ সালে হিন্দুত্ববাদী জমিদারগণ শরীয়তুল্লাহকে তিতুমীর এর ন্যায় একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তারা ফরায়েজীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করে এবং এ কাজে তারা ইউরোপীয় নীলকরদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করে। কিন্তু তাদের অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হওয়ায় কোন অভিযোগই আদালতে প্রমাণ করতে পারে নি। অবশ্য ফরিদপুরে শান্তিভঙ্গ ও গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগে ১৮৩৯ সালে শরীয়তুল্লাহ একাধিকবার পুলিশি হেফাজতে ছিলেন।

১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তার একমাত্র পুত্র মুহসীনউদ্দীন ওরফে দুদু মিয়াকে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা ঘোষণা করা হয়।

বাংলার মুসলমানদের জাগরণের জন্য এবং ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর ফরায়েজী আন্দোলন যুগ যুগ ধরে আলোর মশাল হয়ে জাজ্বল্যমান থাকবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

(https://bit.ly/shoriotullah , https://bit.ly/shoriotullah1)

তিতুমীরের আন্দোলনঃ

বাঙালী মুসলিমদের জাগরণ, তাগুত ও কুফ্‌ফার বিরোধী জিহাদী আন্দোলনের আরেক চেতনার নাম শহীদ তিতুমীর রহ. ।

তিতুমীর, যাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী (জন্ম ২৭শে জানুয়ারী, ১৭৮২, ১৪ই মাঘ, ১১৮২ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু ১৯শে নভেম্বর, ১৮৩১) ছিলেন একজন বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবী। তিনি ওয়াহাবী আন্দোলন এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি জমিদার ও বৃটিশদের বিরূদ্ধে সংগ্রাম ও তাঁর বিখ্যাত বাঁশের কেল্লার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ব্রিটিশ সেনাদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় এই বাঁশের কেল্লাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

জন্মঃ তিতুমীরের জন্ম হয় চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের চাঁদপুর গ্রামে (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে)। তাঁর পিতার নাম মীর হাসান আলী এবং মাতার নাম আবিদা রোকেয়া খাতুন। তিতুমীরের প্রাথমিক শিক্ষা হয় তাঁর গ্রামের বিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে তিনি স্থানীয় একটি মাদ্রাসাতে লেখাপড়া করেন। ১৮ বছর বয়সে তিতুমীর কোরানের হাফেজ হন এবং হাদিস বিষয়ে পান্ডিত্য লাভ করেন। একই সাথে তিনি বাংলা, আরবি ও ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা তিতুমীরঃ ১৮২২ সালে তিতুমীর মক্কায় হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যান। তিনি সেখানে স্বাধীনতার অন্যতম পথপ্রদর্শক সৈয়দ আহমেদ শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও ওয়াহাবী মতবাদে অনুপ্রাণিত হন। সেখান থেকে এসে (১৮২৭) তিতুমীর তাঁর গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের সাথে নিয়ে জমিদার এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা তৎকালীন হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ধুতির বদলে 'তাহ্‌বান্দ' নামে এক ধরনের বস্ত্র পরিধান শুরু করেন। তিতুমীর হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলমানদের উপর বৈষম্যমূলকভাবে আরোপিত 'দাঁড়ির খাজনা' এবং মসজিদের করের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের সাথে স্থানীয় জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্রতর হতে থাকে। আগেই তিতুমীর পালোয়ান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং

পূর্বে জমিদারের লাঠিয়াল হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলেন।

তিতুমীরের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে এক সময় ৫,০০০ গিয়ে পৌঁছে। তারা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। ১৮৩১ সালের ২৩শে অক্টোবরর বারসাতের কাছে নারিকেলবাড়িয়ায় তাঁরা বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন। বাঁশ এবং কাদা দিয়ে তারা দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এই কেল্লা নির্মাণ করেন।

তিতুমীর বর্তমান চব্বিশ পরগণা, নদীয়া এবং ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিকার নিয়ে সেখানে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্থানীয় জমিদারদের নিজস্ব বাহিনী এবং ব্রিটিশ বাহিনী তিতুমীরের হাতে বেশ কয়েকবার পরাজয় বরণ করে। তন্মধ্যে বারাসতের বিদ্রোহ অন্যতম। উইলিয়াম হান্টার বলেন, ঐ বিদ্রোহে প্রায় ৮৩ হাজার কৃষকসেনা তিতুমীরের পক্ষে যুদ্ধ করেন।

অবশেষে ১৮৩১ সালের ১৩ নভেম্বর ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তিতুমীর স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন "ভাই সব, একটু পরেই ইংরেজ বাহিনী আমাদের কেল্লা আক্রমণ করবে । লড়াইতে হার-জিত আছেই। এতে আমাদের ভয় পেলে চলবে না । দেশের জন্য (মুসলমানদের ভূমি রক্ষার্থে) শহিদ হওয়ার মর্যাদা অনেক। তবে এই লড়াই আমাদের শেষ লড়াই নয়। আমাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই এ দেশের মানুষ একদিন দেশ উদ্ধার করবে। আমরা যে লড়াই শুরু করলাম, এই পথ ধরেই একদন দেশ স্বাধীন হবে।"

১৪ নভেম্বর কর্নেল হার্ডিং-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্যরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের আক্রমণ করে। তাদের সাধারণ তলোয়ার ও হালকা অস্ত্র নিয়ে তিতুমীর ও তার সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের আধুনিক অস্ত্রের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। ১৪শে নভেম্বর তিতুমীর ও তাঁর চল্লিশ জন সহচর শহিদ হন। তাঁর বাহিনীর প্রধান গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেয়া হয়। বাশেঁর কেল্লা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। [সূত্রঃ https://bit.ly/titumir]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহঃ

১৮৫৭ সালে বড়লাট ক্যানিং - এর শাসনকালে (১৮৫৬ - ১৮৬২) ঈসায়ীতে ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ক্রমেই এই আন্দোলন বহরমপুর, ব্যারাকপুর, দিল্লি, অযোধ্যা, লখনৌও, বেরিলি, ঝাসি, বিহার প্রভৃতি ভারতের এক বিরাট অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এই বিদ্রোহ ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে দেয়। এই বিদ্রোহ প্রথম শুরু করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় সৈনিক বা সিপাহিরা। এই কারণে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে অভিহিত করে থাকে। বলাবাহুল্য, এই মত যুক্তি সম্মত নয়। কেননা, বিদ্রোহের সূচনায় অল্পদিনের মধ্যেই দেশের রাজা প্রজা সৈনিক সাধারণ মানুষ সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিল। তাই এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ না বলে ১৮৫৭ সালের 'মহাবিদ্রোহ' বলা যুক্তিসংগত । এই বিদ্রোহ ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের ফল ।

এই আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন দিল্লির গদিচ্যুত বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। দিল্লিতে বিদ্রোহ পরিচালনার মূল দায়িত্ব ছিল একদল সেনার উপর এবং তাদের নেতা ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর সুবেদার বাত খান । কানপুরে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও এর পোষ্যপুত্র নানাসাহেব। তার পক্ষে সেনাপতি তাতিয়া টোপি ও মন্ত্রী হাকিম আজিমুল্লাহ বিদ্রোহ পরিচালনা করতেন। অযোধ্যার বেগম হযরত মহল তার নাবালক পুত্র বর্জিস কাদিরকে সিংহাসনে স্থাপন করে নিজেই বিদ্রোহ পরিচালনা করতেন। ঝাঁসিতে বিদ্রোহ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব বহন করেন তরুণী বিধবা রানী লক্ষীবাঈ। বিহারের মুখ্য সংগঠক ছিলেন আরার নিকটবর্তী জগদীশপুরের পদচ্যুত জমিদার অশীতিপর বৃদ্ধ কুনওয়ার সিং । ফৈজাবাদে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বৃদ্ধ মৌলবি আহম্মদুল্লাহ। আসামে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন মনিরাম দেওয়ান। বেরিলি নেতা ছিলেন রোহিলা নায়ক বাহাদুর খা । এই আন্দোলন বাস্তবায়নে ও সাধারণ জনগণের বিদ্রোহে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতীয় উলামায়ে কেরামের এক বিরাট অবদান ছিল।

দুঃখের বিষয় হল- বিদ্রোহ চলাকালে হিন্দু মুসলিম ঐক্য দূরে থাক, অনেক স্থানে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং সম্রাট হিসেবে বাহাদুর শাহের স্বীকৃতিতে শিখ, রাজপুত ও মারাঠারা ক্ষুব্ধ হয়। হিন্দুরা মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়াবে তো দূরে থাক; উল্টো, ভারতের বেশকিছু হিন্দু নৃপতি বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করে। শিখ ও গোর্খা সৈনিকরা বিদ্রোহ দমনে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের পক্ষে ছিল। হিন্দুদের মধ্যে যে সকল নেতৃবৃন্দ এই গণবিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরও ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ, বৃটিশদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়ানো হিন্দুত্বাবাদী নেতৃবৃন্দের মূল উদ্দেশ্য ছিল না যেমন: নানা সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল 'পেশোয়া' পদ এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, লক্ষীবাঈ চাইতেন নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার, ইত্যাদি।

এভাবে, হিন্দুরা দেশের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় নিজেদের স্বার্থকে। তারা ইংরেজদের সাথে হাত মিলায়।

বৃটিশরা শুধু ষাট হাজার আলেমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। এসবের তুলনায় গুটি কয়েক ক্ষুদিরামের ফাঁসি উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয়ই নয়।

শামলীর যুদ্ধ বা থানা ভবনের যুদ্ধ

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ধারাবাহিকতায় ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ. এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে ১৮৫৭ সালের ১০ মে সংঘটিত হয়েছিল।

১৮৫৭ সালের ১০ মে ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কির নেতৃত্বে কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে একটি সহিংস প্রতিবাদ করতে স্থানীয় মুসলমানরা দিল্লি থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের শামলী জেলার একটি ছোট শহর থানা ভবনে জড়ো হয়েছিল। আলেমরা সেদিন বিজয়ী হন এবং একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে শামলীর যুদ্ধ হিসেবে পরিচিতি পায়। উক্ত যুদ্ধে ওলামাদের পক্ষে মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবি রহ. সেনাপতি ছিলেন এবং রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. রাজ্যের কাজী ছিলেন। তবে মুহাম্মদ জামিনের হত্যা এবং সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা বাহাদুর শাহ জাফরের গ্রেপ্তারের পর

পরিস্থিতি কোম্পানিদের পক্ষে ও শামলী ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় এবং থানা ভবনটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (https://bit.ly/shamliwar)

রেশমি রুমাল আন্দোলন

রেশমি রুমাল আন্দোলন (তেহরিক-ই-রেশমি রুমাল) বলতে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৩ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে দেওবন্দি নেতাদের কর্তৃক সংগঠিত আন্দোলনকে বোঝায়। এতে উসমানীয় সাম্রাজ্য, জার্মান সাম্রাজ্য ও আফগানিস্তানের সহায়তা নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। আফগানিস্তানে দেওবন্দি নেতা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. এর কাছ থেকে পারস্যে অন্য আরেকজন নেতা মাহমুদ হাসানের কাছে পাঠানো চিঠি উদ্ধারের মাধ্যমে পাঞ্জাব সিআইডি পরিকল্পনার কথা জানতে পারে। ব্রিটিশ রাজ উৎখাতের পরিকল্পনা একটি রেশমের কাপড়ের উপর লেখা হয়েছিল বলে এই নামে এর নামকরণ করা হয়।

ইতিহাস:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. ও দারুল উলুম দেওবন্দের প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. কাবুলের দিকে যাত্রা করেন। ভারতের উপজাতীয় এলাকায় একটি মুসলিম বিদ্রোহ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল। এ উদ্দেশ্যে উবাইদুল্লাহ সিন্ধি রহ. আফগানিস্তানের আমির হাবিবুল্লাহ খানকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে মাহমুদুল হাসান রহ. জার্মান ও তুর্কিদের সাহায্য চান। মাহমুদ হাসান রহ. হেজাজের দিকে অগ্রসর হন। এর মধ্যে উবাইদুল্লাহ সিন্ধি আফগানিস্তানের আমিরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। তাকে তুরস্কে পৌঁছে দিতে তার সাথে আসা অনুসারী ছাত্রদের নিয়ে কাবুলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্যান-ইসলামি উদ্দেশ্য সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে পারবে। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে খলিফার জিহাদে যোগদানের জন্য তিনি তুরস্ক যেতে ইচ্ছুক ছিলেন।

বার্লিন-ভারতীয় কমিটি (যা ১৯১৫ সালের পর ভারতীয় স্বাধীনতা কমিটির রূপ নেয়) ইন্দো-জার্মান-তুর্কি মিশনে রূপ নেয় যার আওতায় ইন্দো-ইরানি সীমান্তের উপজাতিগুলোকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে উৎসাহ দেয়ার কথা ছিল। এই গ্রুপ ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে কাবুলে দেওবন্দিদের সাথে মিলিত হয়। এই মিশন ভারতীয় আন্দোলনের কর্মীদের ভারতের সীমানায় নিয়ে আসার পাশাপাশি জার্মান সম্রাট, আনোয়ার পাশা ও মিশরের খেদিব আব্বাস হিলমির বার্তা নিয়ে আসে যাতে ভারতের বিরুদ্ধে অগ্রসরের কথা উল্লেখ ছিল।

ফলাফল

মিশনের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের আমিরের ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া এবং আফগান সরকারের কাছ থেকে চলাচলের উন্মুক্ত পথ লাভ করা। কিন্তু পরিকল্পনা ফাস হওয়ার পর শীর্ষ দেওবন্দি নেতারা গ্রেপ্তার হন। শাইখুল হিন্দ বলে পরিচিত মাহমুদুল হাসানকে মক্কা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে হুসাইন আহমেদ মাদানিসহ মাল্টায় নির্বাসন দেয়া হয়।
(https://bit.ly/reshmirumal)

প্রিয় ভাই! এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পেরেছি, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমরাই ছিলেন অগ্রগামী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরিয়েছেন মুসলিমরা। অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদীরা বৃটিশদের গোলামী করে ফুলে ফেঁপে উঠে । আর 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির ভিত্তিতে হিন্দুদের সহযোগিতায় এদেশে বৃটিশদের শাসন আরো পাকাপোক্ত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের এত ত্যাগ ও কুরবানী সত্ত্বেও 'অকৃতজ্ঞ' হিন্দুত্ববাদী ভারতে আজ মুসলিমদের কোনো স্থান নেই। [লিংক: https://bit.ly/sipahibidroho]

মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের ইতিহাস

মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন আজকের নতুন কথা নয়। সে ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ঐতিহাসিকভাবেই হিন্দুত্ববাদীদের হাতে মুসলিমরা নির্যাতিত হয়ে আসছে। আর এমনটি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক!!

কেননা, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

“মানবজাতির মধ্যে তুমি ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে।” (সূরা মায়েদা ৫:৮২)

প্রিয় ভাই! চলুন, মুসলিমদের উপর ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেয়া যাক।

- **বৃটিশ আমল:**

বৃটিশদের সাথে মিলে হিন্দু জমিদাররা মুসলিমদের উপর চরম অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। অনেক এলাকায় দাঁড়ি রাখা, গরু জবাই করা নিষিদ্ধ হয়। অনেক মুসলিমদের বাধ্য করা হয়, হিন্দুদের পূঁজার জন্য চাঁদা দিতে। হিন্দুত্ববাদী জমিদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে জুতা পরিধান করে যাওয়ার অধিকার ছিল না মুসলিম প্রজাদের। অসহনীয় করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হত মুসলিমদের উপর। মুসলিম নারীদের ইজ্জতের উপর হামলা করা হত। মুসলমানদের রক্ত চুষে কর আদায় করে হিন্দুত্ববাদী জমিদাররা বাঈনাচের আসর বসাত, পতিতালয়ে যেত, আনন্দ-ফূর্তি করত। মুসলিমদের মানুষ হিসেবে কোনো মর্যাদাই ছিল না। হিন্দু জমিদাররা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের এতটাই নির্যাতন করতো যে, বৃটিশরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেত।

১৯০৬ সালে বাংলাকে ভেঙে দু’ভাগ করা হয়। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এবং মুসলিমদের উন্নতির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পূর্ব বাংলায় এ সময় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।
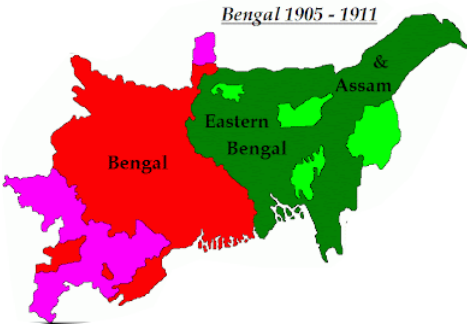
কলকাতার হিন্দুরা এটা মেনে নিতে পারেনি। পূর্ব বাংলার মুসলিমদের শোষন করার পথও বন্ধ হয়ে যায় তাদের। তাই বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে তারা। স্বয়ং 'তথাকথিত বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আন্দোলনে শরীক হয়। সে 'আমার সোনার বাংলা' গান রচিত হয়। (যা বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। আফসোস! এটা বাংলার স্বাধীনতা বিরোধী একটি সঙ্গীত। অথচ ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের দালাল সরকার তা বাংলাদেশি মুসলমানদের জন্য জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন করে!)

'বঙ্গ-ভঙ্গ রদ' আন্দোলনকে হিন্দুরা ধর্মীয় আমেজে রূপ দেয়। যেহেতু বঙ্গ-ভঙ্গ অধিকাংশ মুসলিমরাই সমর্থন করে, তাই হিন্দুত্ববাদীরা এটিকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। হিন্দুদের দাবীর মুখে ১৯১২ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে দেয়া হয়।

১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি ভারতের বড়লাট নবাবকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ঢাকায় আসেন। এবং বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। কিন্তু অন্যান্য চরমপন্থী, উগ্রবাদী হিন্দু নেতাদের সাথে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধিতা করেন। হায় আফসোস! অথচ আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সর্বাপেক্ষা পূঁজিত জন; যে এবং তার মত অন্যান্য হিন্দুত্ববাদীরা কখনোই চায়নি মুসলমানরা লেখাপড়া শিখুক, শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করুক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিন পরও হিন্দুত্ববাদীরা একে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ব্যঙ্গোক্তি করতে থাকে। তাদের মতে, মুসলমানদের কোনো কালচার (সংস্কৃতি) নেই। তাদের কালচার হলো এগ্রিকালচার (কৃষিকাজ)।

- **হিন্দুত্ববাদী মালাউন কর্তৃক মুসলিমদের উপর আগ্রাসনের কারণঃ**

ক. হিন্দু-জাতীয়তাবাদী দলগুলির বিস্তার, যেগুলি "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের" তথা আরএসএস-এর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বা তার অধীনে কাজ করে। আরএসএস ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ভারতীয় হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), বজরং দল ইত্যাদি।

খ. হিন্দুত্ববাদীদের চরম মাত্রার ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ।

গ. উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা, যার একটি বিশেষ রূপ হল হিন্দুত্ববাদী 'অখণ্ড ভারত' তথা 'রাম-রাষ্ট্রে'র দাবী উত্থাপন, যার মাধ্যমে মুসলিম নিধনের উন্মাদনা দানা বাঁধতে থাকে। ফলে তারা প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের জন্য আহ্বান জানাতে শুরু করে।

ঘ. হিন্দুত্ববাদী নেতৃবৃন্দের উস্কানীমূলক বক্তব্যঃ

ভারতের কংগ্রেস নেতা হিন্দুত্ববাদী ডক্টর মুনজী হিন্দু মহাসভার ১৯২৩ সালের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ঘোষণা দেয়, "ইংল্যান্ড যেমন ইংরেজদের, ফ্রান্স যেমন ফরাসীদের, জার্মানী যেমন জার্মানদের, তেমনি ভারতও হিন্দুদের।"

হিন্দুত্ববাদী মহারাষ্ট্র নেতা বালগংগাধর তিলক, তার রায়গড় বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয়, "এ উপমহাদেশে মুসলিমরা হচ্ছে বিদেশী লুটেরা। সুতরাং তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।"

উপর্যুক্ত কারণসমূহের অনিবার্য ফলাফল হিসেবে একের পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

- **১৯৪৬ এর দাঙ্গা:**

কলকাতা দাঙ্গায় নিহত মুসলিমদের লাশ

১৯৪৬ এর কলকাতা ম্যাসাকার দিয়ে শুরু হয়। দুই মাস পর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় বিহারে। উনিশ দিনের দাঙ্গায় হত্যা করা হয় বিশ হাজারের উপর মুসলিমকে। বর্শা দিয়ে আর গলা টিপে হত্যা করা হয় মুসলিমদের। মুসলিম নারীদের পেট চিরে গর্ভের শিশুদের বের করে আনা হয়। দেয়ালে আর মাটিতে আছড়ে আছড়ে গুড়িয়ে দেয়া হয় ছোট্ট শিশুদের মাথা। চলে ব্যাপক গণধর্ষণ।

- **১৯৪৭ এর দেশ বিভাজনের সময় মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন:**

১৩৬৬ হিজরি (১৯৪৭ ঈসায়ী) ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে 'দ্বি-জাতিতত্ত্বে'র ভিত্তিতে দুটি দেশের জন্ম হয়। একটি নাপাক মুশরিক হিন্দুদের, যার নাম ইন্ডিয়া। অন্যটি মুসলমানদের, যার নাম পাকিস্তান (পবিত্রভূমি)। অবশ্য হিন্দুরা চেয়েছিল অখণ্ড ভারত।

ইংরেজ কর্তৃক এই দেশ ভাগ মোটেও ন্যায় ভিত্তিক ছিল না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ও পাঞ্জাবের পুরো ভূ-খণ্ড পাকিস্তানে না দিয়ে হিন্দুদের জন্য দুই ভাগ করে ফেলা হয়। তাছাড়া কিছু স্বাধীন রাজ্যও পাকিস্তানে যুক্ত হতে চেয়েছিল। যেমন: গুজরাটের জুনাগাধ রাজ্যের মুসলিম শাসক, হায়াদরাবাদের মুসলিম শাসকও চেয়েছিলেন পাকিস্তানে যোগ দিতে। কিন্তু ভারত উভয় রাজ্যের দাবি প্রত্যাখ্যান করে সৈন্য প্রেরণ করে দখল করে নেয়। নেপাল ও ভুটান ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ছিল। তাই দেশ দুটোর বৌদ্ধ অধিবাসীরা স্বাধীনতা বজায় রাখে। তারপর ১৩৯৫ হিজরীতে (১৯৭৫ ঈসায়ী) স্বাধীন সিকিম ভারতে যুক্ত হয়। শ্রীলঙ্কা ১৩৬৭ ঈসায়ীতে ভারত থেকে এবং দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ ১৩৭৩ হিজরিতে শ্রীলঙ্কা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

দেশভাগের সময় হিন্দুস্তান জুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ভারতের বঞ্চিত-নির্যাতিত মুসলিমরা নিজেদের জান-মাল নিয়ে হাজার হাজার মাইলের অনিশ্চিত পথে পাড়ি জমায় পাকিস্তানের দিকে। এই দীর্ঘ পথে সংঘবদ্ধ হিন্দুত্ববাদী গেরোয়া সন্ত্রাসীরা হাজার হাজার মুসলিমদেরকে হত্যা করে, লুটপাট করে, মা-বোনদের ধর্ষণ করে। যাওয়ার পথে ট্রেনেও অভিশপ্ত হিন্দুরা আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

- **১৯৪৭ সাল পরবর্তী হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনঃ**

এরপর ছোট-বড় অনেকগুলো দাঙ্গা সংগঠিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ১৯৪৭ সালে জম্মুতে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ, হায়দরাবাদে অপারেশন পোলোর পরে মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা, ১৯৫০ সালে বরিশাল দাঙ্গা ও ১৯৬৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান দাঙ্গার পরে কলকাতায় মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৬৯ সালের গুজরাট দাঙ্গা, ১৯৮৪ ভীভান্দি দাঙ্গা, ১৯৮৫ গুজরাত দাঙ্গা, ১৯৮৯ সালের ভাগলপুর দাঙ্গা, বোম্বাই দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালে নেলি এবং ২০০২ সালে গুজরাতের দাঙ্গা, ২০১৩ সালে মুজাফফরনগর দাঙ্গা ও ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা ইত্যাদি।

- **বাবরি মসজিদের শাহাদাতঃ**

ভারতের উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরে অবস্থিত বাবরি মসজিদ ঐতিহ্যবাহী একটি স্থান। আল্লাহর এই ঘর মসজিদ মুঘল সম্রাট বাবরের আদেশে সেনাপতি মীর বাকী কর্তৃক ৯৩৫ হিজরি সনে নির্মাণ করা হয়।
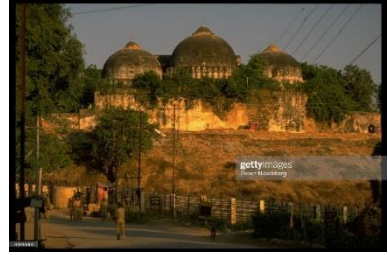
১৯৪৯ সালে হিন্দু দেবতা রামের একটি মূর্তি রহস্যজনকভাবে রাখা হয় বাবরি মসজিদের ভিতর। মূলত এটি ছিল হিন্দু মহাসভা নামের কট্টরপন্থি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের অনুসারি এক যুবকের কুকীর্তি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা হিন্দুদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

১৯৫০ সালে রামের ভক্ত হিন্দুত্ববাদী গোপাল সিংহ বিশারদ বাবরি মসজিদকেই রামের জন্মভূমি দাবি করে সেখানে পূজার অধিকার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়।

পরমহংস রামচন্দ্র দাস সেখানে পূজার দাবি জানিয়ে মামলা করে। ১৯৬১ সালে উত্তরপ্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড জমির অধিকার চেয়ে আদালতে যায়। ‘রামলালা বিরাজমান’ নিজেও মামলার পক্ষ হয়ে ওঠেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি দেবকীনন্দন আগারওয়ালের প্রধান দাবি করে, রামের জন্মভূমিই দেবতার চরিত্র পেয়েছে।

অবশেষে, কোর্ট মসজিদটিকে “বিতর্কের বিষয়” বলে অভিহিত করে। সেই সাথে মসজিদের দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। কার্যত এটি ছিল এমন এক রায়, যা হিন্দুদের পক্ষপাতি।

এরপর আশির দশকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) তাদের রাজনৈতিক সহযোগী ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) সাথে নিয়ে বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে থাকে। দেবতা রামচন্দ্রের জন্মভূমির ওপর তৈরি করা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে বলে ধারণা দেশটির কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের।

এই প্রচারাভিযানে নতুন এক মাত্রা যোগ করে এক এ্যাডভোকেট। ১৯৮৬ সালে সে বাবরি মসজিদের তালা খুলে সাধারণ হিন্দুদের প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে ফৈজাবাদ জেলা বিচারকের কাছে আপিল করে। একদিনের মাথায় এই আপিল গ্রহণ করা হয় এবং বিচারক অর্ডার করে সাধারণ হিন্দুদের জন্য বাবরির গেট খুলে দিতে। অর্ডার জারির কয়েক মিনিটের মাথায় তা বাস্তবায়ন করা হয়।
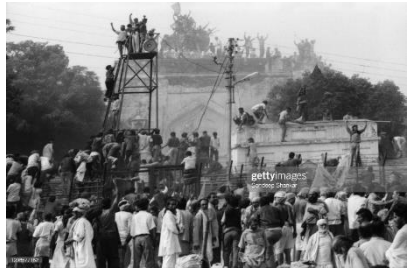
এরপর, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সন্ত্রাসী দল আরএসএস এবং এর সহযোগী সংগঠন বাবরি মসজিদের কাছে স্থানে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করে। শোভাযাত্রায় শামিল হয় দেড় লাখ কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী। সেদিন দুপুরের দিকে এক যুবক মসজিদের উপরে চড়ে এবং হিন্দুত্ববাদীদের গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করে। এরপর উন্মত্ত হিন্দু সন্ত্রাসীরা কুঠার, হাতুড়ি এবং গাইতি দিয়ে বাবরি মসজিদে আঘাত করা শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার মাঝে কাদা ও চুনাপাথর দ্বারা নির্মিত ইমারতটি মিশে যায় মাটির সাথে। শহীদ হয়ে যায় বাবরি মসজিদ।

গেরোয়া হিন্দুত্ববাদী কর্তৃক ধ্বংসের পর বাবরি মসজিদ

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। এতে প্রায় ২ হাজার মানুষ মারা যায়।

অবশেষে ০৫ আগস্ট, ২০২০ তারিখে হিন্দুত্ববাদী মালাউন বিজেপি প্রধান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাবরি মসজিদের স্থানে রাম মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করে। (https://bit.ly/3PZqdeU)

অযোধ্যার বাবরি মসজিদের পর হিন্দুত্ববাদীরা উত্তর প্রদেশের জ্ঞানবাপি মসজিদ, মথুরার শাহী ইদগাহ মসজিদ এবং দিল্লীর কুতুব মিনার সহ অন্যান্য ইসলামী স্থাপনাসমূহ ধ্বংসের পায়তারা করছে; যার ফলে এই স্থাপনাসমূহ বর্তমানে শাহাদাতের দ্বারপ্রান্তে।

- **গুজরাট গণহত্যা:**

ঘটনার সূত্রপাত : ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে অযোধ্যা থেকে আহমেদাবাদের গোদরা রেলস্টেশনের কাছে থামে একটি ট্রেন ‘সাবারমতি এক্সপ্রেস’। যাত্রীরা পূজা শেষে অযোধ্যা থেকে ফিরে আসছিল। রেলওয়ে প্লাটফর্মে ট্রেনের যাত্রী এবং বিক্রেতাদের মধ্যে একটি তর্কের সৃষ্টি হয়। তর্কটি হিংস্র হয়ে ওঠে এবং অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ট্রেনের চারটি কোচে আগুন ধরিয়ে

দেওয়া হয়। বহু লোক ট্রেনের ভিতরে আটকে যায়। ফলস্বরূপ, ৫৯ জন লোক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

মুসলিম বিরোধী প্রোপাগান্ডা :

মুসলিমরাই ট্রেনে আগুন দিয়েছিল এমন একটি মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় রাজ্যজুড়ে হিন্দু জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরে ট্রেনে হামলার অজুহাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। জোরালো প্রচারণা চালানো হয় যে ট্রেনে হামলার পিছনে মুসলিমদেরই হাত রয়েছে। সেসময়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিল নরেন্দ্র মোদি। ট্রেনে হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে মোদি হাতে নেয় ইসলাম বিরোধী প্রোপাগান্ডা। মোদির সাথে যোগ দেয় বিজেপি সভাপতি রানা রাজেন্দ্রসিংহ। তারা এই ধর্মঘটের সমর্থন করে। রানা রাজেন্দ্রসিংহ ও নরেন্দ্র মোদী সরাসরি মুসলমদের জড়িয়ে উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করে, যা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে। নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করে যে, ট্রেনে হামলা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা নয়, বরং মুসলিম সন্ত্রাসবাদের কাজ ছিল এটি।

অন্যদিকে, স্থানীয় সংবাদপত্র এবং রাজ্য সরকারের সদস্যরা বিনা প্রমাণে দাবি করে মুসলিমরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উস্কে দেওয়ার জন্য একটি বিবৃতি ব্যবহার করা হয় যে ট্রেনে হামলাটি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা করেছে এবং স্থানীয় মুসলিমরা তাদের সাথে রাজ্যের হিন্দুদের আক্রমণ করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত। স্থানীয় মিডিয়া দ্বারা মিথ্যা গল্প ছাপা হয় এবং দাবি করা হয় যে, মুসলিমরা হিন্দু মহিলাদের অপহরণ করেছে এবং ধর্ষণ করেছে।

গোধরা-পরবর্তী গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা :

২৮ ফেব্রুয়ারি (ট্রেনের আগুনের পরদিন) থেকে শুরু হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর একযোগে হামলা। হাজার হাজার সন্ত্রাসী হিন্দুরা এই হামলায় অংশ নেয়। হামলাকারীরা বাছাই করে করে হিন্দুদের বাড়ি অক্ষত রেখে মুসলিমদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ বাহিনীও আত্মরক্ষার নাম করে

মুসলিমদের উপর গুলি চালিয়েছিল। ফলে অসংখ্য মুসলিম পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। পুলিশের গুলিতেই নিহত হয়েছিল প্রায় অর্ধশতাধিক মুসলিম।

মালাউন গেরোয়া সন্ত্রাসী

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে, আগুনে পুড়িয়ে মারতে শুরু করে। সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী হয় এই রক্তপাত। শত শত বালিকা ও মহিলাদের গণধর্ষণ করা হয় এবং পরে তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বাচ্চাদের জোর করে পেট্রোল খাওয়ানো হয় এবং তারপরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলাদের আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। মহিলাদের পেটে অনাগত সন্তানের পোড়া দেহ দেখা যাচ্ছিল। নানদা পটিয়া গণকবরে ৯৬ টি দেহের মৃতদেহ ছিল, যার মধ্যে ৪৬ টি জন ছিল মহিলা। উগ্র হিন্দুরা তাদের বাড়ি ঘেরাও করে এবং ঘরের পুরো পরিবারকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে। মহিলাদের উলঙ্গ করে ধর্ষণ করেছিল এবং হত্যা করেছিল। মহিলাদের পেট চিরে নবজাতক বের করে ত্রিশুলের আগায় গেঁথে আনন্দ মিছিল করেছিল হিন্দুরা। পিতার সম্মুখে তার সন্তানকে হত্যা আর মায়ের সম্মুখে তার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

প্রিয় ভাই! এই হল মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের আসল চেহারা। তারা আমার আপনার প্রতি এমনই বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে থাকে। একটু ভাবুনতো,

এরা যখন আপনার আমার ঘরে ঢুকবে 'অখণ্ড ভারত' আর 'রামরাজত্ব' কায়েম করার মিশন নিয়ে তখন আমাদের সাথে এরা কেমন ব্যবহার করবে, কেমন আচরণ করবে আমাদের সন্তানদের সাথে, আমাদের মা-বোনদের সাথে???

নির্বাচনে মোদির অন্যতম প্রতিপক্ষ এহসান জাফরির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল কিছু মুসলিম। সেখানে প্রায় বিশ হাজার উন্মত্ত হিন্দু তার বাড়ি ঘেরাও করে। আর শেষমেশ এহসান জাফরি নেমে এলে তার হাত-পা দু'টো কেটে মৃতদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। শেষে মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, তার ঘরে আশ্রয় নেওয়া প্রায় সব মুসলিম পুরুষদের নির্মমভাবে কুপিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। নারীদের ধর্ষণ শেষে হত্যা করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টেও এসেছিল এসব তথ্য। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছিল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, এদের মধ্যে অন্যতম 'গুলবার্গ গণহত্যা'। সেখানে একসাথে ৯০ জন মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছিল।

প্রায় ২০০০ এর বেশি মুসলিমকে মাত্র কয়েকদিনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আহত হয় আরও অনেক। কিন্তু অফিসিয়াল ডাটায় দেখানো হয় মাত্র ৭৯০ জন মুসলিম নিহতের কথা! গুজরাট থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায় ৯৮,০০০ মুসলিম। রাতের ব্যবধানেই এতগুলো মুসলিম পরিবার বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। কোন হিসেব মতে সেই সংখ্যা আসলে দেড় লক্ষেরও অধিক। অর্থনৈতিক হিসেবে মুসলিমদের কত পরিমাণ সম্পদ লুটপাট ও ধ্বংস করেছে তার কোন হিসেব নেই।

গুজরাট কাণ্ডে ওয়াশিংটন পোস্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মোদী বলেছিল, 'আমি কোন ভুল করিনি। আমি মানবাধিকার রক্ষার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ'। মোদী তখন কোন মানবাধিকারের কথা বলেছে তা সেই সাংবাদিক বা কোন বিবেচকের মাথায় তা ঢুকেনি।

কসাই মোদি সবার উদ্দেশ্যে বলেছিল যে তীর্থযাত্রীদের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে মুসলিমদের এক উচিত শিক্ষা দিতে হবে।' এই পরিকল্পিত গণহত্যা শেষ হবার পর মোদিকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছিল গুজরাটের ব্যাপারে

তার কোন অপরাধবোধ নেই। এ কারণে নরেন্দ্র মোদিকে এখনও ডাকা হয় 'গুজরাটের কসাই' নামে।

- **ভারতীয় 'নাগরিকদের জাতীয় নিবন্ধন' (National Register of Citizens/NRC):**

ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস (এনআরসি) হল ভারতীয় সকল নাগরিকদের একটি নিবন্ধন, যা তৈরি করা হয়েছে ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন ও ১৯৫৫ এর সংশোধনী দ্বারা। এর উদ্দেশ্য হল ভারতের সমস্ত বৈধ নাগরিকদের নথিভুক্ত করা যাতে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত এবং নির্বাসিত/দেশ থেকে বিতাড়িত করা যায় । আসাম রাজ্য দিয়ে ২০১৩-২০১৪ সালে সর্বপ্রথম এনআরসির কাজ শুরু করা হয়েছে এবং ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দেশের প্রতিটি রাজ্যের জন্য করা হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কুখ্যাত এনআরসির টার্গেট গ্রুপ কারা? কাদেরকে চিহ্নিত করে ভারত সরকার দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে??

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মালাউন অমিত শাহ ভারতীয় সংসদের 'রাজ্যসভা'য় ঘোষণা করেছে,

"সি এ বি (CAB) নিবন্ধনের পর আমরা এন আর সি (National Register of Citizens/NRC) চালু করবো। এন আর সি (NRC) শুধুমাত্র বাংলাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সমগ্র ভারতে হবে। অনুপ্রবেশকারীদের (মুসলিমদের) জন্য অবশ্যই এটি ভয়াবহ হবে। তারা ছাড়া অন্যান্য সংখ্যালঘুদের চিন্তার কোন কারণ নেই।"

বুঝাই যাচ্ছে, এনআরসির টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে ভারতের অসহায় মুসলিমরা। ভারত সরকার আসামের প্রায় ২০ লক্ষের অধিক মুসলিমকে বাংলাদেশ হতে 'অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দিয়ে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে। আমাদের বুঝতে আর বাকী নেই, এনআরসি মূলত মুসলিমদের উপর গণহত্যার

একটি বৈধ কারণ বের করার হীন প্রচেষ্টা। যে কোনো সময় তারা মায়ামারের রোহিঙ্গাদের মত ভারতীয় মুসলিমদের উপর গণহত্যা শুরু করে বন্ধুরাষ্ট্র (???) বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করবে।

ভারতীয় মুসলিমদেরকে পুরোপুরি উচ্ছেদের আগে 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প' ও 'ডিটেনশন সেন্টারে' পাঠানো হচ্ছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র মুখপাত্র ঘোষণা করেছে,

"আমাদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর আমরা অনিবন্ধিতদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাবো। চাইনিজরা তাদের দেশের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে থাকা উইঘুরদের সাথে যেমন আচরণ করে, আমরাও আমাদের ক্যাম্পগুলোতে তেমন আচরণ করবো।"

ইতোমধ্যেই ভারতীয় সরকার বিভিন্ন জায়গায় ডিটেনশন সেন্টার (বন্দী কেন্দ্র) নির্মাণ করেছে। যেমনঃ দিল্লি, গয়া, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, রাজস্থান ইত্যাদি। এই কারাগারগুলোতে মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীরা অকথ্য নির্যাতন করছে, অনেককে শহীদ করে দিচ্ছে।

- <u>হিন্দুত্ববাদীদের দীর্ঘদিনের লালিত 'অখণ্ড ভারতে'র স্বপ্নঃ</u>

তথাকথিত "অখন্ড ভারত" শব্দগুচ্ছটি আসলে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের একটি ধারণা ও বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস অনুসারে, বর্তমান ভারতের দুই পাশে অবস্থিত দুই দেশ- পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হচ্ছে ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিক এবং কৃষ্টিগত দিক দিয়ে ভারতের সাথে মিল থাকায় এই সকল দেশকে ভারতের সাথে যোগ দিতে হবে।

নব্বই দশকের শেষ প্রান্তে বিজেপি সরকারের আমলে হিন্দুসংঘ ২০ হাজার স্কুলে ভূগোল বইয়ে ভারতের মানচিত্রে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তিব্বত, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটানকে অখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে

দেখানো হয়। এবং ভারত মহাসাগরকে হিন্দু মহাসাগর, আরব সাগরকে সিন্ধু সাগর এবং বঙ্গোপসাগরকে গঙ্গা সাগর হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়।

শুধু তাই নয়, আফগানিস্তান, লাওস, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়াকেও অখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে কল্পনা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী হিন্দুদের সংগঠিত করে এ লক্ষ্যে পৌঁছার স্বপ্ন লালন করা হচ্ছে। খণ্ড বিখণ্ড ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করা হচ্ছে কট্টরপন্থী হিন্দু মহাসভার ঘোষিত নীতি।

অখন্ড ভারত গঠনের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস), বজরং, শিব সেনা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মতো মূলস্রোতের ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো একটি ‘অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র’ গঠনের দাবি উত্থাপন করছে।

অখন্ড ভারতের ধারণায় বিশ্বাসীদের যুক্তি হল এসকল দেশ একসময় হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সুতরাং এই সকল অঞ্চল গুলোকে ভারতের সাথে যোগ দিতে হবে এবং এখানকার বাসিন্দাদের সনাতন ধর্মে ফেরত যেতে হবে।

আগস্ট ১৪ , ২০২১ ভারতের মানচিত্রে বাংলাদেশকে যুক্ত করে উপরের মানচিত্রটি (দুটি শ্লোগানসহ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকে পোস্ট দেয় মালাউন দিলীপ ঘোষ নামের এক বিজেপি নেতা। (লিংক: https://bit.ly/dilipmap)। তাতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শীলঙ্কা, মিয়ানমারের মতো ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন দেশগুলোকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো হয়। এমনকি, মুসলিমদের নীরবতা আর দূর্বলতার সুযোগে মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা এতটাই উন্মাদ ও আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে যে, মুসলিমদের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ‘হিন্দু রাষ্ট্রের’ নতুন ‘সংবিধান’ পর্যন্ত তৈরী করে
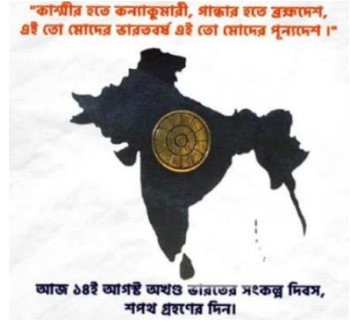
ফেলেছে তারা। হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধানের খসড়া অনুসারে, অহিন্দুরা বিশেষতঃ

মুসলিমরা তথাকথিত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। [https://bit.ly/3AvWrZM]

২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ তম বার্ষিকীতে নাগপুর এক অনুষ্ঠানে হিন্দুত্ববাদী সংঘ আরএসএস-এর প্রধান মালাউন মোহন ভগবত দাবী করেছে, "আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপূরণ হবে।" (https://bit.ly/3BuxLT0 , https://bit.ly/3RSOO6x)

- ## ২০২১ সালে "জাতিগত নিধনের" আহ্বান:

অবশেষে ২০২১ সালের ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর তিন দিন ব্যাপী উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বড় ধর্মীয় বৈঠক আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠিত এই সভায় হিন্দুদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধু-সন্তরা মুসলিম জাতি নির্মূলে গণহত্যার প্রকাশ্য আহ্বান জানায়। তারা হিন্দুদেরকে উৎসাহিত করে অস্ত্র ক্রয় এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য। স্পষ্ট ভাষায় তারা ভারতের বিশকোটি মুসলিমদের গণহত্যা এবং জাতিগত নিধনের জন্য উৎসাহিত করে। এভাবে তারা তথাকথিত 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চায়। এই সভাকে 'ধর্ম সংসদ' নাম দেয়া হয়।

উক্ত সভায় অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা মালাউন যতি নরসিংহানন্দ ঘোষণা করে, "মুসলিমদেরকে হত্যা করার জন্য তরবারি যথেষ্ট নয়। আমাদের তরবারির চেয়েও ভাল অস্ত্র চাই।"

উক্ত সভার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি মালাউন প্রবোধানন্দ গিরি, সে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জাতিগত নিধনের উদাহরণ দিয়ে ঘোষণা করে, "সময় আর বাকি নেই। এখন কেবল দুটো অপশন আছে। হয় নিজেরা মরার জন্য

তৈরি হও অথবা মুসলিমদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে এখানেও (ভারতেও) মিয়ানমারের মত স্থানীয় পুলিশ, রাজনীতিবিদ, সেনাবাহিনী এবং প্রত্যেক হিন্দুর জন্য উচিত হল, তারা অস্ত্র বহন করবে এবং উচ্ছেদ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এছাড়া সমাধানের কোনো পথ নেই।"

হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারি পূহা শাকুন পান্ডে নামক নারী মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়ে বলে, "অস্ত্র ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আপনাদের যদি তাদের (মুসলিমদের) জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করতে হয়, তাদের হত্যা করুন। তাদের হত্যা করতে প্রস্তুত হন এবং জেলে যেতে প্রস্তুত হন। যদি আমাদের মাত্র ১০০ সৈন্যও থাকে এবং তাদের ২০ লাখকে যদি আমরা হত্যা করি, আমরা বিজয়ী হব।"

আরেক হিন্দুত্ববাদী মালাউন আনন্দস্বরূপ হিন্দুদেরকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য উৎসাহিত করে বলে, "আমি বারবার বলছি, যদি মোবাইল প্রয়োজন হয় তাহলে ৫০০০ রাখ, কিন্তু অস্ত্রের জন্য খরচ কর ১ লাখ রুপি।"

এই সভার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমন কতক ভিডিও সকলের সামনে আসে সেখানে দেখা যায়, শিশু-কিশোর ও পূর্ণবয়স্কদের নানা জায়গায়- স্কুলে, গ্রামের ক্ষেত-খামার ও ময়দানে কিংবা এয়ার কন্ডিশন কনফারেন্স রুমে- লড়াই করা, হত্যা করা, অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করা এবং শত্রুকে হত্যা করার মর্মে শপথ করান হচ্ছে। এমনিভাবে মুসলিমদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে বয়কট করারও অঙ্গিকার করান হচ্ছে। মুসলিমদের সঙ্গে সর্বপ্রকার লেন-দেন পরিহার করার কথাও বলা হয়। এমনকি পার্লামেন্টের কতক সদস্য পর্যন্ত মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদেরকে এলাকা থেকে মেরে পিটিয়ে বের করে দেয়ার উপর জোরারোপ করে।

এখানে আর একটি বিষয় আমাদের বুঝা উচিত, এই সভা ও বৈঠক, এ জাতীয় চিন্তাধারার অধিকারী ও সমমনা লোকদের কোনো বিচ্ছিন্ন বৈঠক নয়। অনুষ্ঠানের পর অনলাইনে বিপুল সমর্থন অর্জন করে এই সভা। সহজভাবে

বলতে গেলে, সকল কিংবা অধিকাংশ হিন্দুরাই বর্তমানে চায় ভারতবর্ষে কোনো মুসলিম না থাকুক, সকল মুসলিমকে হত্যা করা হোক। মুসলিম বিদ্বেষ বর্তমানে থার্মোমিটারের সর্বোচ্চ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। ভয়াবহ 'ইসলামোফোবিয়া' গোটা হিন্দুস্তানের সমাজে ছড়িয়ে গিয়েছে।

ভারতের সকল স্তরের মালাউন যুবকেরা হিন্দুত্ববাদীদের জাতিগত নিধনের বিরাট প্রকল্পে পুরোপুরি অংশ নিচ্ছে এবং মুসলিমদেরকে বিশেষত মুসলিম মা-বোনদেরকে পশুর চেয়েও অধম প্রমাণ করায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, নানাভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও কটাক্ষ করছে।

মুসলিমদেরকে মানবিক গুনাবলী থেকে অবমুক্ত করে পশু-জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট আখ্যা দিচ্ছে। বিজেপি ও আরএসএস কর্মীরা দীর্ঘদিন যাবত মুসলিমদেরকে বোঝানোর জন্য 'উইপোকা' ট্যাগ ব্যবহার করছে; যারা নাকি ভারতের সম্পদ নষ্ট করছে এবং মালাউন হিন্দুত্ববাদীদেরকে তাদের ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

বিভিন্ন মোবাইল এ্যাপ্স, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়াতেও হিন্দুত্ববাদীরা নির্বিঘ্নে ও খোলাখুলিভাবে মুসলিম সাধারণ যুবকদের হত্যা করা এবং মুসলিম মা-বোনদের সঙ্গে দলগত অনাচারের আহ্বান জানাচ্ছে।

সাধারণ মুসলিমদেরকে 'জিহাদী' ট্যাগ দিচ্ছে। তাদেরকে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করছে। গরু জবাই করার অপরাধে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা করছে।

এছাড়া সরকারিভাবেও বিজেপি, আরএসএস এর লক্ষ লক্ষ কর্মী ও সমর্থক অত্যন্ত দক্ষভাবে নানা প্রোপাগান্ডা তৈরি করছে। অত্যন্ত সুনিপুণ ও সংগঠিতভাবে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। তাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও গণহত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে। বলিউড ম্যুভি আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে হিন্দুদের ব্রেইন ওয়াশ করছে, জাতিগত নিধনের পালে হাওয়া দিয়ে এই আহ্বানকে ব্যাপক করা হচ্ছে।

এককথায়, মুসলিমদের ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে জাতিগত নিধনের পরিকল্পনা সফল করার জন্য তৃণমূল থেকে শুরু করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী সমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুনিপুণ ও গভীরভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

তারা তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে এই বার্তাই দিচ্ছে যে, হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের জাতিগত নিধনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত মনে করছে। তারা অতি শীঘ্রই এই মহা হত্যাযজ্ঞের চূড়ান্ত অংশকে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

(ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের সর্বশেষ আপডেট পেতে Tor Browser দিয়ে ভিজিট করুন-

লিংক ০১: https://bit.ly/3PXKzWd

লিংক ০২: https://gazwah.net/?cat=634

লিংক ০৩: https://dawahilallah.com/)

- ভারতীয় মুসলিমদের জন্য "জেনোসাইড ইমারজেন্সি এলার্ট"

জেনোসাইড ওয়াচ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর গ্রেগোরি এই স্ট্যান্টোন (Gregory H Stanton) জাতিগত নিধনের দশটি পর্যায় বিন্যাস করেছেন। (https://bit.ly/3R1usZ0)

তার মতে, "ভারত জাতিগত নিধনের অষ্টম স্তরে পৌঁছে গেছে। তা হল পশ্চাদ্ধাবন ও নির্যাতন-নিপীড়নের স্তর। (এর পরের ধাপই মূলোচ্ছেদ তথা পরিকল্পিত সংঘবদ্ধ গণহত্যা করা, যাতে উক্ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সার্বিকভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়।)

১০ ই জানুয়ারি ২০২২ এ তারা ভারতের জন্য জেনোসাইড ইমারজেন্সি এলার্ট জারি করে। একটি অনলাইন কনফারেন্সে সকলকে সম্বোধন করে বলে যে, "ভারত আজকে অষ্টম স্তরে পৌঁছে গেছে। নিজেদের টার্গেট গ্রুপ তথা মুসলিমদেরকে চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদের স্তরে যেতে তাদের কেবল এক কদম দূরত্ব রয়েছে।"

এককথায়, হিন্দুত্ববাদী বাহিনী মুসলিমদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার জন্য দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

(Tor Browser ব্যবহার করে বিস্তারিত পড়ুন:
ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম নিধনের বিভিন্ন পর্যায়: https://bit.ly/hind12 ;
হিন্দুস্তান ক্রমাগত ধ্বংসের পথে: https://bit.ly/hind13)

কাশ্মীরের ইতিহাস

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য একে বলা হয় 'ভূ-স্বর্গ'। কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত এই ভূ-খণ্ডটি মুসলমানদের জন্য কি আসলেই স্বর্গ???

কাশ্মীরের প্রথম মুসলিম শাসক ছিলেন হিজরি অষ্টম শতকে খোরাসান থেকে আগত শামসুদ্দিন শাহ মির্জা। তার রাজবংশ দুই শতাব্দীরও বেশি সময় (৭৪৪-৯৭০ হিজরি) কাশ্মীর শাসন করেন।

এরপর মোঘল সম্রাট আকবরের মাধ্যমে কাশ্মীর মোঘল শাসনের অধীন আসে। এ সময় কাশ্মীরে ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং তা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়।

মোঘলদের পর আফগান দুররানিরা ১১৬৪ হিজরিতে ক্ষমতায় আসে এবং ১২৩৪ হিজরি (১৮১৯ ঈসায়ী) পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করে।

তারপর ইংরেজদের সহায়তায় ১২৩৪ হিজরিতে শিখরা কাশ্মীর দখল করে নেয়। শিখরা এসেই মুসলমানদের উপর দমন-পীড়ন শুরু করে। আগুন দিয়ে ধ্বংস করতে থাকে মসজিদ। অনেক মসজিদকে আস্তাবল বানায়। ফলে কাশ্মীরি মুসলমানদের মাঝে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে ইংরেজরা শিখদের থেকে ১২৬২ হিজরি (১৮৪৬ ঈসায়ী) কাশ্মিরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং ডোগরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোলাপ সিংহের কাছে ৭৫ লাখ রুপির বিনিময়ে কাশ্মির বিক্রি করে দেয়।

ডোগরা রাজবংশ ক্ষমতায় এসে মুসলমানদের উপর নতুন করে অত্যাচার শুরু করে। চাপিয়ে দেয় দুঃসহ করের বোঝা। মুসলিম ভূমিসমূহ বাজেয়াপ্ত করা

হয়। গরু জবাইয়ের শাস্তি করা হয় মৃত্যুদণ্ড। কাশ্মীরি মুসলিমরা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে যায়। অনেক কাশ্মীরি পাঞ্জাবে হিজরত করেন।

অবশেষে ১৩৬৬ হিজরিতে (১৯৪৭ ঈসায়ী) চলে আসে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের সময়। মুক্তির এই মোক্ষম সময়ে কাশ্মীরের মুসলমানরা পাকিস্তানকেই নিজেদের স্বদেশ হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু হিন্দু রাজা মহারাজা হরি সিং বাধ সাধে। সে কাশ্মীরি ও বহিরাগত মাল্‌উন হিন্দুদের দ্বারা কাশ্মীরের পাকিস্তানে যোগ দেয়া প্রতিহত করে এবং পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। এই দাঙ্গায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার মুসলমান শহীদ হয়। ৮০% মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীরের মূল ভূ-খণ্ড ভারতের সীমানায় থেকে যায়।

ভারত সরকার মহারাজাকে সহায়তা করতে বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। তারা ঘোষণা করে, যারা পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক তাদের সহায়তা দেয়া হবে। মুহাজিরদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হতে আহ্বান জানানো হয়। যখন অনেক মুসলমান মুহাজির শিবিরে একত্রিত হলেন, তখন তাদের উপর চালানো হয় নৃশংস হামলা। **এ ঘটনায় ৫ লক্ষ মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন।** আর সমপরিমাণ মুসলমান পাকিস্তানে হিজরত করতে সক্ষম হয়।

প্রিয় ভাই! উম্মাহর রক্তের প্রতিটি ফোঁটার হিসেব কষে রাখুন। গাযওয়াতুল হিন্দে প্রতিটি ফোঁটার প্রতিশোধ নিতে হবে ইনশাআল্লাহ!!!

মালাউন হিন্দুরা বহু মুসলিম নারীকে নির্যাতন করে। খুন, ধর্ষণ, এমনকি পরিবারের সামনে নৃশংস ভাবে তাদের স্তন কেটে ফেলে। কয়েক লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করা হয়।

পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে যায় যে, অচীরেই মুজাহিদ এবং হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এটি ছিল ১৯৪৭ ঈসায়ী সনে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তানের প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধের মাধ্যমে মুজাহিদরা ভারতের উল্লেখযোগ্য অংশ আজাদ করতে সক্ষম হয়। এই অংশ আজও 'আজাদ কাশ্মীর' নামে পাকিস্তানের সাথে রয়েছে।

এই দীর্ঘ সময় জাতিসংঘ কাশ্মীরের ব্যাপারে ছিল চুপ। বরং বলা ভালো, তার নীরব সম্মতিতেই সব ঘটছিল।

এরপর ১৩৭৭ হিজরিতে সমস্ত রাখঢাক ছুড়ে ফেলে প্রকাশ্যেই কাশ্মীরকে ইন্ডিয়ার অংশ বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

১৩৮৫ হিজরি/১৯৬৫ ঈসায়ী সনে কাশ্মীর ইস্যুতে আবারও ভারত-পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ বাধে।

অধিকৃত অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে বাহির থেকে হিন্দুদের কাশ্মীরে পাঠানো হয়। আর মুসলিমদের উপর অত্যাচার যুলুম করা যেন পুলিশদের তিনবেলা খাবারের মতই রুটিনমাফিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু শারীরিক ও আর্থিক নিপীড়নই নয়; বরং কাশ্মীরি মুসলিমদের স্বাধীনতার স্বাদ ভুলিয়ে দিতে ও চিন্তাগতভাবে দুর্বল করে দিতে তারা নানা উপকরণ ব্যবহার করে। গোয়েন্দা সংস্থার লোকদেরকে স্পেন, রাশিয়াতে প্রেরণ করা হয়। তারা স্পেনিশ ও তাতার মুসলিমদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসে।

মুসলমানদের দ্বীন ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে মরদে মুজাহিদরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন লড়াইয়ে। দিকে দিকে আজ জিহাদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।......

বাংলাদেশের উপর হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের ইতিহাস:

১৯৪৭ সালে সৃষ্ট মুসলিমদের ভূমি পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। ১. পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) এবং ২. পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৪৭ এর ভারত-বিভাজনের সময় হিন্দুত্ববাদী মালাউনদের স্বপ্ন ছিল অখণ্ড 'ভারত-মাতা', অর্থাৎ পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে নাপাক 'রামরাজত্ব' কায়েম করা। এরই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হিন্দুত্ববাদী ভারত মুসলিম পাকিস্তানকে দুর্বল করতে (যেন ভবিষ্যতে দখল করতে সহজ হয়) পূর্ব পাকিস্তানের ভারতীয় দালাল শেখ মুজিবুর রহমানকে ব্যবহার করে পূর্ব পাকিস্তানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর হামলা করে। শুরু হয় ভাইয়ে ভাইয়ে নয় মাস ব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। অবশেষে বন্ধুবেশী

ভারতের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ, সামরিক ও সার্বিক সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায় 'বাংলাদেশ'। আর পশ্চিম পাকিস্তান রয়ে যায় 'পাকিস্তান' নামে। বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দালাল শেখ মুজিবের 'আওয়ামীলীগ সরকার।'

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর হতে বিগত পঞ্চাশ বছরে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক সকল ক্ষেত্রে ভারত ইতোমধ্যে পুরোপুরিভাবে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে এবং বর্তমানে ৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টর ভারতীয় হিন্দু ও হিন্দুত্ববাদী দালালদের দখলে।

প্রিয় ভাই! ভারতের রাষ্ট্রীয় মুশরিক বাহিনী, RSS আর বাংলাদেশের হিন্দুত্ববাদী সরকার, ইসকন, জাতীয় হিন্দু মহাজোট, জাগো হিন্দু, বেদান্ত, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ইত্যাদি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে উপমহাদেশের মাটি থেকে ইসলাম ও মুসলিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে। আর এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের দিকে সুচারুভাবে এগিয়ে নিচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা **'র'**। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছে। এরা প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে। এদের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করে 'অখণ্ড ভারত' তথা 'রাম রাজত্ব' কায়েম করা।

হিন্দুত্ববাদী ভারত ও তাদের পা-চাটা গোলাম বাংলাদেশের আওয়ামীলীগ সরকার বর্তমানে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী, মিডিয়া, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, নাগরিক সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতাকারী অসংখ্য গাদ্দার তৈরি করেছে। হিন্দুদের গণহারে সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, দেয়া হয়েছে যত্রতত্র পূজা করার সুযোগ। পূজা উপলক্ষে মুসলিমদের কাছ থেকে নেয়া ট্যাক্স থেকে দেয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বরস্বতি পূজা ও হোলি পূজা উদযাপন শুরু হয়েছে।

প্রশাসন থেকে শিক্ষা, বিচার বিভাগ থেকে প্রতিরক্ষা সকল ক্ষেত্রে হয়েছে ব্যাপক হিন্দুয়ানীকরণ; উর্ধ্বতন সকল পোস্টে এবং বিভিন্ন স্ট্র্যাটিজিক পজিশনে অত্যন্ত হিসেবনিকেশ করে বসানো হয়েছে মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের।

৯০% মুসলমানের দেশে বর্তমানে প্রশাসনের ৩৫% এর কাছাকাছি পদ দখল করে আছে হিন্দুরা। দেশের প্রতিটি বিভাগীয় ও জেলা কমিশনার (ডিসি) অফিসে উচ্চ পর্যায়ে এখন কোন না কোন হিন্দু আছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ থানা ও জেলায় ওসি ও এসপি পদে বসানো হয়েছে হিন্দুদের।

এমনকি বর্তমানে হাসিনার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই উপদেষ্টারই একান্ত সচিব হল হিন্দু। হাসিনার বিশেষ সহকারীও একজন হিন্দু। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে যে মন্ত্রণালয় আছে সেখানেও একদম উপরের দিকের পদগুলো হিন্দুদের দখলে।

বিশেষ করে টার্গেট করে শিক্ষাখাতে জায়গা করে নিয়েছে অনেকক হিন্দু। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের চেয়ারম্যান এক হিন্দু। এই মালাউনের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হচ্ছে, চলছে হিন্দুয়ানিকরণ। স্কুল-কলেজগুলোতে হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের সাম্প্রদায়িক লেখনী পড়ানো হচ্ছে।

সেই সাথে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি, ট্রানজিট ইত্যাদির মাধ্যমে পাকাপোক্ত করা হয়েছে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ। দেশের মিডিয়াগুলো প্রায় একচেটিয়াভাবে ভারতের দালালি করে যাচ্ছে। দেশের পুঁজি বাজার, পণ্য বাজার এবং অর্থনীতিও চলে গেছে ভারতীয় চক্রের হাতে।

ভারতীয় দাদাদের পুতুল ও মহামূল্যবান এজেন্ট 'মুরতাদ' শেখ হাসিনা ও তার তাগুত সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, ভারত মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী ও বঙ্গবন্ধুর চেতনা-এইসব সস্তা স্লোগান তুলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে অর্থ ও ক্ষমতার লোভে আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী ভারতের কাছে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে।

মোটকথা বাংলাদেশকে নামেমাত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে রেখে একে সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপনিবেশে পরিণত করার প্রক্রিয়া তাগুত হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ১১ বছর ধরে গুছিয়ে এনেছে ভারত। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্ম ও স্পর্ধা এতদূর পৌঁছেছে যে, নিজেদের অনুগত আওয়ামী লীগ এবং হাসিনাকেও এখন আর তোয়াক্কা করছে না। দীর্ঘদিন ধরে শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতির পর হিন্দুরা বর্তমানে সর্বসম্মুখে তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে চলেছে এবং খোলাখুলিভাবে মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ করছে।

বাংলাদেশ দখলের প্রস্তুতি যখন শেষ পর্যায়ে, এখন তারা নানাভাবে এদেশের মুসলিমদেরকে উস্কানি দেয়ার প্রচেষ্টা করছে, যাতে করে মুসলিমরা প্রতিবাদ করে হিন্দুদের উপর চড়াও হয় ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে আর হিন্দুত্বাবাদী ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে আক্রমণ করার একটি শক্তিশালী অজুহাত পেয়ে যায়। একারণে তারা বিভিন্ন মসজিদের হামলা করছে, নামাজের সময় উঁচু আওয়াজে লাউড-স্পিকারে গানবাদ্য বাজাচ্ছে, নিজেদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে মুসলমানদের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে, স্কুল-কলেজগুলোতে মুসলিম বাচ্চাদের হারাম প্রসাদ খাওয়াচ্ছে, তাদেরকে 'হরে রাম, হরে কৃষ্ণ' স্লোগান দেয়ানো হচ্ছে, ইসকনপন্থী স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব-নিক্বাব পরায় বাঁধা দিচ্ছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় গরু জবাই করতে বাধা দিচ্ছে, সর্বোপরি একজন মুসলমানের অন্তরের সর্বাপেক্ষা দুর্বল স্থান, একজন মুসলিমের হৃদস্পন্দন- আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল ﷺ এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান নিয়ে কটাক্ষ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে, মূর্তির পায়ের নিচে কুরআন কারীম রেখে কুরআনের অবমাননা করছে।

এসব ইস্কানির মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীরা বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। এখন যদি মুসলিমরা কোনো পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করে তাহলে হয়ত হিন্দুত্ববাদীরা একটি দাঙ্গা বাঁধাবে। এ দাঙ্গার আড়ালে ভারতীয় এজেন্টদের মাধ্যমেই হিন্দুদের মন্দির, বাতিঘরে আক্রমণ করা হবে, আগুন দেয়া হবে। তখন ভারত বিশ্ববাসীকে বুঝাবে, বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচার তীব্র পর্যায়ে পৌঁছেছে। এবং এই অজুহাত দেখিয়ে তারা বাহিনী পাঠিয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(Tor Browser ব্যবহার করে বিস্তারিত পড়ুন: বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের এক নতুন ও বিপজ্জনক পর্যায়

পর্ব-০১: https://bit.ly/3KuInnI ;

পর্ব-০২: https://bit.ly/3TjMW8u ;

"গভীর সংকটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ" লিংক- https://bit.ly/3L7hW7T

"বাংলাদেশ ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট" ভিডিও লিংক- https://bit.ly/3TZeAYS)

গাযওয়াতুল হিন্দের ডাক:

প্রিয় ভাই! মালাউন হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্মের কথা একটু চিন্তা করি। সে সাথে চিন্তা করি, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলিমদের উপর চলমান ও ক্রমান্বয়ে ঘনায়মান এই 'মহাবিপর্যয়' প্রতিরোধের জন্য আমার আপনার প্রস্তুতি কতটুকু। হিন্দুত্ববাদীরা যখন আমাকে আপনাকে, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যার প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জতের উপর আক্রমণের সর্বাত্মক প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে, সেখানে আমি আপনি এই মহাপ্রলয় প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করেছি কি?

বাংলা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত, আসাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত, গুজরাট থেকে অযোদ্ধা পর্যন্ত, আমাদের দৃষ্টির সামনে চলমান হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন, যেখানে প্রতিনিয়ত লক্ষ হাজার মুসলিমের তাজা খুন ঝরছে, যেখানে লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত হানি করা হচ্ছে, হিন্দের ভূমি থেকে মুসলিমদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে, মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করার মিশন এগিয়ে যাচ্ছে সীমাহীন গতিতে, এর বিপরীতে আমাদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা আশানুরূপ এগিয়েছে কি??

হায়! আমাদের গাফলতি, আমাদের অলসতা দেখে হয়ত শয়তানেরও হাসি পায়!! কবি বলেন-

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم   يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

আল্লাহর দ্বীনের লক্ষ্য কি এটাই যে, তোমরা নিজেদের গোঁফ ছাঁটাই করবে,
হে জাতি! তোমাদের অজ্ঞতায় অন্যান্য জাতিরা হেসেছিল!!

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করুনতো- যদি পাড়ার কোনো মাস্তান আপনাকে হত্যার হুমকি দেয়; আপনার আদরের সন্তানকে জবাই করার ঘোষণা দেয় বা আপনার অতি স্নেহের কন্যা সন্তানকে অপহরণ করে ধর্ষণের বার্তা পাঠায়; অথবা আপনার পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে ধর্ষণ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা আপনি কোনোভাবে জেনে যান; কিংবা ধরুন আপনি জানতে পারলেন যে, এলাকার বখাটে লোকজন বা আপনার কোনো এক শত্রু আগামীকাল আপনার

বাড়ি আক্রমণ করে আপনার সারাজীবনের কষ্টে গড়া বাড়িটি বোলডোজার দিয়ে ভেঙে দিবে বা আগুন জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে; এবং আপনি দেখলেন যে, আপনার দুশমন সেই দুষ্কৃতিকারীগণ আপনার উপর হামলা করার জন্য আপনার চোখের সামনেই প্রস্তুতি নিচ্ছে, আপনাকে হত্যার সরঞ্জাম আপনার চোখের সামনে দিয়েই সংগ্রহ করছে, ও আমার ভাই, আপনি তখন কী করবেন??? একটু চিন্তা করে জবাব দিন।

আপনি কি তখন এটা চিন্তা করবেন, যা হবার আগে হোক, যা কিছু ঘটার আগে ঘটুক, আগে আক্রমণ হোক পরে দেখা যাবে; নাকি ভাববেন, আরে ধুর, এগুলো নিছক হুমকি-ধমকি, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না; নাকি ভাববেন, আমার শাইখ, আমার পীর, কিংবা আমার উপর যত উলামায়ে কেরাম আছেন তারা যখন বলবেন -তুমি এ বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, তখন আমি এ বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবো। না! ভাই এগুলোর একটাও তখন আমি বা আপনি কেউ করবো না।

তাহলে তখন কী করব?? হয়তো আত্মগোপন করব, নতুবা পুলিশকে খবর দিব, থানায় জিডি করব, পরিবার পরিজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলব ইত্যাদি। এককথায় এই বিপদ থেকে বাঁচার বা মোকাবিলা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।

তাহলে ভাই!

আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা আমাকে, আপনাকে হত্যা করার জন্য প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে?

আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা কেবল আমাকে আর আপনাকেই নয়, আমাদের সন্তান-সন্তুতি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সকল মুসলমান নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করে 'জাতিগত নিধনের' মাধ্যমে হিন্দুস্তানের মাটি থেকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে??

মালাউন হিন্দুত্ববাদীরা ইতোপূর্বে আমাদের মা-বোনদের সাথে কেমন আচরণ করেছিল সেকথা কি আমরা ভুলে গিয়েছি?? তারা কি এখন এর চেয়ে উত্তম আচরণ করবে আমাদের শ্রদ্ধেয় মা-বোনদের সাথে, আমাদের নয়নের মণিদের সাথে???

আমরা কি আমাদের চোখের সামনে মালাউনদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার দৃশ্য দেখছি না???

আফসোস! আমাদের প্রস্তুতি কোথায়??? কোনরূপ প্রস্তুতি ছাড়া আমরা কিভাবে এই প্রলয়ঙ্করী আগ্রাসনের মোকাবেলা করব ভাই???

আমরা কি ভাবছি, আগে আক্রমণ হোক, পরে দেখা যাবে, বা পরে জিহাদ করব?? কেন ভাই এই আত্মপ্রবঞ্চনা??? কেন ভাই নিজেকে এই ধোকা দেওয়া??? প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধ জয় হয়, এমন কথা শুনেছেন কোথাও?? এটা তো আল্লাহ পাকের সুন্নাহ না!!!

নাকি আমরা ভাবছি, গাযওয়াতুল হিন্দ অনেক দূরে, বহু দূরে, কমপক্ষে আমার জীবদ্দশায় আমি পাব না???

ভাই, একটি যুদ্ধ বাঁধতে কি হাজার বছর সময় লাগে, নাকি শত বছর??

সত্তর বছরের আগের ফিলিস্তিনের কথা চিন্তা করুন; চিন্তা করুন, সেসময়ের মুসলিমদের দুনিয়াদারীর কথা। সেই রঙিন স্বপ্নগুলো আজ কোথায়?? অভিশপ্ত ইহুদীবাদের আগ্রাসন নিমিষেই কি সব শেষ করে দেয়নি???

বেশি দূর যাবার দরকার নেই। বিশ বছর আগের ইরাক কিংবা সিরিয়ার কথাই স্মরণ করুন। কোথায় গেল তাদের ক্যারিয়ারের স্বপ্ন, 'সোনার হরিণ' একটি চাকুরির অভিলাষ, কোথায় গেল শহরের একটি ফ্ল্যাট কিংবা একটি বাড়ির জন্য আজীবনের সাধনা??? সব কিছুই কি এক পলকেই নিঃশেষ হয়ে গেল না??? ক্রুসেডার আক্রমণের মুখে সকল স্বপ্নই কি দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হয়ে গেল না?? আর এগুলো হতে কি হাজার বছর সময় লেগেছে, নাকি শত বছর?? কয়েক

দিন আগের সাজানো গোছানো ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া চোখের পলকেই কি জাহান্নামে রূপ নেয়নি?? আপনি কি বোন ফাতিমা নূর আর আফিয়া সিদ্দিকীর আর্তনাদ শুনেননি??

আমরা কি ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস পড়িনি?? জিহাদী দুর্বলতার সুযোগে যুগে যুগে আমরা কিভাবে গণহত্যার শিকার হয়েছি??

হিন্দুস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে চুপচাপ বসে থাকা, জিহাদের প্রস্তুতি না নেয়া, ‘গাযওয়াতুল হিন্দ’কে দুরবর্তী মনে করা ‘অপরিণামদর্শিতা’ ও ‘অদুরদর্শিতা’র পরিচায়ক। এটা যেন সেই ডাহুকের অবস্থা, যে শিকারী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে চোখ বন্ধ করে রাখে, আর মনে করে, আমি যেহেতু কাউকে দেখছি না, বোধ হয় আমাকেও কেউ দেখছে না। আমরা যতই চুপচাপ বসে থাকি, বা জিহাদ থেকে হাত গুটিয়ে ছলনাময় আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকি, হিন্দুত্ববাদীরা কিন্তু বসে নেই; তারা কিন্তু ঠিকই প্রতিনিয়ত ‘গাযওয়াতুল হিন্দ’ এর ডাক দিয়ে যাচ্ছে। তারা ইতোমধ্যেই মুসলিমদের উপর সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরু করে দিয়েছে, প্রতিদিনই ভারতের আনাচে কানাচে মুসলিমদেরকে হত্যা, গুম, অত্যাচার আর মা-বোনের সম্ভ্রমহানির খবর কানে আসছে; আর অন্যদিকে আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছি।

হ্যাঁ ভাই, আমরা ঘুমাচ্ছি। আর আমরা যদি এখনো সচেতন না হই, তাহলে জেনে রাখুন, আমাদের এই অপ্রস্তুতির পরিণামে আমাদেরকে অবশ্যই হিন্দুত্ববাদীদের ‘বলির পাঠা’ হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করব বা কী প্রস্তুতি নিব???

হ্যাঁ ভাই, এখন আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। যেমনটি আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেছেন-

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আল আনফাল ০৮:৬০)

আর আমাদের জন্য এই শক্তি সঞ্চয়ের প্রথম ও প্রধান ধাপ হল- জামাতবদ্ধ হওয়া। এরপর জামাতবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা। হিন্দুস্তানের সকল মুসলিমকে জিহাদের এক পতাকার নীচে চলে আসতে হবে, ইনশাআল্লাহ। এটাই এখন আসল কাজ। তাই আমাদেরকে মুজাহিদ ভাইদের সেই হক জামাত তালাশ করতে হবে, যারা এই মালাউনী আগ্রাসন থেকে উম্মাহকে বাঁচাতে দিনরাত ছটফট করছেন, যারা উম্মাহর মা-বোনের হেফাযতের জন্য দিন-রাতকে একাকার করে দিচ্ছেন, যারা এই হিন্দের ভূমিকে নাপাক শিরকমুক্ত করার মিশন নিয়ে দিবানিশি ফিকির ও প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন দুর্বার গতিতে, যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা করে অহর্নিশি জনশক্তি ও অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আসুন! আমরা সততা ও সত্যবাদীতার সাথে সেই মোবারক কাফেলার সন্ধান করি এবং জুড়ে যাই। ভাইদের শক্তিবৃদ্ধি করি, ভাইদের জামাত ভারী করি, ভাইদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করি, নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সৈনিক হিসেবে পেশ করি, মৃত্যুর শপথ নেই। মুজাহিদ ভাইয়েরা আমাদের যেভাবে গড়ে তোলেন আমরা সেভাবে গড়ে উঠি। এটি এখন সময়ের নাজুকতার দাবী!

মুজাহিদ ভাইদের হক জামাতে যোগদানের আগ পর্যন্ত আমাদের আশেপাশে যদি কোনো মুজাহিদ আলেম থেকে থাকেন তার সাথে পরামর্শ করে নিজেকে সার্বিকভাবে তৈরি করতে থাকা, ইনশাআল্লাহ।

যারা এখনো হক জামাত তালাশ করে খোঁজে পাইনি তাদের করনীয় সম্পর্কে নিচের কিতাবটি পড়তে পারেন- কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল, দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ; "তাহলে বর্তমানে আমরা কিভাবে জিহাদ করব বা জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হবো?" অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কিতাবের লিংক: https://bit.ly/tahrid2

প্রিয় ভাই, হিন্দুত্ববাদী মালাউনরা যদি 'মিথ্যা' ও চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাওয়ার জন্য নিজের জীবন বাজি লাগাতে পারে, মৃত্যুর শপথ নিতে পারে, তাহলে আমরা কেন 'সত্য' ও অনন্তকালের জান্নাতের জন্য মওতের বাইয়াত হতে পারবো না।

হ্যাঁ ভাই! যদিও আমরা প্রস্তুতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছি, তথাপি আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। সাধ্যমত সর্বাত্মক প্রস্তুতি চালিয়ে যেতেই হবে, ইনশাআল্লাহ। হতাশ হয়ে বসে পড়লে আমরা হেরে যাব। অন্যথায় শিরক ও তাওহীদের এই লড়াইয়ে বিজয় আমাদেরই হবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূলে আরাবী ﷺ চৌদ্দশত বছর আগেই এই যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বানী করে গিয়েছেন; শির্কপন্থীদের সাথে তাওহীদপন্থীদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী, সর্বশেষ সিদ্ধান্তমূলক একটি যুদ্ধের। যার শেষ হবে- অভিশপ্ত হিন্দুদের হাত থেকে মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার, দিল্লীর লালকেল্লায় কালিমার পতাকা উড্ডয়ন আর ভারতবর্ষকে হিন্দু ও হিন্দুয়ানী শিরকমুক্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু এর আগে রক্ত দিতে হবে কোটি কোটি তাওহীদপন্থীদের, নাম লিখাতে হবে শেষ যামানার সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদদের খাতায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের (ভারত অভিযানের) ওয়াদা দিয়েছেন। যদি আমি তা (ঐ যুদ্ধের সুযোগ) পাই, তা হলে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করব। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তাহলে আমি শহীদের মধ্যে উত্তম সাব্যস্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবূ হুরায়রা।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৩, ৩১৭৪)

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোলাম ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম (আঃ)-এর সঙ্গে থাকবে।" (সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৫)

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذكر الهند: " يغزو الهند بكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوبهم، فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام."

- نعيم- كتاب كنز العمال - نزول عيسى عليه الصلاة والسلام-

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্থানের আলোচনায় বলেছেনঃ "তোমাদের একটি দল হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিজয় দান করবেন, এমনকি তারা সেখানের শাষকদেরকে গলায় বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন, অতঃপর তাদের ফিরে আসার সময় হলে তারা ফিরে আসবে ও শামে ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাবে।" (সহীহ কানযূল উম্মাল)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে গাযওয়াতুল হিন্দের মোবারক জিহাদে শরীক হওয়ার ও শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

একাদশ অধ্যায়: আরাকান/রোহিঙ্গাদের ইতিহাস

আরাকান রাজ্য ও রোহিঙ্গা পরিচিতি:

ভাগ্যদুর্বিপাকে বার্মা তথা মায়ানমারের দখলে চলে যাওয়া "আরাকান" তথা "রাখাইন রাজ্য"টি আসলে একটি স্বতন্ত্র দেশ ছিল; আর রোহিঙ্গা বা আরাকানীরা হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জাতি। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এ রাজ্যটি ৩৯৮ মাইল দীর্ঘ এবং ৬০-৩০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বার্মার সাথে বলতে গেলে এর কোনো প্রাকৃতিক সংযোগও নেই। বিশাল "আরাকান পর্বতমালা" একে প্রাকৃতিকভাবে মায়ানমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বরং ভৌগলিক অবস্থান, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এরা বাংলাদেশ ও বাঙালীদের কাছাকাছি। বোঁচা নাকের বার্মিজদের সাথে তাদের কোনো মিলও নেই।

একসময় আরাকান রাজ্যটি আমাদের চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে আমাদের পূর্ব দিকে অবস্থিত আসাম প্রদেশের পাঁচটি কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং সে যুগে এ দেশ থেকে ও দেশে যাওয়া-আসা করা এবং নিজেদের সুবিধামত অভিবাসন গ্রহণেও কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। তাই ঘন জঙ্গলাকীর্ণ আরাকান থেকে বৌদ্ধ মগরা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলিকে অভিবাসনের উৎকৃষ্ট স্থান রূপে বেছে নেয়।

রাখাইন রাজ্যের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ। তার মধ্যে প্রায় পনের লাখ মুসলমান রোহিঙ্গা, অল্প কিছুসংখ্যক বাঙালী হিন্দুও রয়েছে। অবশিষ্টরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের অধিকাংশই ভারতবর্ষে আর্য তথা বর্ণবাদী হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আরাকানে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য এদের মধ্যে মূল বার্মা থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিবাসিত প্রচুর বার্মিজ বৌদ্ধও রয়েছে।

রোহিঙ্গাদের আদি পুরুষরা হচ্ছেন আরব মুসলিম বণিক। ঐতিহাসিকরা অষ্টম শতাব্দী থেকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উৎস আবিষ্কার করেছেন। নবম থেকে চৌদ্দশত শতাব্দী পর্যন্ত আরবরা এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তারা ব্যবসার পাশাপাশি এই অঞ্চলে ইসলামও নিয়ে এসেছিল। কথিত আছে, আরাকানের সমুদ্রোপকূলে তাঁদের জাহাজডুবি হলে 'রহম রহম' বলে তাঁরা বাঁচানোর জন্য আহ্বান করেছিলেন; তাই স্থানীয়রা তাদের রোহিঙ্গা নামকরণ করে (যদিও 'রোহিঙ্গা' নামকরণের কারণ হিসেবে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়)। এদেশে বিয়ে-শাদী করে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং এভাবে আরাকানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠে।

- **আরাকানে মুসলিমদের প্রভাব:**

ভারতবর্ষে যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয়, আরাকান ছিল বাংলার অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত এলাকা। মোগল শাসনামলে এই জাতিটি ডজন খানেক স্বাধীন বৌদ্ধ রাজা কর্তৃক শাসিত হলেও এরা মোগল শাসকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল। আরাকানের রাজদরবারে মুসলমান

এবং হিন্দুদেরও সমান কদর ছিল। অনেক মন্ত্রী-সান্ত্রীও মুসলমান ছিল। বাংলা কাব্যের আদিপর্বের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল, দৌলত কাজী, 'নবীবংশ' গ্রন্থখ্যাত সিলেটের সৈয়দ সুলতান ও তাঁর ভাই সৈয়দ মূসা আরাকান রাজসভার অলংকারস্বরূপ ছিলেন। ১৪৩০ সালে রাখাইলামা নামে একজন বৌদ্ধ রাজা বাঙালি মুসলিমদেরকে দাওয়াত দিয়ে আরাকানে নিয়ে গিয়েছিল।

এমনকি মায়ানমারের গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী অং সাং সুচির পিতা, মায়ানমারের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ অং সাং এর রাজনৈতিক গুরু যিনি ছিলেন তিনিও একজন মুসলিম ছিলেন। অং সাং এর সাথে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম নেতাও ছিলেন, যারা অং সাং এর মন্ত্রীসভায়ও স্থান পেয়েছিলেন।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-শিক্ষকও মুসলমান ছিলেন। মাওলানা যাফর আহমাদ উছমানী রাহ., মুফতী দীন মোহাম্মাদ খান রাহ., পাকিস্তানী পীর তায়্যিব শাহর পিতা মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ রাহ. প্রমুখ উলামায়ে কেরাম সুদীর্ঘকাল রেঙ্গুনে ছিলেন। রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত হত উর্দু মাসিক 'ইস্তেকলাল' পত্রিকা।

- **বৃটিশ শাসনামলে আরাকানঃ**

১৭৫৭ সালে যখন বৃটিশরা বাংলা দখল করে নেয় তখন আরাকান বাংলা থেকে আলাদা হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৭৮৪ সালে বোদাপেই (Bodawpay) নামের এক বার্মিজ রাজা স্বাধীন রাজ্য আরাকানে আক্রমণ করে এবং আরাকান দখল করে নেয়। বার্মিজ রাজার আক্রমণ থেকে বাঁচতে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরনার্থী পালিয়ে এসে বাংলায় আশ্রয় নেয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হিরাম কক্স নামে এক বৃটিশ কুটনৈতিককে বিষয়টি মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করে। বর্তমান কক্সবাজারে তখন রোহিঙ্গারা পালিয়ে এসেছিল। তার লক্ষ্য ছিল, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, আর শরনার্থীদেরকে পতিত জমিতে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করে দেয়া,

এবং ব্যবসা ও আয়কর আদায়ের জন্য একটি বাজার স্থাপন করে দেয়া। আর হিরাম কক্স এর নামানুসারেই ‘কক্সবাজার’ নামকরণ করা হয়।

অবশেষে বৃটিশ বার্মিজ যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮২৪ থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে বৃটিশরা আরাকানসহ সমগ্র বার্মা দখল করে নেয়।

বৃটিশদের বার্মা দখলের পর বার্মা ও আরাকান বৃটিশ ভারতবর্ষের প্রদেশ হয়ে যায়।

এই সময় বৃটিশরা বাংলা ও ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক অভিবাসীকে আরাকানে স্থানান্তরিত হতে উৎসাহিত করে। বৃটিশরা এই স্থানান্তরকে আভ্যন্তরীণ হিসেবে দেখলেও অনেক বার্মিজ তা করেনি।

- **বিশ্বযুদ্ধের সময় রোহিঙ্গাদের অবস্থাঃ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান বার্মায় আক্রমণ করে। প্রথমদিকে বার্মিজ জাতীয়তাবাদীরা জাপানকে সমর্থন করেছিল। বিপরীতে রোহিঙ্গা মুসলিমরা বৃটেনকে সমর্থন করেছিল। কারণ বৃটেন ওয়াদা দিয়েছিল, আরাকানকে বার্মা থেকে আলাদা করে মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র বানিয়ে আরাকানকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। যুদ্ধের শুরুতে যখন বৃটিশরা পিছু হটতে থাকে এবং জাপানিজরা অগ্রসর হয়, এর ফলে রোহিঙ্গারা বার্মিজদের দ্বারা আক্রমনের শিকার হয় এবং ঘরবাড়ি হারা হয়ে যায়। বার্মিজ বৌদ্ধদের অভিযোগ ছিল, মুসলিমরা বৃটিশ শাসন দ্বারা অন্যায়ভাবে উপকৃত হয়েছে। ১৯৪৫ সালের মধ্যে বৃটিশরা আবারো বার্মিজ জাতীয়তাবাদী ও রোহিঙ্গা সৈনিকদের সহায়তায় বার্মাকে পুনরায় জাপানিজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের পর বৃটিশরা তাদের প্রতিশ্রুত ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং রোহিঙ্গারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়। বৃটেন আরাকানকে আলাদা রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা বাস্তবায়ন করেনি। এটি কুফ্ফারদের সর্বকালের একটি চরিত্র। ইতিহাসের পাতায় পূর্বেও আমরা এমনটি দেখে এসেছি। তারা কখনোই মুসলমানদের সাথে কৃত

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। কেননা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো আর ভুল বলেননি,

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٨

"কিরূপে (মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ্‌র নিকট ও তাঁর রাসূলের নিকট বলবৎ থাকবে)? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দিবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।" (সূরা তাওবাহ ০৯: ০৮)

প্রিয় ভাই! তার পরেও কেন আমরা বারবার একই ধোকা খাই? আমাদেরকে একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, মুসলিমদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইজ্জত ও সম্মান কখনোই কুফ্ফারদের সহায়তায় বা তরীকায় অর্জিত হয়নি, কখনো হবেও না। কুফ্ফারদের ঘাড়ে পা রেখে স্বাধীনতার স্বর্ণ সোপানে আরোহন করার আকাঙ্ক্ষা 'দিবাস্বপ্ন' বৈ কিছু নয়। তাই মুসলিম উম্মাহকে সব সময় 'নববী মানহাজ' অনুসরণ করে নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রাম নিজেদেরকেই করতে হবে। কুফ্ফারদের সাহায্য সহযোগিতা আর প্রতিশ্রুতির গোলক ধাঁধাঁয় পড়া যাবে না।

- **ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা ও আরাকানকে বাংলার সাথে যুক্ত করার আবেদনঃ**

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন হতে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার এক বছর পরই ১৯৪৮ সালে বার্মাও স্বাধীনতা লাভ করে। সেই সময় অনেক রোহিঙ্গা চেয়েছিল আরাকানকে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর সাথে যোগ দিতে।
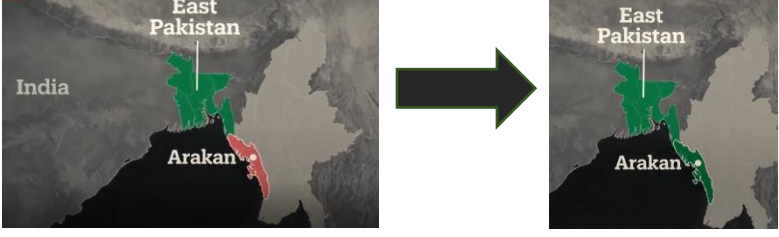
তখন বার্মার নতুন সরকার এতে ভেটো প্রদান করে ঘোষণা করে যে, রোহিঙ্গারা আরাকানের অবৈধ অভিবাসী। এর ফলে শুরু হয় সরকার ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে উত্তেজনা। সরকার রোহিঙ্গাদের আন্দোলনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং ১৯৪২ সালে ঘরবাড়ি হারানো রোহিঙ্গাদেরকে তাদের গ্রামে পুনর্বাসিত করতে অস্বীকৃতি জানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশদেরকে সমর্থন করায় জাপান ও বার্মিজ সৈন্যরা রোহিঙ্গাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ঐসময় শরনার্থী হিসেবে আগত রোহিঙ্গাদেরকে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। এদিকে বার্মিজ সরকার তাদের ভিটা-মাটি ও সম্পত্তি কুক্ষিগত করে নেয়। পরবর্তীতে আরো রোহিঙ্গাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়। রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে সরকারি পদ থেকে বহিস্কার করা হয় এবং তদস্থলে রাখাইন বোদ্ধদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়।

- **আরাকানের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু:**

১৯৫০ এর দশকে রোহিঙ্গা মুসলিমরা সরকারিভাবে বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। এজন্য কিছু রোহিঙ্গা মুসলিম স্বাধীনতার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। আর তখন বার্মিজ সরকার রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালায়। সরকার রোহিঙ্গাদের আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং তাদের সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আরাকান স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হবার অন্যতম কারণ হল- বিদ্রোহী আরাকানীদেরকে সহযোগিতা করতে মুসলিম বিশ্বের কেউই এমনকি প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)-ও তাদের মুসলিম ভাইদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেনি।

- **বার্মায় সামরিক শাসনের শুরু:**

বার্মায় ১৯৬২ সালে প্রতিরক্ষা বাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জেনারেল নে উইন 'বার্মা সমাজতান্ত্রিক প্রোগ্রাম পার্টি'র মাধ্যমে বার্মাকে একনায়কতন্ত্রের বার্মায় পরিণত করে। তখন বার্মার সামরিক জেনারেলরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং বিলুপ্ত করে দেয়। ১৯৭৭ সালে রোহিঙ্গাদের জন্য পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায়। বার্মা জেনারেলরা ১৯৭৭ সালে 'অপারেশন নাগামিন' ও 'অপারেশন ড্রাগন কিং' শুরু করে। বহিরাগত নাগরিকদেরকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই অভিযানগুলো পরিচালনা করা হয়েছিল। অথচ বার্মায় কোনো বহিরাগত নাগরিকই ছিল না। বহিরাগতদের নাম করে টার্গেট করা হয়েছিল আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমদের। তখন বার্মিজ সেনাবাহিনী ব্যাপকহারে হত্যা ও ধর্ষণের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার শুরু করে। এর ফলে প্রায় দুই লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান পালিয়ে চলে আসে বাংলাদেশে। তখন বার্মার সামরিক জান্তা বলেছিল, রোহিঙ্গারা পালিয়ে যেহেতু বাংলাদেশে যায়, এটি প্রমাণ করে তারা বার্মায় বে-আইনী ছিল। তাদের বাংলাদেশে গমন আরো বেশি প্রমাণ করে যে, তারা বাংলাদেশি। ঐ সময়কার বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ও বার্মার সাথে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে একটি চুক্তি করে, যাতে বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থী পুনরায় বার্মায় ফিরে যেতে পারে।

- **১৯৮২ সালের বার্মিজ নাগরিকত্ব আইন (Burmese Citizenship Act' 1982) :**

১৯৮২ সালে বার্মার সামরিক জেনারেলরা একটি নতুন বার্মিজ নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করে। এখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল বার্মিজ লোকদেরকে বার্মার নাগরিকত্ব দেয়া হয়। কিন্তু রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি। বৃটিশ শাসনের পর যারা বার্মায় এসেছিল তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি। যদিও রোহিঙ্গারা দীর্ঘকাল ধরে বহু শতাব্দী আরাকানে বসবাস করছে, তথাপি এই আইনটি রোহিঙ্গাদের উপর আরোপ করা হয়। এরপর রোহিঙ্গারা নাগরিকত্বের

জন্য আবেদন করলে, তাদেরকে জানানো হয় যে, রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া হবে, যদি তারা প্রমাণ করতে পারে যে, তারা ১৮২৪ সালের আগে থেকে বার্মায় বসবাস করছে। ২০০ বছরের আগের পরদাদার আমলের কাগজপত্র কারোও কাছেই থাকেনা। আর এভাবেই সকল রোহিঙ্গাদেরকে কুফ্ফার বার্মিজ সরকার এক কুটকৌশলের মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রহীন করে দেয়।

- **রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপরে বার্মার অত্যাচারের নমুনা!**

রোহিঙ্গাদেরকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত মানুষ (World’s most persecuted people)।

১৯৯১ সালে বার্মিজ সরকারের অত্যাচারের ফলে আবারো দুই লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। অথচ নব্বই এর দশকের শেষের দিকে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার রোহিঙ্গাকে বার্মায় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল ‘প্রত্যাবাসন চুক্তি’র মাধ্যমে।

২০০৪ এর দিকে এই রাখাইন তথা আরাকান রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়। তেল, গ্যাস, বিশেষকরে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আছে বলে ভূ-তত্ত্ববিদগণ বলেছেন। তাছাড়া এই এলাকায় প্রচুর বিনিয়োগ করেছে চীন, রাশিয়া ও ভারত। এজন্য ২০০৮ এ মিয়ানমার সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে যে, আরাকানে তারা নানাবিধ উপযোগী অর্থনৈতিক প্রকল্প গড়ে তুলবে। তখন থেকেই তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এই এলাকাটিকে জনশূন্য করা হবে। সে কারণে তারা পরবর্তীতে রোহিঙ্গাদের উপর যে বর্বরোচিত গণহত্যা চালায় তার নামও রাখে “অপারেশন এরিয়া ক্লিয়ারেন্স” (Operation Area Clearance)।

২০১১ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের পতন হয়েছিল। তবে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসলেও রোহিঙ্গা মুসলিমদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।

এদিকে মায়ানমারের বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা সাধারণ বৌদ্ধদের মাঝে 'উগ্র ও চরমপন্থী' বৌদ্ধ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এবং 'ইসলামোফোবিয়া' (ইসলাম বিদ্বেষ) ছড়াতে থাকে। তারা এই আন্দোলনের নাম দেয় '৯৬৯ আন্দোলন'। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ও প্রচারক ছিল কুখ্যাত আশিন ওয়েরাথু (Ashin Wirathu)। তার এই কুখ্যাত আন্দোলন সরকারিভাবে সমর্থন লাভ করে।

U Wirathu, leader of the radical 969 Movement

ওয়েরাথু মুসলমানদের সম্পর্কে বলে, "আপনি দয়া ও ভালোবাসায় পূর্ণ হলেও পাগলা কুকুরের পাশে ঘুমাতে পারবেন না।" সে আরও বলে, "আমরা দুর্বল হয়ে গেলে আমাদের দেশ মুসলমানদের অধিকারে চলে যাবে।"

অবশেষে, ২০১২ সালে বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ত্রাসীরা এবং সরকারি বাহিনী মিলে কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। উগ্রবাদী বৌদ্ধ সন্ত্রাসী ও বার্মিজ সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে পালাতে হয়েছিল অনেককেই।

রোহিঙ্গা গণহত্যা (২০১২)

টাইম ম্যাগাজিনের ২০১৩ সালের ২০ শে জুন প্রকাশিত প্রচ্ছদ রিপোর্টে ওয়েরাথুকে "বৌদ্ধ সন্ত্রাসবাদের চেহারা" (The Face of Buddhist Terror) বলে অভিহিত করা হয়।

বৌদ্ধ সন্ত্রাসী ও বার্মিজ বাহিনীদের প্রতিহত করতে এবং তাদের হাত হতে মজলুম মুসলিমদের হেফাযতের জন্য রোহিঙ্গা মুসলিমরা ভাই 'আতাউল্লাহ্'র

নেতৃত্বে ২০১৩ সালে 'হারাকাতুল ইয়াকীন' নামে একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে একে 'আরাকান রোহিঙ্গা সলভেশন আর্মি' (Arakan Rohingya Salvation Army; সংক্ষেপে ARSA) নামকরণ করা হয়।

২০১৬ সালেও বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ত্রাসীরা এবং সরকারি বাহিনী মিলে আরো কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

২০১৬ সালের অক্টোবরে, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত বরাবর বার্মিজ সীমান্তবর্তী কয়েকটি চেকপোস্টে 'হারাকাতুল ইয়াকীন' এর মুজাহিদ ভাইয়েরা হামলা করেন, যেখানে ৯ জন সীমান্ত কর্মকর্তা এবং ৪ জন সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠানো হয়েছিল।

২৫ আগস্ট, ২০১৭ সালে আরো কয়েকটি পুলিশ পোস্টে হামলা করে আরাকানের মুসলিম প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এবং তারা প্রায় ১২ জন বৌদ্ধ সন্ত্রাসী সৈনিককে হত্যা করতে সমর্থ হয়। অপরদিকে শাহাদাত লাভ করেন ৭৭ জন মুসলিম।

এই ঘটনার পর, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সরকারি সন্ত্রাসী বাহিনী মিলে শুরু করে কুখ্যাত "অপারেশন এরিয়া ক্লিয়ারেন্স" (Operation Area Clearance)। পুরো আরাকান জাহান্নাম হয়ে যায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য। ২০১৭ সালের পর প্রায় সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। যে সকল গ্রামে রোহিঙ্গা মুসলিমরা বসবাস করত ২০১৭ সালে বার্মিজ বাহিনী এবং ন্যাড়া বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা ৪০ শতাংশেরও বেশি অঞ্চল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। পরবর্তীতে সেখানে অনেক সরকারি স্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাগুত জাতিসংঘেরই ভাষ্যমতে, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার ছিল কোনো জাতিকে নির্মূলের একটি পাঠ্যপুস্তকের উদাহরণ। (https://bit.ly/3R3lR84)

এবং UNHCR এর মতে, মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা মুসলিম পুরুষদের হত্যা, শিশুদের জবাই, নারীদের ধর্ষণ, পুরো গ্রাম পুড়িয়ে দেয়ার মত অপরাধের সাথে জড়িত। সেনাবাহিনী দ্বারা পরিচালিত গণহত্যার কারণে রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে পালাতে বাধ্য করা হয়।

রোহিঙ্গা গণহত্যা

বর্তমানে পাঁচ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম উত্তর রাখাইনে বসবাস করছে, যারা যে কোনো সময় পুনরায় গণহত্যার শিকার হতে পারে।

সহস্রাধিক নিহত মুসলিম রোহিঙ্গার সাথে সাথে মাত্র ৮৬ জন হিন্দু বাঙালী নিহত হওয়ার পর আমাদের 'পরম বন্ধুরাষ্ট্র'(?) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বার্মা সফর করে সেখানকার সামরিক জান্তার সাথে মুসলিম নিগ্রহের বিষয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে এসেছে!

২০২০ সালের জানুয়ারিতে জাতিসংঘের তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত' মায়ানমারকে রোহিঙ্গা মুসলিমদের রক্ষা করতে লোকদেখানো নির্দেশ দেয়। তবে বার্মিজ সেনাবাহিনী বলছে, তারা নাকি রোহিঙ্গা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের টার্গেট করেনি। তারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর পরিচালিত গণহত্যাকে অস্বীকার করেছে।

সমাজতান্ত্রিক চীন ও রাশিয়া স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে, জাতিসংঘের অধিবেশনে মানবতাবিরোধী অপরাধের হোতা বার্মার নিন্দা করা যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব আসলে তারা অমানবিক ভুতুড়ে শক্তি প্রয়োগ করে তথাকথিত 'ভেটো' দিবে।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত, 'অশান্তির জননী' অং সাং সুচিও বার্মায় যে কোনো ধরণের গণহত্যাকে অস্বীকার করেছে এবং নৃশংস গণহত্যাটিকে 'আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহিংসতা' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আর অন্ধ জাতিসংঘও এই নির্জলা মিথ্যাচারটিকে মেনে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জাতিসংঘই কি আর বার্মাই কি, হিন্দুই কি আর বৌদ্ধই কি, আপনি ইহুদীদের কথাই বলেন, আর খ্রিস্টানদের কথাই ধরেন; মুসলিম নিধন ও মুসলিমদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে সকল কুফ্ফাররা এক, তাদের আদর্শ এক, তাদের নীতি এক- জিহাদীদেরকে (মুসলমানদেরকে) দুনিয়া হতে বিদায় করে দাও।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " الْكُفْرُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا" (رواه عبدالرزاق في مصنفه)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি. বলেন, "সব কাফির এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আমরা তাদের ওয়ারিস হইনা, তারাও আমাদের ওয়ারিস হয়না।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৯৫৭৪, ৯৮৫৫, ২৯৫০)

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন:

একথা যদি আমরা স্বীকার করেও নেই যে, রোহিঙ্গা মুসলিমরা বাঙালি; কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, খোদ মায়ানমারের ভিতরে ১৪৫ টির মত ছোট-বড় জাতিসত্ত্বা আছে। যেমনঃ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু, ইয়াহুদী, বিভিন্ন উপজাতি ইত্যাদি। তারাও তো কোনো না কোনো সময় সে দেশে অন্য জায়গা থেকে আগমন করে অভিবাসী হয়েছে। অবশ্য রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি শান, কাচিং ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীগুলোও বৌদ্ধদের বর্বরতার শিকার। তবে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হলো রোহিঙ্গা মুসলিমদের।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন??? কেন 'বহিরাগত অভিবাসী' ট্যাগ দিয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে টার্গেট করে ব্যাপকহারে গণহত্যা করা হচ্ছে?? কেন রোহিঙ্গাদেরকে 'রাষ্ট্রহীন' করা হয়েছে???

পনেরো লাখ রোহিঙ্গা মুসলিমের মধ্যে আট লাখ ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এসে বসবাস করছে। এক লাখ রয়েছে মালয়েশিয়ায়। পাকিস্তানের করাচীতেও বেশ কয়েক হাজার রোহিঙ্গা বহু পূর্ব থেকেই অবস্থান করছে। কিছু আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। সৌদী আরবে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা চার লাখের কম হবে না।

পৃথিবীতে 'কখনো অভিবাসী হয়নি' এমন জাতি কোথাও পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সকল উপজাতি বসবাস করে, তারা তো মাত্র ষোলশ শতাব্দীতে এদেশে আগমন করে। অথচ তারা পরিপূর্ণরূপে বাংলাদেশের নাগরিক।

যেহেতু রোহিঙ্গা মুসলিমরা শত শত বছর ধরে আরাকানে বসবাস করছে, নৃতত্ত্ব ও নাগরিকত্ব বিচারে তারা অবশ্যই মায়ানমারের নাগরিক হওয়ার দাবী রাখে। তাহলে, কেন রোহিঙ্গাদেরকেই কেবল নাগরিকত্ব দেয়া হবে না? কেন উচ্ছেদের সময় কেবল মুসলিমদেরকেই উচ্ছেদ ও বিনাশ করা হবে?

কারণ তো ভাই একটাই; রোহিঙ্গাদের অপরাধ তো কেবল একটাই। অন্যরা যখন বলে আমরা 'মুসলিম' নই, তখন রোহিঙ্গারা বলে 'আমরা মুসলমান'।

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۝٨ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ۝٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۝١٠

"তারা (কুফ্ফাররা) তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছে সবকিছু। যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।" (সূরা বুরুজ ৮৫:৮-১০)

দ্বাদশ অধ্যায়: ইহুদীদের ইতিহাস

ইহুদী জাতি ইসলাম ও মুসলিমদের সবচেয়ে পুরনো ও ভয়ংকর শত্রু। মুসলিম সমাজে ফিতনার বিস্তার, ইসলামী খিলাফাহ্‌র পতন ও ভবিষ্যতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাথে ইহুদীবাদের ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এটি বিবেচনায় অভিশপ্ত ইহুদীবাদের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। আল্লাহ্‌ তা'আলাই তাওফীকদাতা।

ইহুদীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দুইপুত্র হযরত ইসহাক আ. এবং হযরত ইসমাইল আ.। হযরত ইসহাক আ. এর সন্তান হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরদের বনি-ইসরাইল বলা হয়, কেননা ইয়াকুব আ. এর আরেক নাম 'ইসরাইল'।

ঐতিহাসিকভাবে 'বিক্ষিপ্ত' (১৯৪৭ এর আগ পর্যন্ত যাদের কোনো নিজস্ব রাষ্ট্র ছিল না, ফলে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল;) এই জাতিটির ইতিহাস মানেই ধোকাবাজি, হঠকারিতা, সীমালঙ্ঘন, চুক্তিভঙ্গ, ষড়যন্ত্র আর বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও দুশমনির ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে এগুলো তাদের জাতিগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। যে জাতিই এই কালসাপকে আশ্রয় দিয়েছে, তারা সেই জাতিরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। তাইতো তাদেরকে পর্তুগাল ও স্পেন থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ১২৯০ ঈসায়ীতে। ফ্রান্স থেকে দুইবার তাড়ানো হয়েছে, প্রথমবার ১৩০৬ সালে আর দ্বিতীয়বার ১৩৯৪ ঈসায়ীতে। তাদেরকে বহিস্কার করা হয়েছে বেলজিয়াম থেকে ১৩৭০ সালে আর যুগোস্লাভিয়া থেকে ১৩৮০ সালে। হল্যান্ড তাদেরকে দৌঁড়িয়ে দেয় ১৪৪৪ সালে এবং ইতালি দৌঁড়ায় ১৫৪০ সালে। জার্মানি দেশ থেকে বের করে দেয় ১৫৫১ সালে। রাশিয়া ওদেরকে দেশান্তর করে ১৫১০ ঈসায়ীতে। আর যদি আরো পূর্বের ইতিহাস দেখি একই অবস্থা দেখতে পাই, প্রতিটি যুগেই বহিষ্কার ও নির্বাসিত হওয়া এই জাতির নিয়তি ও ভাগ্য।

কুরআনে তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয়েছে!!! কখনো বা তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কঠোর যোদ্ধা বান্দাদের চাপিয়ে দিয়েছেন, ফলে ইহুদীরা নির্মম গণহত্যার শিকার হয়েছে; কখনো বা তাদেরকে বানরে পরিণত করে দিয়েছেন। এত কিছুর পরও এরা এই আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগে যে- তারা নাকি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় ও নির্বাচিত বান্দা; তারা নাকি আল্লাহ্‌র সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। এগুলো এজন্য যে, জাতিগতভাবে তারা এই বিশ্বাস লালন করে যে, (যা তাদের স্বহস্তে লিখিত ধর্মীয় গ্রন্থ 'তালমুদে' উল্লেখ রয়েছে)-

- অন্যান্য জাতির ধন-সম্পদ ইহুদিদের জন্য হালাল। কোনো ইহুদী যদি অন্যান্য জাতির কারো কোনো কিছু দখল করে নেয় সেটা অনুমোদিত।
- খোদা ইহুদীদেরকে নির্বাচন করেছেন অন্যান্য জাতির জীবন এবং সম্পদের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে।
- মানুষ যেমন পশুপাখির তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তেমনি ইহুদীরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। ইহুদীরা ব্যতীত অন্যান্যরা পশুর স্তরের।
- ইহুদীদেরকে খোদা নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন অ-ইহুদীদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করে। সুদ ছাড়া অন্যান্য জাতিকে ঋণ প্রদান করা খোদা নিষেধ করেছেন।

[Jewish Conspiracy & The Muslim World: https://bit.ly/jewscon]

ইসলামের সাথে ইহুদীদের শত্রুতার ইতিহাস:

ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নবুওয়তের যামানা থেকে ইহুদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে দুশমনি করে আসছে। কুরআনের ভাষায়, সকল জাতির মধ্যে ইহুদী আর মুশরিকরা ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন।

সীরাতুন্নবী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মদীনায় বসবাসরত বনু কুরাইযা, বনু নাযির এবং বনু কাইনুকা গোত্র কিভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -কে গালি দেয়া ও আম্মাজানদের নিয়ে কটুক্তি করা, নবীজি ﷺ-কে পাথর ফেলে দিয়ে কিংবা বিষ

প্রয়োগ করে হত্যা করার চেষ্টা করা, যাদু করা; মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহযাবের/খন্দকের যুদ্ধে বিভিন্ন জাতির ১২,০০০ সৈন্যকে একত্রিত করে মদীনা আক্রমণ করানো, চুক্তি ভঙ্গকরা, চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার কুরাইশ ও মুনাফিকদের সহযোগিতা করা; নারী সাহাবাদের উত্যক্ত করা ইত্যাদি।

এর ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করে দেন, চুক্তিভঙ্গকারীদের হত্যা করেন, শাতীমে রাসূলদেরকে গুপ্তহত্যা করান, মদীনা থেকে বিতাড়নের পর এরা খাইবারে চলে গেলে নবীজি ﷺ খাইবার অবরোধ করে জয় করেন এবং সেখান থেকেও তাড়িয়ে দেন।

নবীজীর ﷺ ওফাতের পর হযরত উসমান রাদি. এর সময় থেকে অদ্যাবধি তারা মুসলিম বিশ্বে একের পর এক ফিতনা ছড়িয়ে যাচ্ছে। ইহুদী আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবাহ মুসলমান সেজে মুসলমানদের মাঝে 'খিলাফতের উত্তরাধিকার' প্রশ্নে বিভক্তি সৃষ্টি করে, মুসলমানদের ঈমান আকীদা নষ্ট করে। যার ফলশ্রুতিতে উসমান রাদি. কে শেষ পর্যন্ত শহীদ হতে হয়।

হযরত আলী রাদি. এর সময় সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি এবং 'জঙ্গে জামাল', 'জঙ্গে সিফফীন' যুদ্ধ সংগঠিত করায় এই অভিশপ্ত ইহুদীরা।

এদের কারণেই হযরত আলী রাদি. শহীদ হন এবং খিলাফতে রাশেদার ইতি ঘটে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবার উত্তরসূরীরা মুসলমান বেশ ধরে পরবর্তীতে মুসলমানদের মাঝে ভ্রান্ত আকীদা ছড়াতে থাকে, জাল হাদীস রচনা করতে থাকে। এভাবে তারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কলুষিত করার প্রয়াস চালায়।

ইতিহাসে পরবর্তীতে যতবার মুসলমানদের উপর কোনো দুর্যোগ নেমে এসেছে, তার প্রায় প্রতিটির পিছনেই ইহুদীদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ মদদ ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে জাতিই দাঁড়িয়েছে, ইহুদীরা তাদের সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। খোলাফায়ে রাশেদার পতনের পর উমাইয়া এবং আব্বাসীদের পতন, ভারতে তুরানীদের পতন এবং সর্বশেষে উসমানী খিলাফতের পতন- সকল ক্ষেত্রেই ইহুদীরা পরিপূর্ণরূপে সক্রিয় ছিল, সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে তারা এ সকল ফিতনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা ধ্বংসের সাথে জড়িত ছিল।

মুসলিম উম্মাহ যেন পুনরায় জাগ্রত হতে না পারে, মুসলিম যুবকদের মাঝে জিহাদী চেতনা যেন জাগ্রত না হতে পারে, তাই মুসলিম যুব সমাজকে ধ্বংস করতে মুসলিম সমাজে গানবাদ্য, মাদক, পর্নোগ্রাফী ইত্যাদি ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস:

- ✓ হযরত দাউদ আ. ১০০০ খ্রিস্টপূর্বে এই অঞ্চল শাসন করতেন। তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান আ. মাসজিদুল আকসা নির্মাণ করেন। মসজিদুল আকসা জেরুজালেমে অবস্থিত। এই পবিত্র নগরীর আরেক নাম 'আল কুদ্‌স' বা 'ইলিয়্যা'।

- ✓ হযরত সুলাইমান আ. এর পর এই এলাকা অনেক জাতি শাসন করেছে। যেমন: আসীরিয়ান, ব্যবীলনীয়ান, পার্সিয়ান, গ্রীক, রোমান। এরপর ৬৩৭ ঈসায়ী সনে (১৬ হিজরি) হযরত উমর রাদি. এর খিলাফতকালে মুসলমানরা আল কুদ্‌স জয় করেন। এরপর ফাতিমি শিয়া (উবায়দি), তুর্কি সেলজুক, ক্রুসেডার, মিশরীয় মামলুক ইত্যাদি কর্তৃক শাসিত হয়েছে। ১৫১৭ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত আল কুদ্‌স উসমানী খিলাফাহ্‌র অধীন ছিল।

- ✓ **জায়নবাদী আন্দোলন (The Zionist Movement):** এটি ইহুদীদের একটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের জনক হচ্ছে থিওডোর হার্জেল। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে জেরুজালেম কেন্দ্রিক ইহুদী রাষ্ট্র 'ইসরাইল' প্রতিষ্ঠা করা এবং সারা পৃথিবী থেকে ইহুদীদেরকে ইসরাইলে একত্রিত করে। ১৯০১ সালে হার্জেল উসমানী খলিফা আব্দুল হামিদের সাথে দেখা করে ইহুদীদের জন্য জেরুজালেমে ভূমি দাবী করে। কিন্তু খলিফা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

- ✓ **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (World War I):** ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে উসমানীরা অক্ষ শক্তি (জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী)-র সাথে যোগ দেয়। এই যুদ্ধে 'মিত্র শক্তি' ছিল গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি এবং জাপান। এই যুদ্ধে অক্ষশক্তি পরাজিত হয় এবং প্রায় ১৬ মিলিয়ন (এক কোটি ছয় লক্ষ) সৈনিক এবং সাধারণ মানুষ মারা যায়।

- ✓ ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেম্স বেলফোর ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য একটি আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে 'বেলফোর ঘোষণা' (Balfour Declaration) উপস্থাপন করেন।

- ✓ ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে উসমানী খিলাফতের পতন হয় আর গ্রেট ব্রিটেন ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। কুফ্ফার বিশ্ব পৃথিবীতে তথাকথিত শান্তি(?) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯২০ সালে 'জাতিপুঞ্জ' (League of Nations) তৈরি করে। এটি (মূলত ইহুদী নিয়ন্ত্রিত এবং) ইহুদীবাদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে থাকে।

- ✓ কুফ্ফার জাতিপুঞ্জ ১৯২২ সালে 'বেলফোর ঘোষণা'র অনুমোদন প্রদান করে। কিন্তু আরবরা এই 'বেলফোর ঘোষণা' প্রত্যাখ্যান করে, কেননা এর মাধ্যমে ফিলিস্তিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

- ✓ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (World War II):** এরপর ১৯৩৯ সালে জার্মানির হিটলারের নাৎসী বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ৩০ টিরও অধিক দেশ জড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ ছয় বছর পর ১৯৪৫ সালে 'অক্ষশক্তি' জার্মানি, ইতালি এবং জাপানের পরাজয়ের মাধ্যমে রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন ইত্যাদি 'মিত্রশক্তি'র অন্তর্ভূক্ত ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এই যুদ্ধে ইহুদীরা মিত্র পক্ষের সমর্থক ছিল। এই যুদ্ধে চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষ মারা যায়। এই যুদ্ধেই জার্মানীর হিটলার এবং তাদের অন্যান্য অক্ষশক্তি মিলে প্রায় ষাট লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করে। ইতিহাসে একে 'হলোকস্ট' (Holocaust) বলে। জার্মানদের মতে এটিই হল 'ইহুদী প্রশ্নে সর্বশেষ সমাধান'। এই যুদ্ধেই জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টিতে আমেরিকা পারমানবিক বোমা হামলা চালিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে।

- ✓ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে পৃথিবীতে আবারো তথাকথিত শান্তি (?) প্রতিষ্ঠার জন্য কুফ্ফার বিশ্ব জাতিসংঘ (United Nations) প্রতিষ্ঠা করে। এটিও (মূলত ইহুদী নিয়ন্ত্রিত এবং) ইহুদীবাদের স্বার্থ রক্ষায় এবং বিশ্ব ব্যাপী ইহুদী এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করতে থাকে।

- ✓ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিন গ্রেট ব্রিটেনের কর্তৃত্বাধীন ছিল। এরপর ১৯৪৭ সালে ইহুদীরা ফিলিস্তিন দখল করে স্বাধীন 'ইসরাইল' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ইসরাইলকে দাপ্তরিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়।

- ✓ এই ঘোষণার পরপরই মিশর, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া এবং লেবানন এই অঞ্চলে হামলা চালায়, যাকে বলা হয় ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। পুরো ইসরাইলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আরো বেশ কয়েকবার ইসরাইলের সাথে সংঘাত সংগঠিত হয়।

- ✓ ২০২০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ১.৫২ কোটি; এর মধ্যে প্রায় ৪৬% (৯০লক্ষ) ইসরাইলে বাস করে।

ইহুদীদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

- ✓ ইহুদীরা যে কেবল ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করেই বসে আছে এমনটি নয়। তাদেরও লক্ষ্য সারা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যখন দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এরাই হবে তার ডান বাহু। বিশ্বব্যাপী দাজ্জালী ফেতনা ছড়ানোর মূল হোতা এবং নাটের গুরু এই অভিশপ্ত ইহুদী জাতি।

- ✓ ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্রের একটি নথি ফাঁস হয়ে যায়। একে বলা হয় "বিজ্ঞ ইহুদী গুরুদের প্রোটকল বা ষড়যন্ত্রের নীল নকশা"।

  [ডাউনলোড লিংক: https://bit.ly/3TqUwOU]।

  ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পুরো পৃথিবীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের যা যা কর্ম পরিকল্পনা তা এই নথিটিতে পাওয়া যায়। যদিও অনেকে এটিকে 'ইহুদীবাদ বিরোধী' মিথ্যা প্রপাগান্ডা বলে অভিহিত করে, কিন্তু এর সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো- নথিটি ফাঁস হওয়া থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা এই ছকের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এটি মূলত দাজ্জালী শাসন কায়েম করা এবং মানবজাতিকে ধ্বংস করার জন্য ইহুদীবাদের একটি ষড়যন্ত্রের ছক। এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে তারা তাদের প্রতীক্ষিত বাদশাহ দাজ্জালের একক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাকে বলা হয় 'বৈশ্বিক নতুন শাসনব্যবস্থা' বা New World Order। [FINAL WARNING:A History of the New World Order https://bit.ly/3CGpNaD]

- ✓ ইহুদীরা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করতে যুগে যুগে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, যারা বিভিন্ন নামে কাজ করে। যাদের নেতৃত্ব দেয় শয়তানপূজারী ইহুদী জাদুকর, শিল্পপতি এবং ব্যাংকাররা। যেমন: ব্যবীলনীয়ান ব্রাদারহুড, নাইট টেম্পলার, হাশাশিন, ফ্রী মেসন, ইলুমিনাতি, বিল্ডারবার্গ গ্রুপ, রোসিক্রুসিয়ান, স্কাল এবং বোন্স অর্ডার, বোহেমিয়ান গ্রুভ, এল্ডার্স অব জায়ন ইত্যাদি।

- ✓ পৃথিবীতে 'সুপার পাওয়ার' বলতে বর্তমানে আমরা দুটো ব্লককে বুঝি। এক. পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র এবং দুই. কমিউনিস্ট রাশিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গ। কিন্তু ভাই! আমরা কি জানি, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে এই দুই শক্তির উপরও আরেকটি শক্তি রয়েছে যারা উভয়কে 'হাতের পুতুল' বানিয়ে রেখেছে, উভয়কে তাদের ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারে?

হ্যাঁ! সেটি হল অভিশপ্ত ইহুদীবাদীশক্তি। এরা মূলত পৃথিবীতে শয়তানের মূল চালিকাশক্তি। ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র যে ইহুদীদের হাতের ক্রীড়ানক তাতো সুস্পষ্ট, কিন্তু রাশিয়া? রাশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল হোতা কার্ল মার্ক্স, ট্রট্সকি, লেনিন এরা সকলেই ইহুদী। বামপন্থি নাস্তিক কমিউনিস্ট লেলিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে 'বলশেভিক বিপ্লব' সংগঠিত হয় এবং ১৯২২ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা Union of Soviet Socialist Republics (USSR) গঠিত হয়। এর পর থেকে রাশিয়ার ক্ষমতার নাটাই ইহুদীদের হাতেই।
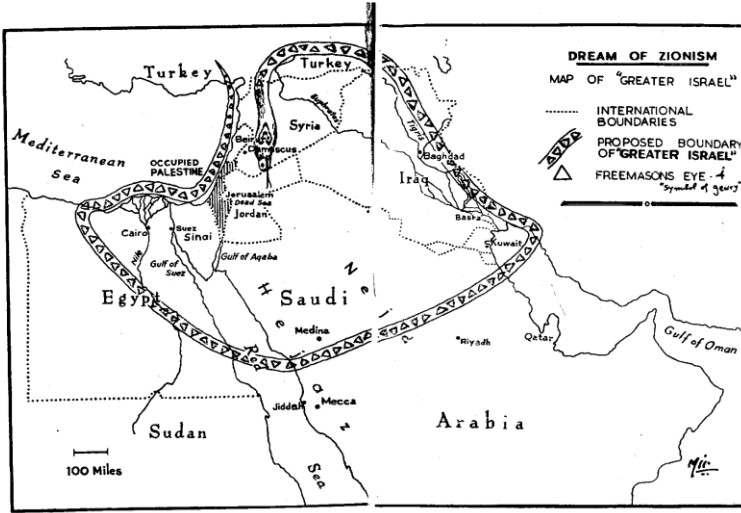
মানচিত্রঃ 'ইহুদীদের স্বপ্ন' মহা ইসরাইল রাস্ট্রের ছক।

✓ বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘ, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ- এগুলো সবই মূলত ইহুদী নিয়ন্ত্রিত, ইহুদী প্রতিষ্ঠান, যারা ইহুদী বা জায়নবাদের দাজ্জালী ছককে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী দুটি পরিবার হল রকেফেলার এবং রাথশিল্ড। এরাই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল নিয়ন্ত্রনকর্তা।

✓ বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সম্পদের মালিক হাতেগুনা মাত্র তিনশ ইহুদী। এদেরকে ইলুমিনাতি (Illuminati) বলা হয়। এরাই মূলত বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব করে যাচ্ছে।

✓ আমেরিকার দক্ষিণ ক্যারোলিনার সীমান্তবর্তী জর্জিয়াতে একটি রহস্যময় স্তম্ভ আছে, যাকে বলা হয় জর্জিয়া গাইডস্টোন (Georgia Guidestone)। সেখানে আটটি ভাষায় লিখিত দশটি বার্তা আছে, যার মধ্যে প্রথম বার্তাটিই হল 'প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোটির কম রাখ।" (https://bit.ly/3AtQIDL)

এটা মূলত একটি ইহুদী মিশন। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা সাড়ে সাতশ কোটি। তার মানে হল ইহুদীরা বাকী সাতশ কোটি মানুষকে হত্যা করার নীল নকশা অংকন করেছে। কেবল পঞ্চাশ কোটি মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে তারা দাজ্জাল ও তাদের দাস বানিয়ে রাখবে। এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম হল- বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতির প্রচার-প্রসার, চরিত্র কলুষিত করার মাধ্যমে পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস করা, বিশ্বের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খরা, বন্যা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ঘটানো।

প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভালো উপায় কি? যুদ্ধ!!! যুদ্ধ!!!

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মূলত ইহুদী তথা ইলুমিনাতিদের মস্তিষ্কের ফসল। এবার তাদের লক্ষ্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। [https://bit.ly/WW123con

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইহুদীবাদের পতন:

- ১৯৪৭ সালের ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে ইহুদীরা নিজেদের জন্য শতাব্দীর, বরং বলা ভালো বিগত তিন হাজার বছরের মধ্যে সেরা সাফল্য মনে করে।

- ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইহুদীদের লক্ষ্য হল, মুসলমানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একে অপরের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে জাতিসমূহকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করা। এরপর শুধু তারা থাকবে। বিশ্বব্যাপী তাদের রাজত্ব চলবে। নিজেরা যুদ্ধে

না জড়িয়ে, পিছনে থেকে কলকাঠি নেড়েই বিশ্ব জয় করে নিবে। আর এটিই হবে-তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বাইবেলের ভাষায় আর্মাগেডন এর যুদ্ধ (War of Armageddon)। কিন্তু তারা জানে না,

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ

"তারা ষড়যন্ত্র করে আর আল্লাহ্ও কৌশল অবলম্বন করেন, আর আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক কুশলী।" (সূরা আল ইমরান ৩:৫৪)

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَلَاحِمُ النَّاسُ خَمْسٌ فَثِنْتَانِ قَدْ مَضَتَا وَثَلَاثٌ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مَلْحَمَةُ التُّرْكِ وَمَلْحَمَةُ الرُّوْمِ وَمَلْحَمَةُ الدَّجَّالِ لَيْسَ بَعْدَ الدَّجَّالِ مَلْحَمَةٌ

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন, (পৃথিবীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত) মানুষের মহাযুদ্ধ পাঁচটি। তার মধ্যে দুটি ইতিপূর্বে (এই উম্মতের আগে) বিগত হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি এই উম্মতের মাঝে সংঘটিত হবে। একটি হলো তুর্কি মহাযুদ্ধ। একটি রোমানদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ। আর তৃতীয়টি হলো, দাজ্জালের মহাযুদ্ধ। দাজ্জালের পর আর কোন মহাযুদ্ধ হবেনা।' (আল ফিতান, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪৮, আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

বাহ্যিক দৃষ্টিতে, 'তুর্কি মহাযুদ্ধ' বলতে 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ'ই উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে; কেননা এই বিশ্বযুদ্ধেই তুরস্কের উসমানী খিলাফত অংশগ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত 'রোমান মহাযুদ্ধ' বলতে হয়ত 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' উদ্দেশ্য। আর রোমান বলতে হয়ত গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা-এদের মহাজোট উদ্দেশ্য। (আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।) আর যদি এমনটি হয়, তাহলে বাকী রইল একটি মহাযুদ্ধ, যা দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় হবে, অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এটিই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ, তথা হক-বাতিলের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। এরপর শুধু হক থাকবে, নয়ত বাতিল থাকবে।

- হাদীসের ভাষায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল 'আল মালহামাতুল কুবরা'। আরবীতে 'লাহমুন' অর্থ গোশত। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভূমিতে কেবল মানুষের লাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন মানুষ মারা যাবে। এমনকি একটি পাখি ধ্বংসযজ্ঞের এক প্রান্ত হতে উড়া শুরু করলে

শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগেই পাখিটি মারা যাবে। এই যুদ্ধের কেন্দ্র হবে শাম। এই যুদ্ধে ইহুদীদের প্ররোচনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া রোমানদের আশিটি পতাকার প্রতিটিতে দশ হাজার করে সৈন্য থাকবে। তারা প্রথমে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে তৃতীয় একটি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তৃতীয় শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করবে। এরপর রোমানরা মুসলমানদের সাথে লড়াই করবে। মহাপ্রলয়ঙ্করী এই যুদ্ধের পর মুসলমানরা জয় লাভ করবে। (মুসলিম-৭১৭৩ ও মুসনাদের আহমাদে 'আল মালহামাতুল কুবরা'র হাদীস অনুযায়ী; বিস্তারিত: মহাপ্রলয়, ড. আব্দুর রহমান আরিফী, কিয়ামতের ১০৫ ও ১০৬ নং নির্দশন দ্রষ্টব্য, লিংক: https://bit.ly/3LECDZh)

ইনশাআল্লাহ্! এ যুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃত্বে থাকবেন হযরত ইমাম মাহদী আ.।

একটু চিন্তা করুন তো! এই যুদ্ধের পর পৃথিবীর অবস্থা কীরূপ হবে??

যদি ইহুদীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়, আর হাদীসের ইঙ্গিতও এদিকে পাওয়া যায় যে, সম্ভবতঃ তারা সফল হবে; তাহলে বুঝে আসে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ইহুদীদের প্ররোচনায় পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সকলেই ধ্বংস হবে ইনশাআল্লাহ। পৃথিবীতে তখন পরাশক্তি হিসেবে বাকী থাকবে কেবল ইহুদী জাতি। আর থেকে যাবে মালহামাতুল কুবরার বিজয়ী শক্তি, দীর্ঘ রণে ক্লান্ত মুসলিম জাতি।

মুসলিম শরীফের হাদীসের ভাষ্যমতে, এই 'মালহামাতুল কুবরা' বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই পৃথিবীতে আগমন ঘটবে ইহুদীদের বহুল প্রতীক্ষিত বাদশাহ, ধোকাবাজ, কানা দাজ্জালের। সে সারা পৃথিবীতে ফেতনা ছড়াতে থাকবে। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। এবং মানুষদেরকে প্রভাবিত করে ঈমান ধ্বংস করবে। যারা তাকে মেনে নিবে না, সে এবং তার মিত্র ইহুদী জাতি তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করবে। স্বভাবতই, তখন পৃথিবীতে কেবল একটি শক্তিই থাকবে যে দাজ্জাল ও তার দোসর ইহুদীদের বিরোধিতা করবে। আর তারা হল মুসলিম জাতি। এরপর শুরু হবে ইহুদীদের সাথে মুজাহিদদের চূড়ান্ত যুদ্ধ।

আহ্! এই দেড় কোটি ইহুদী যদি পৃথিবীতে না থাকত, কতই না শান্তিতে থাকত বাকী সাড়ে সাতশ কোটি মানুষ!!! তাই, মানবজাতির শত্রু এই অভিশপ্ত

ইহুদীদের জন্য দরকার **‘ইহুদী প্রশ্নে শেষ সমাধান’**, আরেকটি **‘চূড়ান্ত হলোকস্ট’**, যার পরে পৃথিবীর বুকে আর কোনো ইহুদী বাকী থাকবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ "

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষণ না ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে ইহুদীদেরকে হত্যা করা হবে। কোনো ইহুদী পালিয়ে গাছ বা পাথরের পেছনে আত্মগোপন করলে সেই গাছ বা পাথর মুসলমানকে ডেকে বলতে থাকবে- ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে, এদিকে এসো! একে হত্যা কর। তবে গারকাদ বৃক্ষ একথা বলবে না। কারণ, সে ইহুদীদের বৃক্ষ।” (মুসলিম)

হযরত ইমাম মাহদি আ. এর নেতৃত্বে মুজাহিদগণ দাজ্জাল ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে। এক পর্যায়ে হযরত ঈসা আ. এর আগমন ঘটবে। তিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।

অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় ইহুদীদের সবচেয়ে বড় মিত্র, আরেক পরাশক্তি ‘হিন্দুত্ববাদী শক্তি’ তখন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের নিঃশেষ করে দিতে তাদের উপর হয়ত হত্যাযজ্ঞ চালাবে, বা এমন কোনো পরিবেশ তৈরি করবে, যার ফলে বীর মুজাহিদরা তাদের বিরুদ্ধে আরেকটি বড় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। হাদীসের ভাষ্যমতে যাকে ‘গাযওয়াতুল হিন্দ’ বলে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করবে এবং সকল নেতৃবৃন্দকে বন্দী করে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় শামে নিয়ে যাবে। সেখানে তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.-কে পাবে। (আল ফিতান: নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং ১২৩৬ অনুযায়ী)

ইনশাআল্লাহ্‌, এই যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশ শিরকমুক্ত হবে এবং হিন্দুত্ববাদের চিরবিদায় ঘটবে।

যাইহোক, ঈসা আ. এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং ইহুদী জাতির নিপাত ঘটাবেন। ফলে পৃথিবীতে পরাশক্তি হিসেবে তখন ‘মুসলমান জাতি’ ছাড়া আর

কেউ অবশিষ্ট রইবে না। সারা পৃথিবীতে কায়েম হবে ‘খিলাফাহ্ ‘আলা মিনহাজিন্নবুওয়াহ’ (নবুওয়তের আদলে খিলাফত)। পৃথিবীর প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘর ইসলামের পতাকার ছায়াতলে থাকবে। চারিদিকে কেবল শান্তি আর শান্তি, মুষলধারে বর্ষিত হবে রব্বে কারীমের রহমত ও বরকত। এরপর আর যুদ্ধ নেই, থাকবে না কোনো জিযিয়া। কেবল কেয়ামতের অন্যান্য বড় নিদর্শনগুলোর জন্য অপেক্ষার পালা।

প্রিয় ভাই! এ পর্যায়ে এসে একটি প্রশ্ন, কারা হবেন মুসলমানদের সেই বাহিনী যারা ইমাম মাহদী আ. এর নেতৃত্বে অভিশপ্ত ইহুদীদের দখল থেকে বাইতুল মাকদিস আজাদ করবেন? কারা তারা যারা মালহামাতুল কুবরার রণাঙ্গণে মুসলমানদের পক্ষে লড়বে? কারা তারা যারা গাযওয়াতুল হিন্দে জিহাদ করবে? কোন সে বাহিনী যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে? অভিশপ্ত ইহুদীবাদকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় জানাবে?? কোন সে মুবারক বাহিনী যারা ইমাম মাহদি আ. এবং হযরত ঈসা আ. এর নেতৃত্বে ধরণীর বুকে আবারো ‘খিলাফাহ ‘আলা মিন্‌হাজিন্ নুবুওয়াহ’ কায়েম করবে?

প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি তারা কারা? চলুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র হাদীস এবং বাস্তবতার আলোকে এর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। প্রকৃত সত্য আল্লাহ্ তা‘আলাই ভালো জানেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়: আফগানিস্তানের ইতিহাস
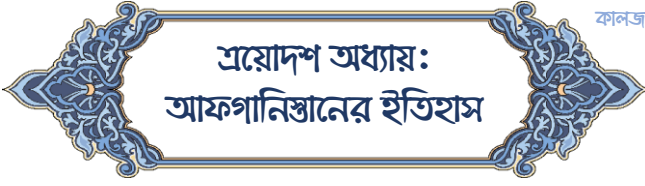
আফগান জিহাদের ইতিবৃত্ত: বাজে মহাযুদ্ধের দামামা

অবিরাম চলছে মহাকালের ঘড়ির কাঁটা। বিংশ শতাব্দীতে এসে মানব সভ্যতা যেমন একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহন করেছে, অপরদিকে কুফর ও শিরক, নাফরমানি ও আল্লাহদ্রোহিতার চূড়ান্তে পা ফেলেছে। ধরনীর বুকে আজ খিলাফত নেই। গোটা পৃথিবীতে কায়েম হয়েছে শয়তানের একচ্ছত্র রাজত্ব, মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলোর উপর চেপে বসেছে কাফেরদের পোষা মুরতাদ শাসক গোষ্ঠি, আল্লাহর আইন থেকে বঞ্চিত আল্লাহর জমিন, কেয়ামতের ছোট আলামতের সব গুলোই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে একে একে, এবার অপেক্ষা বড় আলামত গুলোর, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঈমান ও কুফরের সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে, একদিকে প্রস্তুত হচ্ছে তাওহিদের শিবির, অপর দিকে প্রস্তুত হচ্ছে শিরকের শিবির, প্রস্তুত হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী, প্রস্তুত হচ্ছে ইমাম মাহদির বাহিনী, চার দিকে যেন পরে গেছে সাজ সাজ রব।

গোটা পৃথিবী যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, কখন কিভাবে শুরু হয়, বিশ্ব জগতের শেষের শুরুটা। শেষ জামানার হক্ব বাতিলের চূড়ান্ত সংঘাতে, এই মহা যুদ্ধের অন্যতম কেন্দ্র ভূমি হলো খোরাসান, আর এই খোরাসানের হৃদয় হলো, ‘সাম্রাজ্যবাদের গোরস্তান’ খ্যাত বর্তমান আফগানিস্তান।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ! এখন আমরা আলোচনা করবো আমাদের গৌরবের ভূমি ‘আফগানিস্তান’ নিয়ে। আফগানের পরিচয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে, কথা বলব আফগানের জানবাজ মুজাহিদদের শতাব্দিকাল ব্যাপি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি জিহাদ নিয়ে, হাদিসের আলোকে আলোচনা করবো একবিংশ শতাব্দীতে, আফগানের চলমান জিহাদের অবস্থা, ফলাফল ও ভবিষ্যত নিয়ে।

- **খোরাসান আসন্ন মহাযুদ্ধের ময়দানঃ**

ইসলামি ইতিহাসের এক বিখ্যাত ভূ-খণ্ড হলো খোরাসান। বর্তমান ইরানের পূর্বাঞ্চল প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ছিলো বৃহত্তর ইসলামী খোরাসান। এই অঞ্চলের উত্তর সীমায় ছিলো আমুদরিয়া; পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর; দক্ষিণে মধ্য ইরানের মরু অঞ্চল এবং পূর্বে মধ্য আফগানের পার্বত্য উচ্চ ভূমি।

এই খোরাসান আসন্ন মহাযুদ্ধের অন্যতম কেন্দ্র ভূমি। এই মহাযুদ্ধে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিবেন ইমাম মাহদি আলাইহিস্ সালাম। আর কুফফার বিশ্বের নেতৃত্বে থাকবে পাপিষ্ঠ দাজ্জাল। আর ইমাম মাহদির সহযোগী বাহিনীদের অন্যতম অভয়ারন্য হলো এই খোরাসান। এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে কুফফার বিশ্বের New World Order এর পতন হবে এবং মুসলিম উম্মাহ গোটা বিশ্বের একচ্ছত্র নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে, ইসলাম প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘরে প্রবেশ করবে বিজয়ীর বেশে; দুনিয়া জুড়ে কায়েম হবে খিলাফাহ ‘আলা মিনহাজিহিন্নুবুয়্যাহ (নবুওয়তের আদলে খিলাফত)। সেই সঙ্গে অভিশপ্ত ইহুদিদের কবল থেকে উদ্ধার করা হবে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন ও প্রথম কেবলা বাইতুল মাক্দিস। সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ ও মুস্তাদরাকে হাকিম সহ আরো অনেক হাদিসগ্রন্থে সহীহ সনদে বর্নিত হয়েছে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

تطلع الرأيات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتلا لم يقتله قوم اذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج

“পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এত কঠিন লড়াই করবে, যা ইতিপূর্বে কোন জাতি করেনি, তাদেরকে আবির্ভূত হতে দেখলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের দলে যোগ দিবে।” (সুনানু ইবনি মাজাহ: ৪০৮৪; মুসতাদরাকুল হাকিম:৮৪৩২; মুসনাদ আহমাদ:২২৩৮৭)

ইমাম ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী। হাকীম রহ. বলেছেন: এটি বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ। ইমাম জাহাবীও তার সাথে একমত হয়েছেন।

এখানে পূর্বদিক বলতে খোরাসান বুঝানো হয়েছে। কারণ, তৎকালীন খোরাসান ছিলো জাজিরাতুল আরবের পূর্বদিকে। বিষয়টি সুনানুত্ তিরমিজিতে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ায়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

تخرج من خرسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء

"খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্যদল বের হবে। এই বাহিনীকে কেউই রুখতে পারবে না। অবশেষে এই পতাকা ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরীতে গিয়ে গেড়ে দেয়া হবে।" (আত-তিরমিযি: ২২৬৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৭৬০)

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

اذا رأيتم الريات السود قد جاءت من قبل خراسان فاءتوها فان فيها خليفة الله المهدي

"যখন তোমরা খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহী বাহিনী আসতে দেখবে, তাদের সাথে যোগ দিও। কারণ তাদের মাঝে খলিফাতুল্লাহ মাহদি থাকবেন।" (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৭, হাদীস নং-২২৩৮৭; কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৪৬; মেশকাত শরীফ, কেয়ামতের আলামত অধ্যায়)

এছাড়াও অসংখ্য হাদিসে একই বক্তব্য ধ্বনিত হয়েছে। এই খোরাসানের হৃদপিণ্ড হলো বর্তমান আফগানিস্তান। তাই তো যুগ যুগ ধরে আফগান রাজনৈতিক পরিস্থিতে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যত বাণীর নিখুত মিল খুঁজে পাই।

চলুন প্রথমে সংক্ষেপে আফগানের পরিচয় জেনে নেওয়া যাক।

● আফগানের পরিচয় ও ভূ-প্রকৃতি:

আফগানিস্থানের পশ্চিমে ইরান, উত্তর-পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান; উত্তরে উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান, পূর্বে চীন এবং পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান। কাবুল আফগানের রাজধানী। রাজধানী ব্যতীত আফগানের প্রধান শহর চারটি: জালালাবাদ, কান্দাহার, হিরাত ও মাজারে শরিফ। মোট একত্রিশটি প্রদেশ নিয়ে আফগান। মোট জনসংখ্যার ৯৯.৭ ভাগ মুসলিম। আফগানের আয়তন ২,৫১,৮৩০ বর্গমাইল। আয়তনের দিক দিয়ে এটি বাংলাদেশ থেকে প্রায় পাঁচ গুণ বড়। ২০২০ সাল পর্যন্ত আফগানের জনসংখা ছিলো ৩,৮৯,২৮,৩৪৬। আফগানের প্রধান ভাষা পোশ্‌তুন ও ফার্সি। আফগানের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের ভাষা হলো পোশ্‌তন। তারা সাধারণত পড়াশুনা করতে যায় মিশরের আল-আযহারে, ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায়।

● আফগানিস্তানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

প্রিয় ভাই! এবার আমরা আলোচনা করবো আফগানিস্তানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে। আফগান সাম্রাজ্যবাদের গোরস্তান। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে মহান সাহাবী সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে নাহওয়ান্দের যুদ্ধের বিজয়ের মধ্যমে আফগানে ইসলাম প্রবেশ করে। এরপর কেবল সামনে এগিয়ে চলা। ধীরে ধীরে পুরো আফগান উদ্ভাসিত হয় ইসলামের চোখ জুড়ানো আলোয়!

সুলতান মাহমুদ গজনবীর স্মৃতি বিজরিত এই আফগানের ইতিহাস নানান উত্থান পতনে ঘেরা।

বীর মুজাহিদ আহমাদ শাহ আব্দালি রহঃ ছিলেন গোটা আফগানের সর্বপ্রথম স্বাধীন সম্রাট। তিনিই আফগানিস্তান কে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে রূপ দিয়েছিলেন। তার পূর্বে আফগান ছিলো, অন্য রাজ্য বা সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ। ১৭৬১ সালে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. এর আহবানে তিনি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে এক মোবারাক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই অসম যুদ্ধে তিনি মুসলিমদের অস্তিত্বের মুখে হুমকি হয়ে উঠা মুশরিক মারাঠা বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। মারাঠারা চেয়েছিলো ভারতের মুসলিম মোগলের পতন ঘটিয়ে, ভারত জুড়ে 'অখণ্ড হিন্দুরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু আফগান বীর মুজাহিদ আহমাদ শাহ আবদালি রহঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র মাধ্যমে মুশরিকদের এই নাপাক স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ করে দেন।

বীর মুজাহিদ আহমাদ শাহ আবদালি রহঃ এর বংশধররা 'সাদুজাই' নামে পরিচিত ছিলো। এই আবদালি বংশ ১৭৪৭ থেকে ১৮১৮ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত মোট ৭১ বসর আফগান শাসন করে।

আবদালী সাদুজাই বংশের পর আফগানের শাসন ক্ষমতা চলে যায় 'বারাকজাই' গোত্রের হাতে। আবদালী বংশের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকাকালে আফগান স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু বারাকজাই গোত্রের হাতে ক্ষমতা আসার পর তারা বৃটিশ কুফ্‌ফারদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে শুরু করে। তাদের শাসনামলে বৃটিশ ও রাশিয়া উভয়ে আফগানে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। আফগানে বৃটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে বৃটিশ কুফ্‌ফার গোষ্ঠী একাধিকবার আফগান আক্রমণ করে।

- **প্রথম আফগান-বৃটিশ যুদ্ধ (১৮৩৮-১৮৪২ ঈসায়ী):**

আফগানে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৮৩৮ সালে ইন্ডিয়ার গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড আফগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৩৯ সালে তারা কাবুল দখল করে নেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কুফ্‌ফার বৃটিশের এ আক্রমণ তাদের শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সামরিক বিপর্যয়ের কারণ হয়। আফগান মুজাহিদদের হাতে একে একে নিহত হয় কমান্ডার আলেক্সান্ডার বার্নাস ও সেনাপতি উইলিয়াম মেকনেটেন সহ অসংখ্য উচ্চপদস্থ সেনা অফিসার। ১৮৪২ সালে কাবুল থেকে পালানোর পথে ব্রিটিশ বহরের ওপর হামড়ে পড়ে মুজাহিদ বাহিনী। কুফ্‌ফার বৃটিশ বাহিনীর ১৬,৫০০ সৈন্যের প্রায় সবাই নিহত হয়।

মাত্র একজন বৃটিশ কোনোক্রমে জান নিয়ে জালালাবাদ ঘাঁটিতে ফিরতে সক্ষম হয়। সেই ভাগ্যবান সৈনিকের নাম উইলিয়াম ব্রাইডন।

- **দ্বিতীয় আফগান-বৃটিশ যুদ্ধ (১৮৭৮-১৮৮০):**

আফগানরা বীরের জাতি। তারা কখনো আফগানের মুসলিম ভূ-খণ্ডে কাফেরদের আগ্রাসন বরদাশত করেনি। শাসকরা কখনো আনুগত্য শিকার করলেও বীর আফগানরা বারবার বিদ্রোহ করেছে। আফগানিস্তানে বৃটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে ১৮৭৮ সালে কুফফার গোষ্ঠী পুনরায় আফগান আক্রমণ করে রাজধানীসহ দেশের এক বড় অংশ দখল করে নেয়। ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত আফগান মুজাহিদ ও বৃটিশদের মধ্যে বিভিন্ন ময়দানে লড়াই চলতে থাকে। তেসরা সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ সালে বিদ্রোহী আফগানরা বৃটিশ দূতাবাসে আক্রমণ করে রাষ্ট্রদূতসহ ১২৩ জনকে হত্যা করে। এ যুদ্ধে প্রাথমিক বৃটিশরা বিজয়ী হলেও মুজাহিদদের প্রবল আক্রমণ ও লাগাতার বিদ্রোহের মুখে তারা সন্ধি করে আফগান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এ সন্ধি 'গান্দামাক চুক্তি' (১৮৭৯) নামে পরিচিত।

- **তৃতীয় আফগান-বৃটিশ যুদ্ধ (১৯১৯ ঈসায়ী):**

১৯১৯ সালে আফগানের ক্ষমতা দখল করেন আমির আমানুল্লাহ খান। তিনি বৃটিশ এর সঙ্গে গান্দামাক চুক্তি ভঙ্গ করে আফগানের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দাবি করেন এবং বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯১৯ সালে আফগান বাহিনী বৃটিশ ইন্ডিয়ায় আক্রমণ করে। একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধ শেষ হয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে আফগানরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

- **আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ (১৯৭৯-১৯৮৯)**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ু-যুদ্ধের সময় আফগানের বৃহত্তম প্রতিবেশী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক প্রতিটি অঙ্গনে রাশিয়া কমিউনিজম-এর বিষ বাষ্প ছড়াতে থাকে। আফগানের অনেক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা আর্মি জেনারেল ও সুশীল বুদ্ধিজীবিকে তারা অর্থ ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে

‘কমিউনিষ্ট এজেন্ট’ এ পরিণত করে। যাদের মধ্যে উল্যেখযোগ্য হল প্রধানমন্ত্রী দাউদ খান, নূর মোহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমিন, বারবাক কারমাল।
১৯৭৩ সালে গাদ্দার প্রধানমন্ত্রী দাউদ খান এর মাধ্যমে এক কমিউনিষ্ট বিপ্লব ঘটিয়ে রাশিয়া বাদশাহ জহির খা কে ক্ষমতাচ্যুত করে। দ্বীন ও দেশবিরোধী এই বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নুর মোহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমিন, বারবাক কারমাল এর মত সুশীল রাজনীতিবিদ ও গাদ্দার বুদ্ধিজীবীরা। এভাবে আফগানিস্তানের গদিতে চড়ে বসে রাশিয়ার পা-চাঁটা গাদ্দার গোলাম সরকার।
১৯৭৩ সালে কমিউনিস্ট মদদপুষ্ট গাদ্দার দাউদ খান এর ক্ষমতা দখলের ৬ বছর পর ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত বাহিনী সরাসরি আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। দেশ বিরোধী ক্ষমতালোভী গাদ্দার দাউদ খানকে ক্ষমতায় আনার অনেক পূর্ব থেকে সোভিয়েত কমিউনিষ্টরা আফগানিস্তানের রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোতে, আরো খুলে বললে সরকার, প্রসাশন, সেনাবাহিনী ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্র ও দ্বীন বিরোধী গাদ্দার এবং মীরজাফর তৈরি করে রাখে।
দাউদ খান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সোভিয়েত গাদ্দারদের মাঝেই ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৮ সাল ৩০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ভবনে ট্যাংক চালিয়ে গাদ্দার দাউদ খান পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে আরেক গাদ্দার নূর মুহাম্মদ তারাকী। কমিউনিষ্ট এর পা-চাটা গোলাম তারাকী ক্ষমতা হাতে পেয়ে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা দেয়। ১৯৭৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর আরেক গাদ্দার উপপ্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিন তারাকীকে অপসারণ করে নিজেই প্রধানমন্ত্রী হয়। ক্ষমতাচ্যুত করার পরই তারাকীকে হত্যা করা হয়।
১৯৭৯ সালের ২৫ই ডিসেম্বর আগ্রাসী সোভিয়েত বাহিনী আফগানে প্রবেশ করে। সোভিয়েত বাহিনী প্রবেশের দুই দিন পরেই আরেক গাদ্দার বারবাক কারমাল গাদ্দার হাফিজুল্লাহ আমিনকে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনজন আফগান প্রেসিডেন্ট দাউদ খান, নূর মুহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমিনের হত্যাকান্ড সমাজতন্ত্রের নৃশংসতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যারা দেশের মাটি ও মানুষের সাথে গাদ্দারি করে- বারবার ইতিহাসে তাদের পরিণতি এমনই হয়েছে। এরা তিনজনই ছিল রাশিয়ার অনুগত ভৃত্য এবং কমিউনিজমে বিশ্বাসী।

কমিউনিষ্ট সোভিয়েত পদলেহী গাদ্দার দাউদ খান, নূর মুহাম্মাদ তারাকী এবং হাফিজুল্লাহ আমিনরা যখন আফগানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে, একের পর এক দ্বীন বিদ্বেষী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে, তখন সাধারণ মুসলিম, তাওহীদি জনতা বিশেষ করে আলেম সমাজ ও মাদরাসার ছাত্ররা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু এসব গাদ্দার শাসকগোষ্ঠি তাদেরকে কঠিনভাবে দমন করে। প্রেসিডেন্ট তারাকী হাজার হাজার তাওহীদবাদী মুসলিম ও উলামা-তলাবা কে গ্রেফতার করে এবং সাতাশ হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ফলে আফগানের তাওহীদি জনতা, উলামা তলাবা এসব মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদি কার্যকর্ম শুরু করে।

রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবেশের পূর্বে অনেক রুশসৈন্য আফগান সরকারী বাহিনীর পোশাক পড়ে আফগানে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল।

তৎকালীন সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে সর্বাধিক মরণাস্ত্র সজ্জিত ১ লক্ষ ৫ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। আপনি কি জানেন, এই বিশাল আগ্রাসী বাহিনীকে কারা প্রতিরোধ করেছে? আফগান সরকারী বাহিনী?? না! আফগান মুরতাদ সরকারই তো সোভিয়েত কে আগ্রাসন চালানোর জন্য অনুরোধ করেছে এবং আফগান সরকারী বাহিনী উল্টা আগ্রাসী বাহিনীর সাথে মিলে আফগানী তৌহিদী জনতা, উলামা-তলাবার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আশ্চর্য ঘটনা হলেও সত্য! দ্বীন, ঈমান ও মুসলিম ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষায় সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, তারা আর কেউ নয়, মাদরাসার আলেম ও তালেবে ইলেমরাই।

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল দীর্ঘ ১০ বৎসর আগ্রাসী রুশ হায়নাদের বিরুদ্ধে চলে এক অসম লড়াই, পুরো মুসলিম উম্মাহ আফগানের মুজাহিদদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়, উম্মাহ্‌র ত্রাণকর্তা শায়েখ আব্দুল্লাহ আয্‌যাম ও শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহি. এর আহ্বানে আরব তরুণরা সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝড়ো হয় আফগানের পাহাড়ে। আরব ও আফগান মুজাহিদদের দীর্ঘ এক দশকের রক্তাক্ত জিহাদের পর দখলদার কমিউনিষ্ট সেনারা আফগান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

এ যুদ্ধে দশ বছরে অংশ নিয়েছিল রাশিয়ার মোট ৬,২০,০০০ জন সৈন্য; এদের মাঝে ১৪,৪৫৩ জন সৈন্য নিহত হয় এবং আহত হয় ৫৩,৭৫৩ জন (এগুলো

নেহায়েতই সরকারী হিসাব, প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি); ১৯৭৯-১৯৮৬ পর্যন্ত সাত বছরে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধ খরচ ছিল ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। আফগান সরকারি বাহিনীর মোট ১৮,০০০ সৈন্য নিহত হয়। আর শহীদ হন প্রায় ৭৫,০০০-৯০,০০০ জন মুসলিম।

পরাজয়ের এ ধকল সইতে না পেরে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটে, সেই সঙ্গে কবর রচিত হয় জাহিলী মতবাদ সমাজতন্ত্রেরও।

খিলাফত পতনের মাত্র ৫০ বৎসরের মাথায় আরব-আফগান মুজাহিদদের এমন প্রবল উদ্যমে গোটা উম্মাহ যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। ১৯২৪ সালের খিলাফত পতনের মাত্র ৫৫ বৎসর পর এটি ছিল তাগুতী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম বিজয়। এই খোরাসান বিপ্লবকেই বলা যায় খিলাফা পুনরুত্থানের সূচনা বিন্দু। এ বিপ্লবের মাধ্যমেই উম্মাহ বুঝতে পারে, কোনো মানব রচিত তন্ত্র-মন্ত্র নয়, কোনো অর্থহীন গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয়, খিলাফাহ্ পুনরুদ্ধারের একমাত্র পথ দা'ওয়াহ, ই'দাদ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। উম্মাহর সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। উম্মাহ্র হারানো গৌরব ও সম্মান ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

- **তালেবান বিপ্লবঃ**

আফগান থেকে রাশিয়ার পলায়নের পর কুফ্ফার বিশ্বের চক্রান্তে মুজাহিদগণ ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ফলে উত্থান ঘটে তালেবান বিপ্লবের। কান্দাহারের অখ্যাত এক মাদরাসার শিক্ষক বীর মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ উমর তার ছাত্রদের নিয়ে অস্থিতিশীল আফগানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু করেন এ বিপ্লব। ফার্সীতে তালিবান মানে ছাত্র। তালিবুল ইলম বা মাদরাসার ছাত্রদের মাধ্যমে এ আন্দোলন সূচনা হয় বলে, এটি তালিবান আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৯৪ সালে বীর মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রাহি. এর নেতৃত্বে এ আন্দোলন শুরু হয়ে প্রায় গোটা আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর তালিবানরা বিজয়ী বেশে রাজধানী কাবুলে প্রবেশ করে। এ বছরই মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহ. আমিরুল মু'মিনিন নির্বাচিত হন, আফগানে গঠিত হয় একটি শক্তিশালী ইসলামী সরকার। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। আল্লাহ্ তা'আলার জমিনে আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়নের এমন মুবারক দৃশ্য সত্যিই মুমিন এর অন্তরে দোলা দিয়ে যায়।

- **আফগান-মার্কিন যুদ্ধঃ**

কথিত সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ৯০ এর দশকে ইসলামী খিলাফাহ্‌র স্বপ্নদ্রষ্টা মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ই’দাদ ও জিহাদের এক নতুন ময়দানে। খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তারা এক দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিভাবে জাতিসংঘ কেন্দ্রীক তাগুতী বিশ্বব্যবস্থা গুড়িয়ে চুরমার করে তার ধ্বংসাবশেষের উপর ইসলামী খিলাফাহ্‌র নিশানা উড়ানো যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পর নতুন সুপার পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয় কুফুরী গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই উম্মাহ্‌র জিন্দাদীল মুজাহিদরা সাপের মাথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই টার্গেট করে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তথা ৯/১১ এর “গাযওয়াতুল ম্যানহাটন” হিসেবে খ্যাত মুবারক হামলার মাধ্যমে তারা জড়িয়ে পড়ে খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার এক অসম লড়াইয়ে।

আল্লাহ্‌র কতিপয় জানবাজ সৈনিকের এই দুর্বার অভিযান তাগুতী বিশ্বব্যবস্থার মর্মমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলে। এই হামলার মাধ্যমে সাপের মাথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার নিরাপদ অবস্থান থেকে বের করে টেনে আনা হয় আফগানের পাহাড়ে, আফ্রিকার মরুতে ও মধ্য প্রাচ্যের চোরাবালিতে; মুজাহিদদের পছন্দ অনুযায়ী ভূমিতে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয় তাকে।

৯/১১ এর মুবারক হামলার জবাবে ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর আমেরিকা ও ব্রিটেন আফগান আক্রমণ করে। এর পর শুরু হয় এক অসম লড়াই। ২০০৩ সালে ন্যাটো জোটের ৫০ টি রাষ্ট্র ১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আফগানে প্রবেশ করে, তালিবান মুজাহিদরা জড়িয়ে পড়ে এক দীর্ঘ মেয়াদী জিহাদে।

এই যুদ্ধে দখলদার কুফ্‌ফার যৌথ বাহিনী মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধ করে। তাদের মূল টার্গেট ছিল অসহায় নিরস্ত্র সাধারণ মুসলমান। তারা আবাসিক অঞ্চল, স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিয়ে বাড়ি, এমনকি জানাযার উপরও বোম্বিং করে। গত বিশ বছরে দখলদার আমেরিকা একাই ৫৮,৬০২ টি বোম্বিং করেছে।

এ যুদ্ধে প্রায় ২ লাখ ২৫ হাজার আফগানী মুসলমান নিহত হয়, যাদের মধ্যে ৭০ হাজারেরও বেশি ছিল প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষ এবং এর দ্বিগুণ পরিমাণ মানুষ ক্ষুধা ও অসুস্থতায় ভুগে মারা গেছে।

গত দশ বছরে (২০১১-২০২০ সাল পর্যন্ত) দখলদারেরা প্রায় ৭,৮০০ জন শিশুকে হত্যা করেছে। বাস্তুহীন অবস্থায় অসুস্থ হয়ে, ঠান্ডায় বা অপুষ্টিতে ভুগে আরো প্রায় লাখের উপরে শিশুরা মারা গিয়েছে।

ধর্ষণের শিকার হয় অসংখ্য নারী আর শিশু।

২৭ লাখ আফগান মুসলমান অন্যান্য দেশে রিফিউজি হিসেবে আশ্রয় নেয়। এবং আরো ৪০ লাখ মানুষ দেশের ভিতরেই বাস্তুভিটা হারিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়।

এতকিছুর পরেও আফগান জাতি দখলদার কুফ্‌ফারদের সামনে মাথা নুয়ায়নি। আলহামদুলিল্লাহ। কেননা তারা তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নুয়াতে শিখে নি। তাই, শুরু হয় সর্বাত্মক প্রতিরোধ যুদ্ধ।

প্রিয় ভাই! চিন্তা করে দেখুন, সংখ্যায় অতি অল্প ও শক্তিতে দুর্বল ও প্রায় নিরস্ত্র মুজাহিদদের গোটা কুফফার বিশ্বের বিরুদ্ধে এ লড়াই নিঃসন্দেহে বদরের জিহাদেরই একটি বাস্তব নমুনা। মাত্র ৬০ হাজার মুজাহিদ লড়েছে গোটা

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। কুফ্‌ফার জোট শুরুতে এটাকে খুব সহজ যুদ্ধ মনে করলেও সময়ের সঙ্গে তারা বুঝতে পেরেছে, তালিবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে জয়লাভ দিবাস্বপ্ন বই কিছুই নয়। ২০০১ সাল থেকে ২০২০-প্রায় দুই দশকের এ লড়াই যুক্তরাষ্টের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলাফল কি?

তালিবান মুজাহিদরা একের পর এক আফগান প্রদেশসমূহ দখল করে নিচ্ছিল। এ দীর্ঘ লড়াইয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত কুফ্‌ফার জোট তালিবান মুজাহিদদের সঙ্গে সন্ধি করে পালানোর রাস্তা খোঁজা শুরু করে বেশ কয়েক বছর ধরেই। অবশেষে ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী কাতারের রাজধানী দোহায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তালিবান মুজাহিদদের সঙ্গে একটি লজ্জাজনক চুক্তি সম্পন্ন করে। চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী ২৪ মাসের মধ্যে আমেরিকা ও ন্যাটোজোট আফগান থেকে তাদের সকল সৈন্য প্রত্যাহার করবে। একটি জঙ্গী সংগঠনের সাথে তো আর চুক্তি করা যায় না। তাই চুক্তি করার পূর্বে তারা নাকে খৎ দিয়ে তালিবানকে জঙ্গি সংগঠনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে, নাম দিয়েছে 'স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন'। হা হা হা! যে তালিবান জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘ ২০ বৎসর যুদ্ধ করেছে, দুই দশকের পরে এসে হায়া শরমের মাথা খেয়ে তাদের বলতে হয়েছে তালিবান জঙ্গি সংগঠন নয়। শুধু তাই নয়, চুক্তির পর গত ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০ কনজার্ভেটিভ পলিটিকল একশন কনফারেন্স (CPA) কে দেওয়া এক ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিস্টার ট্রাম্প বলে, "তালিবানরা মহান যোদ্ধা"।

সুব্‌হানাল্লাহ্‌! জিহাদ যুগে যুগে এভাবেই মুসলিম উম্মাহ্‌-কে সম্মানিত করেছে আর কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছে। পহেলা মার্চ ২০২০ সালে বিবিসি প্রকাশিত এক রিপোর্টে এসেছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক 'কস্ট্‌ অব ওয়ার প্রজেক্ট' নামে একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফগান যুদ্ধে ব্যায়ের যে সরকারি হিসাব দেখানো হয়েছে তা যথেষ্ট কম। প্রকৃত যুদ্ধ ব্যায় প্রায় ২ ট্রিলিয়ন বা ২ লক্ষ কোটি ডলার। মার্কিন হিসাব মতে, এ দীর্ঘ মেয়াদি লড়াইয়ে আফগানে ২,৫০০ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে, পঙ্গু বা আহত হয়েছে ২০,০০০ হাজার। ব্রিটিশ সৈন্য মারা গেছে ৪৫০ জন।

এছাড়াও ন্যাটো জোটের আরো কয়েকশো সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে। সংখ্যা দেখলেই বুঝা যায়, এটা নিছক লোক দেখানো সরকারি হিসাব। মান ইজ্জত বাঁচাতে তারা প্রকৃত সংখ্যা গোপন করেছে। আফগানে নিহত মার্কিন সৈন্যদের সারি সারি কবর দেখে বিষয়টি আন্দাজ করা যায়। তাগুত প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনিই স্বীকার করেছে, ২০১৪ সালে সে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আফগান সরকারি বাহিনীর ৪৫ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!!

- <u>আমি মক্কা বিজয় দেখিনি, কাবুল বিজয় দেখেছি!!</u>

এদিকে, তালিবান মুজাহিদরা একের পর এক আফগান প্রদেশসমূহ দখল করে নিচ্ছিল। এদিকে তালিবান মুজাহিদদের মাইর সহ্য করতে না পেরে ২০১৮ সালের অক্টোবরে তালিবানদের সাথে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সর্বশেষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো উপায়ান্তর না দেখে ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ 'দোহা চুক্তি'তে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তিতে ২০২১ সালের মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার কথা বলা হয়। ২ জুলাই, ২০২১ ঈসায়ীতে আমেরিকান এবং ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগের ঘোষণা দেয়।

অবশেষে আসল ১৫ আগস্ট, ২০২১ ঈসায়ী!! আসল বহু প্রতীক্ষিত, দীর্ঘ দুই দশক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর, আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার

নুসরতে চূড়ান্ত বিজয়!!! তালিবান মুজাহিদরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বিনা প্রতিরোধে কাবুল দখল করে নেয়; দ্বিতীয় বারের মত প্রতিষ্ঠা করে 'ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান'। আসমানে উড্ডীন হয় 'কালজয়ী ইসলামের' চির বিজয়ী, চির গর্বিত কলেমার পতাকা। সমস্ত প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্ তা'আলার জন্য!!!

এদিকে ক্রুসেডার আমেরিকার পালিত কাবুলের পুতুল সরকার প্রধান আশরাফ গনি তালিবান মুজাহিদদের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখে প্রেসিডেন্ট থেকে পদত্যাগ করে এবং এদিনই রাজধানী কাবুল ছেড়ে প্রতিবেশি দেশ তাজিকিস্তানে পালিয়ে যায়। আফগান ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন কাউন্সিলের প্রধান আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ অনলাইনে প্রকাশিত এক ভিডিওতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

(লিংক: https://alfirdaws.org/2021/08/16/51596/)

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ ১৮ বৎসর প্রলয়ঙ্করী এই যুদ্ধে লজ্জাজনক ভাবে হেরে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ন্যাটোজোটভুক্ত বিশ্বের শক্তিধর ৫০ টি রাষ্ট্র। আরব-আফগান মুজাহিদদের পদতলে পিষ্ট হলো কুফফারগোষ্ঠীর দম্ভ। নিঃসন্দেহে এ বিজয় কুফ্ফার বিশ্বের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহরই বিজয়। এই বিজয় মুসলিম উম্মাহর পুনরুত্থানের এক বিশাল মাইলফলক।

প্রধান: আমীরুল মু'মিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা)

মৌলবী হিবাতুল্লাহ্ আখুন্দজাদা

প্রাক্তন তালেবান প্রধান বিচারপতি,
২০১৬ সাল থেকে নেতা।
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক বিষয়ক চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

প্রধানমন্ত্রী

মোল্লা হাসান আখুন্দ

তালেবান নেতৃত্ব কাউন্সিল প্রধান

উপ প্রধানমন্ত্রী

মোল্লা আবদুল গনি বারাদার

কাতারে তালেবানদের রাজনৈতিক অফিসের প্রাক্তন প্রধান

উপ প্রধানমন্ত্রী

মৌলবী আবদুল সালাম হানাফি

কাতারে তালেবান আলোচনা দলের প্রাক্তন সদস্য

মন্ত্রণালয়

প্রতিরক্ষা

মৌলবী মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুজাহিদ

অভ্যন্তরীণ

মৌলবী সিরাজুদ্দীন হক্কানী

পররাষ্ট্র বিষয়ক

মৌলবী আমীর খান মুত্তাকী

অর্থ

মোল্লা হিদায়াতুল্লাহ বদরী

বিচার

মৌলবী আব্দুল হাকীম শরয়ী

তথ্য

মোল্লা খায়রুল্লাহ খয়েরখা

আল কায়েদার ইতিহাস:

১৯২৪ সালে উসমানী খিলাফাতের বিলুপ্তির পরে মুসলিম উম্মাহ্র উপর নেমে আসে অত্যাচারের স্টিমরোলার। ব্রিটিশ ও পশ্চিমা আধিপত্য ও ষড়যন্ত্রে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয় ও এগুলোতে কাফেরদের দালাল নামধারী মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে বসানো হয়। উম্মাহর এমন দুরবস্থায় আল্লাহ্র কিছু মুখলিস বান্দা জান-মাল দিয়ে যুগে যুগে মেহনত করে পুনরায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মেহনত করে গেছেন। বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমরা সংগঠিত ভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে জিহাদের ধারা জারি রাখেন। মিশরে হাসান আল বান্না, সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. সহ সারা বিশ্বের অনেক মুসলিম নেতৃবৃন্দ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। একপর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণের ফলে মোবারক আফগান জিহাদের সূচনা হয়। সারা বিশ্বের অনেক মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ এখানে হিজরত করে আসেন।

আফগান-রাশিয়া যুদ্ধের সময়ই ১৯৮৮ সালে মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলো পুনরুদ্ধার এবং পুরো বিশ্বে পুনরায় নবুয়তের আদলে খিলাফাহ্ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'আল কায়েদাতুল জিহাদ' (জিহাদের ঘাঁটি) বা সংক্ষেপে 'আল কায়েদা'র সূচনা হয়।

হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর মুজ্তাহিদ ইমাম এবং বিংশ শতাব্দীর জিহাদের পুনর্জাগরণের রূপকার শাইখ ড. আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ আয্যাম রাহি. এবং শাইখ উসামা বিন লাদেনের হাত ধরে আল কায়েদার যাত্রা শুরু।

১৯৮৯ সালে কোনো এক শুক্রবার জুমার সালাতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে লুকানো বোমার বিস্ফোরনে স্বীয় দুই পুত্রসহ আব্দুল্লাহ্ আয্যাম রাহি. শহীদ হন।

এরপর হতে আলকায়েদার নেতৃত্ব দেন শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহি.।

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হওয়ার পর পুরো আফগান জুড়ে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে মোল্লা উমর রাহি. এর নেতৃত্বে তালিবান প্রতিষ্ঠিত হয়। তালিবানের লক্ষ্য ও কার্যক্রম আফগানিস্তান কেন্দ্রিক। অপরদিকে, আল কায়েদার লক্ষ্য ও কার্যক্রম বৈশ্বিক/আন্তঃমহাদেশীয়।

১৯৯৫ সালের পরে তালেবানের নেতৃত্বে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে আলকায়েদা এর অধীনে বায়াতবদ্ধ হয়ে মেহনত করে যাচ্ছে।
২০১১ সালে শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহি. এর শাহাদাতের পর আল কায়েদার বর্তমান আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ।
আফগান ভূমিতে আল-কায়েদা মুজাহিদদের তারবিয়াত প্রদান করে মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে তাদেরকে ছড়িয়ে দেন। আলহামদুলিল্লাহ এর ফলশ্রুতিতে আলকায়েদা বর্তমানে বিশ্বের অনেক প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে এবং মুসলিম ভূখণ্ডগুলো পুনরুদ্ধারের মেহনত করে যাচ্ছে। সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামী খিলাফাহ ফিরিয়ে আনতে এবং মযলুম মুসলমানদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে উদ্ধার করতে, পৃথিবীর আনাচে কানাচে “আল্লাহ্‌র সৈনিক” তৈরি করতে “আল-কায়েদার ভাইয়েরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক জায়গায় আল্লাহর ইচ্ছায় তারা শরিয়া প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমও হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ!
আধুনিক সমরনীতি ও যুদ্ধ কৌশল, গোয়েন্দাগিরি, কুরবানীর মানসিকতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, আল্লাহ্‌র সাথে সততা ও সম্পর্ক (তা‘আল্লুক মা‘আল্লাহ), তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি), অদম্যতা ও নেটওয়ার্ক বিস্তার- এসকল ক্ষেত্রে আল-কায়েদার জুড়ি নেই, আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমান বিশ্বে ‘আল-কায়েদা’ যেন তাগুত ও বাতিলের জন্য সাক্ষাৎ ‘এক যমদূত’। বাতিলের জন্য ‘আল কায়েদা’ যেন এক মহা ত্রাসের নাম। আলহামদুলিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ- এর ভবিষ্যদ্বানী-

تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء

“খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী সৈন্যদল বের হবে। এই বাহিনীকে কেউই রুখতে পারবে না। অবশেষে এই পতাকা ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরীতে স্থাপিত হবে।” (আত-তিরমিযি: ২২৬৯, মুসনাদে আহমাদ: ৮৭৬০)

বাস্তবতার বিচারে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত 'কালো পতাকার সৈন্যদল' দ্বারা 'আল কায়েদার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।) কেননা, আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমান বিশ্বে কালো পতাকাবাহী 'আল কায়েদা' এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির নাম, যার সূচনা হয়েছিল আরবের পূর্বদিক তথা খোরাসান (আফগানিস্তান) হতে। আর বর্তমানে আল কায়েদা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী, বিজয়ের একটি বড় অংশীদার এই 'আল-কায়েদা' সংশ্লিষ্ট মুজাহিদীন। ২০০১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসনের জবাবে তালিবানের পক্ষে লড়াইকারী বিজয়ী বাহিনীরও একটি বড় অংশীদার এই 'আল কায়েদা' সংশ্লিষ্ট মুজাহিদীন। মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে দুই দুইটি পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিজয় বারবার আমাদেরকে উক্ত হাদীসের মর্মবাণীই স্মরণ করিয়ে দেয়- ইনশাআল্লাহ, কালো পতাকার এই বাহিনীকে পরাজিত করে এমন কোনো শক্তি পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট নেই।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় এবং দাজ্জালের হত্যার আগ পর্যন্ত, দুনিয়াব্যাপী 'খিলাফাহ্ আলা মিনহাজিন্নবুয়্যাহ' প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আমাদের এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় চলতেই থাকবে, চলবেই ইনশাআল্লাহ। আমাদের লড়াই, আমাদের আমরণ যুদ্ধ দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলাই আমাদের একমাত্র সহায়।

আল কায়েদার মিত্র রাষ্ট্রঃ

ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তান। প্রতিষ্ঠাতা আমীরঃ মোল্লা মুহাম্মাদ উমার মুজাহিদ রাহি.। দ্বিতীয় আমীরঃ মোল্লা আখতার মোহাম্মাদ মানসূর রহঃ। তিনি আমেরিকার কথা না মানার কারণে ড্রোন হামলায় নিহত হন। ইমারতে

আফগানিস্তানের বর্তমান আমীর: শায়খুল হাদীস হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ হাফিযাহুল্লাহ।

বর্তমানে সারাবিশ্বে আলকায়দার অনেকগুলো ঘোষিত শাখা আছে। পাশাপাশি আরো কিছু মিত্র তানজীম রয়েছে।

আলকায়েদার ঘোষিত শাখাসমূহঃ

- আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরিব, প্রতিষ্ঠাতা আমীরঃ শায়েখ আবু মুস'আব আব্দুল ওয়াদুদ রহ.; বর্তমান আমীরঃ শাইখ আবু উবাইদা ইউসুফ আল-আন্নাবী হাফিযাহুল্লাহ
- আল-কায়েদা জাজিরাতুল আরব, প্রতিষ্ঠাতা আমীরঃ শাইখ আবু বাসির নাসির আল-ওয়াহাইশি রহিমাহুল্লাহ; বর্তমান আমীরঃ শাইখ খালেদ বিন উমর বাতারফি হাফিযাহুল্লাহ
- জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন, মালি। আমীরঃ আবুল ফজল ইয়াদ আগ গালী হাফিযাহুল্লাহ
- হারকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন, প্রতিষ্ঠাতা আমীরঃ শায়েখ মুখতার আবু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ, বর্তমান আমীরঃ শায়েখ আবু উবাইদাহ (যিনি আহমাদ দিরিয়ে নামেও পরিচিত)
- আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ, (ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মিয়ানমার) প্রতিষ্ঠাতা আমীরঃ আসেম উমার রাহিমাহুল্লাহ, বর্তমান আমীরঃ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

আল-কায়েদার মিত্র তানজীমসমূহ:

- তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান, আমীরঃ মুফতি নূরওয়ালি মেহসুদ (আবু আসেম) হাফিযাহুল্লাহ।
- আনসার আল-ফুরকান (ইরান)
- আনসার আল-ইসলাম (ইরাক ও সিরিয়া)
- আনসার আত-তাওহীদ (সিরিয়া)
- উকবাহ ইবনে নাফে' ব্রিগেড (তিউনিসিয়া)

- জামাআত আনসারুল মুসলিমিন (সুদান)
- জামাআতুল মুজাহিদিন উপমহাদেশ
- হারাকাতুল জিহাদ (বাংলাদেশ)
- আল হিযবুল ইসলামী তুরকিস্তানী (পূর্ব তুর্কিস্তান)
- মজলিসে শুরা দিরনাহ (লিবিয়া)
- আল কায়েদা সিনাই উপত্যকা
- ইমাম শামিল ব্যাটালিয়ন
- আনসার বাইত আল মাকদিস
- আল কায়েদা কুর্দিশ ব্যাটালিয়ন
- আল কায়েদা বসনিয়া-হার্জেগোবিনা
- আনসার আল শরিয়াহ

[আল কায়েদার বিস্তারিত ইতিহাস জানতে পড়ুন:
“শাজারাত মিন তারিখিল কায়িদাহ”:
https://alfirdaws.org/2021/09/20/52699/

আরব্য রজনীর নতুন অধ্যায়: সাইয়্যেদ সেলিম শেহজাদ:
https://archive.org/details/ExileNotes1]

ইসলামের ইতিহাসের সার সংক্ষেপ: সময় এখন আমাদের হাতে

প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার কী কী পর্যায় হবে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ১৪০০ বছর পূর্বেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة ". ثم سكت.

"তোমাদের মাঝে নবুয়তের যামানা ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এরপর তিনি একে উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে নবুয়তী তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত 'খুলাফায়ে রাশেদার' আমল, এটিও ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এরপর তিনি এটিকেও উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে বংশপরম্পরার নেতৃত্ব, এটিও ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এরপর তিনি এটিকেও উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে চরম যুলুম-অত্যাচারের যামানা, এটিও ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ তাআলা চাইবেন, এরপর তিনি এটিকেও উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আবারো আসবে নবুয়তের আদলে খুলাফায়ে রাশেদার (পথপ্রদর্শিত খলীফার) খিলাফত (খিলাফাহ্ 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ)।" এতটুকু বলার পর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। (মুসনাদে আহ্মাদ, হাদীস নং- ১৮,৪০৬) হাদীসটির সনদ হাসান।

নবুয়তের যামানা শেষ হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর ওফাতের মাধ্যমে (৬৩২ ঈসায়ী/ ১১ হিজরিতে) , অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদার যুগ ছিল সর্বমোট ত্রিশ বছর (৬৬১ ঈসায়ী/৪০ হিজরী পর্যন্ত), অতঃপর বংশপরম্পরার শাসনব্যবস্থার যুগ (রাজতান্ত্রিক/পরিবারতান্ত্রিক খিলাফত) যা ১৯২৪ সালে তুর্কী খিলাফত ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে অবশিষ্ট ছিল, অতঃপর চরম নৈরাজ্য ও যুলুম-শোষনের যুগ অর্থাৎ গণতন্ত্র/ সমাজতন্ত্র/ রাজতন্ত্রের যুগ অর্থাৎ বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বে যা চলছে। এরপর আসবে 'নবুয়তের আদলে খিলাফতের যুগ' অর্থাৎ ইমাম মাহদী আ. ও ঈসা আ. এর যামানা। সুতরাং সামনে সময় এখন ইসলামের, এখন সময় মুসলমানদের!

সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ে পোশ্‌তুনে একটি প্রবাদ আছে- ঘড়ি তোমাদের হাতে কিন্তু সময় আমাদের হাতে। আলহামদুলিল্লাহ্‌! সময় সত্যিই এখন মুসলিম উম্মাহ্‌র হাতে। খোরাসানের জিহাদ এখন আর আফগানের সীমানায় আটকে নেই। জিহাদের এই বিপ্লব আজ ছড়িয়ে পড়েছে জাজিরাতুল আরবে, হিন্দুস্তানে, আলজেরিয়ায়, লেবাননে, কাশ্মীরে, সিরিয়ায়, সোমালিয়ায়, মালিতে, সারা বিশ্বে। উম্মাহ্‌র মানসরাজ্যে এই জিহাদ সাহস ও উদ্যমের এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করেছে। ইমাম মাহদী আ.-কে স্বাগত জানাতে যেন সাজ সাজ রব পড়েছে চারদিকে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই আফগানিস্তানে মুজাহিদদের ফাত্‌হে মুবিন, এ মহাবিজয়, বিশ্ব কুফ্‌ফারজোটের বিরুদ্ধে এ মহাযুদ্ধের দামামা যেন চিৎকার করে ঘোষণা করছে- এই শতাব্দী জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র শতাব্দী! এই শতাব্দী মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের শতাব্দী!! এই শতাব্দী 'খিলাফাহ্‌ 'আলা মিনহাজিন্নুবুয়্যাহ্‌' প্রতিষ্ঠার শতাব্দী!!!

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢١

"আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে: আমি (আল্লাহ) এবং আমার রাসূলগণ (ও তাঁদের অনুসারীরা) অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" (৫৮ মুজাদালাহ: ২১)

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ٥٦

"আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (তারাই আল্লাহ্‌র দল), আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।" (০৫ সূরা মায়েদাহ্‌: ৫৬)

نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٣
"(শীঘ্রই আসছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ প্রদান করুন।"
(৬১ সূরা ছফ: ১৩)

****

****

কালজয়ী ইসলাম

মুস‘আব ইলদিরিম

****

****

****

****

মুস‘আব ইলদিরিম ভাইয়ের লিখিত **“কিতাবুত তাহরীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল”** (ইনশাআল্লাহ্, দাওয়াহ্ ইলাল জিহাদের ময়দানে কিতাবটি এক নতুন বিপ্লব) পড়ুন নিচের লিংকে (Tor Browser ব্যবহার করুন)-

“কিতাবুত তাহরীদ ‘আলাল ক্বিতাল”, পর্ব-১: আগ্নেয়গিরি হতে অগ্নুৎপাত

দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid1

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/kitabuttahrid1

....

কিতাবুত তাহরীদ ‘আলাল ক্বিতাল, পর্ব 02: তাওহীদ ও জিহাদ

দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid2

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/kitabuttahrid2

....

কিতাবুত তাহরীদ ‘আলাল ক্বিতাল: পর্ব ০৩: ভালোবাসি তোমায় হে জিহাদ!

দাওয়াহ ইলাল্লাহ পোস্ট লিংক: https://bit.ly/tahrid3

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/tahrid3

....

ইনশাআল্লাহ, প্রকাশের অপেক্ষায়.........

চতুর্থ পর্ব: তোমাকেই শুধু চাই, হে শাহাদাত!

পঞ্চম পর্ব: আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এভাবে ধোকা দিব?

ষষ্ঠ পর্ব: অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হতে দাবানল

=== জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ===

****

****

ইসলামের সোনালি অতীত অতিবাহিত হয়েছে...
এসেছে ঝড়-ঝাঁপটা; তবুও মাথা নুয়ায়নি...
এবার ইতিহাসের গোধূলি লগ্নে.....
আবারো আসছে...........
সোনালি ভবিষ্যৎ........
সুনিশ্চিত বিজয়..।।

ইসলাম, জিন্দাবাদ ।।